শাসনতন্ত্র

* ত্রৈবার্ষিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য

সুনীলকুমার মিত্র, এম এ., এল-এল. বি.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও আইন কলেজের শাসনতান্ত্রিক আইনের অধ্যাপক ও এ্যাডভোকেট

ও

নিমাই নাগ চৌধুরী, এম. এ., এল-এল. বি.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের রিসার্চ স্কলার; বাগনান ডিগ্রী কলেজের রাজনীতি বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও যাদবপুর পলিটেকনিকের হিউম্যানিটিজ বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক; বসিরহাট কলেজের অধ্যাপক; অর্থবিদ্যা ও পৌরনীতি, লেকচার নোটস টু হিউম্যানিটিজ, প্রমুখ পুস্তক প্রণেতা ও এ্যাডভোকেট

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

শুভানুধ্যায়ী

কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির

করকমলেষু

ভূমিকা

আন্তর্জাতিকতার চেতনা যখন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূলে প্রবিষ্ট, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজনৈতিক গঠনপদ্ধতির বিশ্লেষণাত্মক পঠন-পাঠন আধুনিক শিক্ষণব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হওয়া স্বাভাবিক। সংবিধান রাষ্ট্রীয় আদর্শের দর্পণ। তাই ভিন্নমুখী শাসনতন্ত্রের গঠন-বৈশিষ্ট্যকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করার এক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে, ত্রি-বার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে শাসনতন্ত্রের তাৎপর্য কেবলমাত্র পরীক্ষা-সংক্রান্ত প্রয়োজনের পরিপূরকই নয়, আগামীকালের নাগরিকের পথে এই ঐতিহাসিক দলিলগুলির প্রত্যয়িত সত্য এক অভ্রান্ত জীবনবেদের পথনির্দেশক হবে। সংশ্লিষ্ট পুস্তক রচনার অনুপ্রেরণা এসেছিল সেই সত্যেরই স্বীকৃতি হিসেবে।

এই পুস্তকে তুলনামূলক বিচারের সাহায্যে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাসনতন্ত্রের বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছি। প্রতিপাদ্য বিষয় যদি কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের চিন্তার স্রোতকে নূতন খাতে প্রবাহিত করতে সাহায্য করে ও নূতন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে তাহলেই এই সংক্ষিপ্ত অথচ মননশীল গ্রন্থখানির সার্থকতা।

এই পুস্তক রচনায় অনেকেই উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন। প্রকাশক শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতির দাবী রাখেন।

কলিকাতা
২১শে অক্টোবর '৬২

শ্রীসুনীলকুমার মিত্র
শ্রীনিমাই নাগচৌধুরী

সূচীপত্র

গ্রেট ব্রিটেন

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

সুইজারল্যাণ্ড

সোবিয়েৎ ইউনিয়ন

ভারতের সংবিধান

শাসনতন্ত্র

গ্রেটব্রিটেন

প্রথম অধ্যায়

শাসনতন্ত্র (Constitutions)

[শাসনতন্ত্র কি ?—শাসনতন্ত্রের প্রকৃতিগত বিভাগ—লিখিত ও অলিখিত ; সহজে পরিবর্তনশীল ও দুষ্পরিবর্তনীয় ; এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়]

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিবার পূর্বে শাসনব্যবস্থার সংজ্ঞা নির্ণয় করা আবশ্যক। রাজনীতিতে রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রের জাগরণের, রাজনৈতিক চেতনার ও অগ্রগতির পরিচায়ক, রাষ্ট্রের সরকার পরিচালনার নির্দেশক এবং নাগরিকগণের বিভিন্নপ্রকার অধিকারগুলির ধারক ও বাহক বলা যাইতে পারে।

শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা

এরিস্টটলের আমল হইতে সরকারের চরিত্র সম্পর্কে বিশ্লেষণ শুরু হইয়াছে। এরিস্টটল তৎকালে প্রচলিত সরকারকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন, যথা রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, ধনিকতন্ত্র, জনতাতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র এবং গণতন্ত্র। মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন এরিস্টটলের মত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে এরিস্টটল প্রদত্ত বিভিন্ন সরকারের রূপ কোন অবস্থাতেই স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে না, চক্রাকারে একটি অপরটিকে অনুসরণ করিয়া পরিব্যাপ্ত হইবে।

এরিস্টটল প্রচলিত সরকার-বিভাগ

ফরাসী রাষ্ট্রনীতিবিদ্ মণ্টেসকিউ অবশ্য সরকারকে প্রকৃতি অনুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা প্রজাতন্ত্রী, রাজতন্ত্রী এবং স্বৈরাচারী সরকার। সরকারের প্রকৃতি ও কার্যকারণ নির্ধারণের পরিমাপক হিসাবে শাসনতন্ত্রকে চিত্রিত করা যায়। শাসনতন্ত্র সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার কাঠামো ও শাসন-ব্যবস্থার রূপরেখা নির্ণয় করে। সংবিধানের প্রভাবে সমাজ সংগঠিত ও শাসিত হয় এবং রাষ্ট্রজীবনপ্রবাহ বহিয়া চলে।

একটি রাষ্ট্রের ইতিহাস, পরিবেশ, সমাজজীবন, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, রাজনৈতিক সচেতনতা ও দেশবাসীর চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং মননশীলতার পটভূমিকায় সংবিধান বিরচিত হয়। ইতিহাসই উর্ণনাভের মত আপনার চারিদিকে ঘটনার জাল বুনিয়া সংবিধানের কাঠামো সৃষ্টি করে এবং সংবিধান প্রাচীন ঘটনার ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করে।

ব্রিটেনের সংবিধান সম্পর্কে বলিতে গিয়া অগ্ ও জিংক (Ogg and Zink) বলিয়াছেন, "From the political and legal experience of many hundreds of years has flowed the rich array of rules and principles and usages forming what is known as the English...... constitution".

শাসনতন্ত্র একটি আইনগত ধারণা

শাসনতন্ত্র একটি আইনগত ধারণা। নীতি, আইন, প্রথা ও ব্যাখ্যা (interpretation) প্রভৃতি উপাদানের সমন্বয়ে শাসনব্যবস্থার রূপরেখা নির্ণয় করা হয়। শাসনতন্ত্র রাজনৈতিক সংস্থাসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক, সরকারী আইনের রূপ, বিচার বিভাগের গঠনপ্রণালী প্রভৃতি নির্ণয় করে। Finer সংবিধানকে শক্তি-সম্পর্কের আত্মকথা রূপে পরিচায়িত করিয়াছেন—"A constitution is the autobiography of a power relationship."

লিখিত ও অলিখিত সংবিধান

শাসনতন্ত্রকে লিখিত ও অলিখিত (written and unwritten) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। লিখিতভাবে সনদের মাধ্যমে প্রাঞ্জল ভাষায় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার কাঠামো যেখানে পাওয়া যায় সেই রাষ্ট্রে লিখিত সংবিধান বর্তমান বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রথা, নিয়ম, চলিত নীতি, পূর্বাপর ঘটনার নজীরের সাহায্যে যখন শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় তখন সেই শাসনব্যবস্থা অলিখিত সংবিধান প্রভাবিত বলিয়া গণ্য হয়। অবশ্য লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের প্রকৃত পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে। কারণ পৃথিবীতে এমন সংবিধান বিরল বলিলেই চলে যাহা সম্পূর্ণরূপে লিখিত অথবা সম্পূর্ণরূপে অলিখিত। যে সংবিধানে লিখিত অংশ সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহাকে লিখিত সংবিধান এবং যে সংবিধান মূলতঃ অলিখিত

তাহাকে অলিখিত সংবিধান বলে। লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের উদাহরণ যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র। লিখিত সংবিধানে মোটামুটি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লিখিত থাকে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ভোগের অনিশ্চয়তা অপসারণের নিমিত্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ও পারস্পরিক মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত থাকে। অবশ্য নাগরিকের অধিকার উপভোগ রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের রাজনৈতিক সচেতনতার উপর সবিশেষ নির্ভরশীল। অলিখিত সংবিধানের দ্বারা সংগঠিত রাষ্ট্রেও ব্যক্তি মৌলিক অধিকারের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে। ব্যক্তিজীবনের সম্যক প্রকাশের জন্য, ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণের জন্য যে সুযোগ-সুবিধাগুলির প্রয়োজন তাহা অর্জন করিতে হয়। অধিকার প্রকৃতির অথবা স্বর্গের দান নহে যে লিখিতভাবে প্রকাশ পাইলেই তাহা উপভোগ করা যায়, উহা অর্জন সাপেক্ষ।

ক্ষমতা বণ্টনের পদ্ধতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা কোন রাষ্ট্রের সংবিধান এককেন্দ্রিক কি যুক্তরাষ্ট্রীয় (Unitary বা Federal) তাহা জানিতে সক্ষম হই। সংবিধান ক্ষমতা-সম্পর্কের আত্মকথা। যখন রাষ্ট্রের সমস্ত শাসন-ক্ষমতা একটি সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে তখন সংবিধান এককেন্দ্রিক সংবিধানরূপে অভিহিত হয়। এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় দুই অথবা ততোধিক সরকারের স্থান নাই। এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বত্র একই ধরণের আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা কার্যকর থাকায় শাসন-ব্যবস্থা জটিলতামুক্ত হইয়া সহজ হয় এবং নাগরিকদিগের মধ্যে ঐক্যবোধ ও নৈতিক একাত্মতাবোধ জাগরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সরকারের কার্যের পরিধি সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত হয় এবং রাষ্ট্রের সমস্ত কার্য কেন্দ্র ও তৎসংলগ্ন অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়। দুই শ্রেণীর সরকার, দ্বিবিধ আইন ও দ্বিবিধ প্রশাসনিক ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষত্ব। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট ক্ষমতা বিভাজন এবং আইন ব্যাখ্যা ও ক্ষমতা বণ্টনজনিত সমস্যা সমাধান কল্পে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলির কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার অধিকার সাধারণতঃ স্বীকার করা হয় না। ১৯৩৪ সালে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার রাজ্য সরকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অষ্ট্রেলিয়ার

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান

কমনওয়েলথ হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিবার অনুমতি চাহিয়া এক আবেদন করেন। কিন্তু এ আবেদন সংবিধানগত ভাবে অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য করা হয়।

রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত ইচ্ছামত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারে কিনা এই বিষয়ে আমেরিকায় তীব্র আলোড়ন দেখা দেয়। পরিশেষে ১৮৬৮ খ্রীঃ তথাকার সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করে যে অভিন্ন রাজ্য সমূহের সমন্বয়ে গঠিত আমেরিকা একটি অভিন্ন যুক্তরাষ্ট্র। অতএব বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমেই মার্কিন রাজ্যসমূহ কেন্দ্রের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার প্রয়াস পাইতে পারে। সোভিয়েট রাশিয়ায় অবশ্য সম্পর্ক ছিন্ন (secede) করিবার অধিকার রাজ্য সরকার-গুলিকে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই ক্ষমতা কোন রাজ্য সরকার রাশিয়ায় এখনও প্রয়োগ করিবে বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য, সংশোধন (amendments) অথবা বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারগুলির ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

সহজ পরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান

সংবিধান সহজে পরিবর্তনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় হইতে পারে। সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অথবা অনুশাসন সংশোধন করিবার নিমিত্ত যখন কোন বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হয় তখন সেই সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় জ্ঞান করা বিধেয়। যে শাসনতন্ত্র সাধারণ আইনের পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায় তাহাকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলা যায়। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে সংবিধানগত আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়। সংবিধানগত আইনের পরিবর্তন সাধনে এক বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সহজে পরিবর্তনশীল সংবিধানের ক্ষেত্রে সংবিধানগত আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা (British Constitution)

[শাসনব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরিক্রমা—কেল্টিক উপজাতি—জুলিয়াস সীজার—এ্যাংলো-স্যাক্সন যুগ—নর্মান যুগ—মন্টফোর্ড পার্লামেন্ট—সংস্কার। আইন]

শাসনব্যবস্থার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার সূক্ষ্ম সমীক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে শাসনপদ্ধতির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ অনুধাবন করা বিধেয়। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সম্পর্কে স্যার ইলবার্টের যুক্তিপূর্ণ উক্তি প্রণিধানযোগ্য: "The English Parliament strikes its roots so deep into the past that scarcely a single feature of its proceedings can be made intelligible without reference to history" ইতিহাস ঊর্ণনাভের ন্যায় আপনার চারিদিকে ঘটনার জাল বুনিয়া সংবিধানের গতি ও প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছে।

ব্রিটিশ সংবিধানের ভূমিকা

স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট, বাস্তবের উপর পরম রমণীয় গণতান্ত্রিক আদর্শের ছায়াপাতে, অখণ্ড ধারাবাহিকতায়, পার্লামেণ্টারী প্রথার উদ্ভাবনে, নব সৌন্দর্য সৃজন ও প্রবর্তনে, ঘটনা প্রবাহের মাধুর্যে, ও কলা কৌশলের সমৃদ্ধিতে ব্রিটিশ সংবিধান অতুলনীয়। ইতিহাসের ঘটনাক্রমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রমবিবর্তনের মাঝে মাঝে ব্রিটিশ-শাসনতন্ত্র বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে।

বিস্মৃত ইতিহাসের গর্ভ হইতে যখন আমরা ব্রিটেনের প্রথম আত্মপ্রকাশের প্রয়াস লক্ষ্য করি, তখন ইংলণ্ডে কেল্টিক উপজাতি বসবাস করে। খ্রীঃ পূঃ ৫৪ অব্দে গল দেশ হইতে জুলিয়াস সীজার ইংলণ্ড আক্রমণ করেন। ইংলণ্ডে রোমান শাসনের সময় বহু রাজপথ, নগর ও প্রাসাদ নির্মিত হইলেও চারিশত বৎসর স্থায়ী রোমান শাসন ইংলণ্ড হইতে অপসারিত হইবার পর ইংলণ্ডে রোমান শাসনের বিশেষ কোন নিদর্শনই পরিলক্ষিত হয় নাই। রোমান শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এ্যাংগল, স্যাক্সন, ডেন প্রভৃতি বিদেশী জাতি

ইংলণ্ডে গিয়া বসবাস করিতে শুরু করে। ইহার পর উপজাতিসমূহের মধ্যে অন্তবিরোধ শুরু হয়। শক্তিশালী দলগুলি দুর্বল ও শক্তিহীন দলগুলিকে পরাভূত করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে প্রয়াসী হয়। অবশেষে ওয়েসেক্সের উপজাতিগণ রাজত্ব স্থাপনে সক্ষম হয়। ওয়েসেক্সের শাসনকালে উইটান (Witan) সভার মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইত।

স্যাক্সন শাসকদিগের দুর্বলতার সুযোগে দিনেমারগণ ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করেন এবং অবশেষে ১০৬৬ সালে নর্ম্যাণ্ডির উইলিয়াম ইংলণ্ড জয় করেন। নর্মান শাসনব্যবস্থায় সামন্ত প্রথার পূর্ণ-প্রবর্তন দেখা যায় এবং রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। নর্মানগণ ওয়েস্টমিনস্টার হইতে ম্যাগনাম্ কনসিলিয়ামের (Magnum Concilium) মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন। এই ম্যাগনাম্ কনসিলিয়ামের মধ্যে পার্লামেন্টের (Parliament) প্রথম বীজ বপন করা হয়। উক্ত পরিষদ ভিন্ন কুরিয়া রেজিস্ (Curia Regis) নামক একটি ক্ষুদ্র পরিষদ ছিল। রাজাকে পরামর্শ দানের জন্য ঐ পরিষদ গঠিত হইয়াছিল। কুরিয়া রেজিস পরিষদ হইতেই প্রিভি কাউন্সিলের (Privy Council) উদ্ভব হয়। ১১৬৪ সালে দ্বিতীয় হেনরী ক্লারেণ্ডনের সংবিধান রচনা করিয়া শাসন পরিচালনার কয়েকটি নীতি প্রবর্তন করেন। তিনি বিচার বিভাগ হইতে শাসন বিভাগকে পৃথক করিয়া দেন। ১৬৫৩ খ্রী. ক্রমওয়েল শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশনামা প্রচার করেন (Instrument of Government)। এই নির্দেশনামার বলে ব্রিটিশ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় লর্ড প্রটেক্টরের সভাপতিত্বে একটি এক-পরিষদীয় সভার মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ক্রমওয়েলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা লোপ পায়।

বিপ্লবের অবসান হইলে উইলিয়াম ও তাঁর স্ত্রী মেরী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অধিকারের বিল (Bill of Rights) বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হন। ইহার ফলে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি লাভ করে। ইতিপূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা চার্লস অধিকারের আবেদন (Petition of Rights) প্রবর্তনে সম্মতি দিতে বাধ্য হন। কিন্তু চার্লস পরে সর্ত ভঙ্গ করেন বলিয়া বিপ্লব দেখা দেয়। ১৬৮৯ সালে হ্যানোভার বংশের শাসকগণ রাজার ক্ষমতা সংকুচিত করিতে স্বীকৃত হন। এই সময়ে বিখ্যাত আইন, অধিকারের বিল (Bill of

Rights) বিধিবদ্ধ হয়। আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পার্লামেণ্টের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় জর্জ ইংরাজী জানিতেন না এবং ইংলণ্ডের শাসন ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। তৃতীয় জর্জ অবশ্য রাজকীয় ক্ষমতার পুনঃপ্রবর্তনে উৎসাহ প্রদর্শন করেন কিন্তু তাঁহার প্রয়াস বিশেষ কার্যকর হয় নাই কারণ তৎপূর্বে মন্ত্রিসভা ও পার্লামেণ্টের ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রথম জর্জ ও দ্বিতীয় জর্জের আমলে ক্যাবিনেট প্রথার কয়েকটি মূলনীতি প্রবর্তিত হয় এবং ১৭৪২ খ্রীঃ যখন অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় রবার্ট ওয়ালপোল পদত্যাগ করেন তখন মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল এই নজীর সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। ওয়ালপোলকে ইংলণ্ডের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলিয়া অভিহিত করা হইত।

১৮৩২ সালের সংস্কার আইন (The Reforms Act, 1832) কমন্স সভাকে একটি প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক সভায় পরিবর্তিত করে। ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের পর লর্ড সভার ক্ষমতা সংকুচিত হয় ও কমন্স সভার ক্ষমতা বৃদ্ধি লাভ করে, ফলে প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার যথার্থ প্রবর্তন সম্ভব হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উৎস

(Sources of the British Constitution)

[সংবিধানের উৎস—ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তি—পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন—বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত—প্রথাগত আইন—প্রথা—প্রথার অনুমোদন]

ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক আইন ও প্রথাগত বিধান এই উভয় উপাদান লইয়া সংগঠিত। ঐতিহাসিক চুক্তিপত্র, সনদ, পার্লামেণ্টসভা বিরচিত আইন, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, প্রথাগত আইন, প্রথা প্রভৃতির সমন্বয়ে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র গঠিত হইয়াছে। অধ্যাপক মনরো বলিয়াছেন, "It is a complex amalgam of institutions, principles, and practice ; it is a composite of charters and statutes, decisions of common law, of judicial precedents, usages and traditions. It is not one document but thousands of them. It is not derived from one source but from several."

যে সকল গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের সমন্বয়ে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র গঠিত তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্রের কথা স্মরণ করা হয়।

ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র ঃ (Historic Charters)

যে সকল ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র সংবিধানের উৎসস্বরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহাদিগের মধ্যে ১২১৫ সালের মহাসনদ ; (Magna Carta) ১৬২৮ খ্রীঃ অধিকারের আবেদন পত্র (Petition of Rights), ১৬৮৯ খ্রীঃ অধিকারের বিল (Bill of Rights), প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত বন্দোবস্তের আইন (১৭০১ খ্রীঃ) (Act of Settlement) ও স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের সহিত মিলনের চুক্তিপত্রও সংবিধানের উৎসরূপে পরিগণিত হইবার দাবী রাখে।

পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন (Statutes) :

সনদগুলি ব্যতিরেকে পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনগুলিও শাসনতন্ত্রকে যথেষ্ট পুষ্ট করিয়াছে। সরকারের ক্ষমতা ও কার্যপরিচালনা ব্যাপারে সময় সময় পরিবর্তন সাধনের জন্য মধ্যে মধ্যে পার্লামেণ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করে। ১২১৫ সালের মহাসনদ (Magna Carta), আবেদনের বিল (Petition of Rights) (১৬২৮), অধিকারের বিল (Bill of Rights) (১৬৮৯), সংস্কার আইনগুলি (Reforms Act), ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্টের আইন প্রভৃতি বিধিবদ্ধ আইন ব্রিটেনের সংবিধানের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত (Judicial Decisions) :

আদালতে বিচারকগণ সময় সময় শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত আইনসমূহের ব্যাখ্যাকালে নূতন আইনের সৃজন করিতে পারেন। ইংলণ্ডের রাজার আদিম বিশেষ ক্ষমতা (Prerogatives) পার্লামেণ্টের সদস্যদিগের অধিকার প্রভৃতি বিচারকগণের ব্যাখ্যা হইতেই উদ্ভূত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯২০ সালে ডি. কাইজার রয়াল হোটেলের মামলা বিচার প্রসঙ্গে বিচারকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে রাজার আদিম বিশেষ ক্ষমতার সহিত বিধিবদ্ধ আইনের যদি সংঘাত উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে রাজার আদিম বিশেষ ক্ষমতাই বলবৎ থাকিবে।

প্রথাগত আইন (Common Law) :

প্রতি দেশে নিজস্ব পরিবেশগুণে ও স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী কতকগুলি রীতিনীতি গঠিত হয় যাহা পরবর্তীকালে বিচারালয় কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া আইনে পরিণত হয়। অগ্ (Ogg) প্রথাগত আইন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "a vast body of legal precept and usage which through the centuries has acquired binding and almost immutable character." প্রথাগত আইনগুলি মোটামুটিভাবে লিখিত আইন বলিয়া জ্ঞান করা হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, জুরি প্রথা, প্রভৃতি সম্বন্ধীয় আইন প্রথাগত আইনের অন্তর্ভুক্ত এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত প্রথাগত আইনকে

উত্তরোত্তর সঞ্জীবিত করিতেছে। মনরোর মতে, "the common law like statutory law is continually in process of development by judicial decision."

প্রথা (Conventions)

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশে প্রথার অবদান অনস্বীকার্য। প্রথা হইল রাজনৈতিক বেদের সেই অলিখিত নিয়মাবলী যাহা আইনের ন্যায় পবিত্র হইলেও আদালত উহা প্রয়োগে সক্ষম নহে। রাজার সহিত মন্ত্রিপরিষদ বা পার্লামেন্টের সম্পর্ক, পার্লামেন্টের কার্যপদ্ধতি, লর্ডস ও কমন্স সভার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ইংলণ্ডের সহিত অপর স্বায়ত্ত-শাসিত দেশসমূহের সম্পর্ক নির্ধারণে প্রথা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

প্রথা ঃ (Convention)

পারস্পরিক বুঝাপড়ার মধ্য দিয়া, বহুদিনের প্রচলনের জন্য এমন কতক-গুলি রীতিনীতি গঠিত হয় যাহা আইনের ন্যায় পবিত্র হইলেও আদালত কর্তৃক বলবৎ হইতে পারে না। কিন্তু শাসনকার্যে নিযুক্ত সকল ব্যক্তিই ঐ প্রথাগুলিকে মানিতে বাধ্য হয়। আইন ও প্রথার মধ্যে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক।

আইন আদালত কর্তৃক বলবৎ করা হয় কিন্তু আদালত প্রথা বলবৎ করিতে পারে না। আইন সুনির্দিষ্টভাবে বিধিবদ্ধ থাকে, পক্ষান্তরে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রীতিনীতির উদ্ভব হয় বলিয়া সুনির্দিষ্টভাবে তাহা বিধিবদ্ধ করা সম্ভব হয় না। আইন লঙ্ঘন করিলে সরাসরি আইন-ভঙ্গকারীকে নির্দিষ্ট আদালতে বিচারের জন্য উপস্থিত হইতে বাধ্য করা যায়, কিন্তু প্রথাভঙ্গকারীকে প্রথা ভঙ্গের জন্য শাস্তি বিধান করিতে নির্দিষ্ট কোন আদালত নাই অথবা আনুষ্ঠানিক বিচারের কোন ব্যবস্থাও নাই। ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক প্রথা সাধারণতঃ তিনপ্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ, রাজার আদিম বিশেষ ক্ষমতা (Prerogative) ও মন্ত্রিপরিষদ সম্বন্ধীয় প্রথা। দ্বিতীয়তঃ, লর্ডস সভা ও কমন্স সভার পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্লামেন্টের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে গঠিত প্রথা।

তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ড ও স্বায়ত্তশাসিত দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রথা কিয়ৎপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে।

রাজা ও মন্ত্রি-পরিষদ সম্পর্কিত প্রথা :

ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক প্রথা অনুযায়ী রাজা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন।

প্রধান মন্ত্রীর সুপারিশে রাজা অন্যান্য মন্ত্রীদিগের নিয়োগ করেন।

পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত বিলগুলি রাজার অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকে।

কোন না কোন মন্ত্রীর উপদেশে রাজা কার্য পরিচালনা করেন।

মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ সকলেই পার্লামেণ্টের সভ্য এবং পার্লামেণ্টের নিকট তাঁহাদের কার্যের জন্য দায়ী থাকেন।

মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকেন ও পার্লামেণ্টের আস্থা হারাইলে পদত্যাগ করেন।

রাজাকে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পরামর্শদানের পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ কমন্স সভার অনুমোদন লাভ করেন।

লর্ডস ও কমন্স সভার সম্পর্কিত প্রথা :

লর্ডস সভা ও কমন্স সভার মধ্যে কোন কারণবশতঃ সংঘাত উপস্থিত হইলে কমন্স সভার নিকট লর্ডস সভা নতি স্বীকার করিবে।

ব্যয়ভার সংক্রান্ত বিল কমন্স সভায় পেশ করা হইবে।

বৎসরে একবার অন্ততঃ পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে।

পার্লামেণ্টারী কমিটিগুলিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি তাহাদের সভ্যসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার লাভ করিবে।

ইংলণ্ড ও অন্যান্য ডোমিনিয়ন সম্পর্কিত প্রথা :

ডোমিনিয়নগুলির অনুরোধ ব্যতীত ডোমিনিয়নগুলির জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কোনরূপ আইন প্রবর্তন করিবে না।

ডোমিনিয়নের মন্ত্রিসভার উপদেশে ডোমিনিয়নের গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইবে। ডোমিনিয়ন মন্ত্রিপরিষদের উপদেশক্রমে গভর্ণর-জেনারেল

কার্য পরিচালনা করিবেন। সকল গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য ইংলণ্ড ও ডোমিনিয়নগুলি একত্রে কার্য করিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রথার গুরুত্ব ও উপযোগিতা প্রবেশ করিয়াছে। ডঃ জেনিংস (Jennings) তাই বলিয়াছেন, "The short explanation of constitutional conventions is that they provide the flesh which clothes the dry bones of the law, they make the legal constitution work." দেশের বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন সময়ে আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রথাগত বিধান গঠিত হইয়াছে।

প্রথার অনুমোদন (Sanctions behind conventions) :

শাসনতান্ত্রিক প্রথা মানিয়া চলা হয় কেন এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে উপস্থিত হইতে পারে। ডাইসির (Dicey) মতে প্রথাগত বিধান ভঙ্গ করিলে শেষ পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক আইন অকার্যকরী হইয়া উঠিবে এবং শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর বনিয়াদ শিথিল হইয়া যাইবে। উদাহরণ স্বরূপ ডাইসি বলেন যে পার্লামেন্টের অধিবেশন যদি এক বৎসরের জন্য আহ্বান না করা হয় তাহা হইলে সৈন্য সংক্রান্ত আইন ও অন্যান্য অর্থব্যয় সংক্রান্ত বিল গৃহীত হইবে না এবং রাজার অনুমোদন লাভ করিতে পারিবে না। বর্তমানে অবশ্য অনেকেই ডাইসির যুক্তি অনুমোদন করেন না। জেনিংস, হুড ফিলিপ প্রভৃতি সংবিধান শাস্ত্রে সুপণ্ডিতগণের মতে ডাইসি কয়েকটি বিশেষ প্রথা সম্পর্কে উদাহরণ সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু তাহার উদাহরণ সর্বত্র প্রযোজ্য নহে।

বস্তুতঃ আইনভঙ্গ হইবে বলিয়াই প্রথা মানিয়া চলা হয় এই সিদ্ধান্ত ঠিক নহে উপরন্তু রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে প্রথাগত বিধান মানিয়া চলা হয়। হুড্ ফিলিপসের মতে, The question why conventions are observed is a political and psychological question (Hed Philip's)। প্রথাগত আইন মান্য করিয়া চলিবার অন্যতম কারণ হইল জনমতের প্রভাব। প্রথাগত বিধানের শক্তির অন্যতম উৎস হইল জনমত। জনসাধারণ মানিতে চায় বলিয়াই প্রথা মানিয়া চলা হয়। প্রথাগুলি স্বভাবতঃ জনপ্রিয়

বলিয়া শাসকবর্গ জানেন যে ঐ প্রথা ভঙ্গ হইলে জনগণ বিক্ষুব্ধ হইবে এবং মন্ত্রিপরিষদ জনসাধারণের আস্থা হারাইবেন। ওয়েড ও ফিলিপের মতে (Wade and Philip) "Breach of conventions in any case is far more likely to lead to political action than to proceedings in the court being brought against the offender." গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় গঠিত ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করিয়া কোন পরিকল্পনা গ্রহণে সাহসী হইবে না। এতদ্ব্যতীত উপযোগিতা না থাকিলে, যুক্তি না থাকিলে প্রথা জনপ্রিয়তা লাভ করিত না। গণতান্ত্রিক মাত্রই স্বীকার করিবেন, প্রকৃত জনমত যুক্তির উপরই গঠিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শাসকবর্গ প্রথা অনুসরণ করিতেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের একটি ধারাবাহিকতা আছে, অতএব সচরাচর ঐতিহ্যকে অস্বীকার করিয়া নূতন কোন পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে জটিলতা সৃষ্টি করিতে কেহই বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন না।

এতদ্ব্যতীত প্রথাগত বিধান ভঙ্গ করা হইলে প্রথার বিষয়বস্তু আইনে পরিণত করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অর্থ সংক্রান্ত বিল নাকচ করিবার অধিকার বহুকাল লর্ডস সভা প্রয়োগ না করায় ধরিয়া লওয়া হয় লর্ডস সভার উক্ত অধিকার বাজেয়াপ্ত হইয়াছে এবং প্রথাগত বিধান হিসাবে লর্ডস সভাকে অর্থ সংক্রান্ত বিল নাকচ করিবার প্রয়াস হইতে বিরত থাকিতে বলা হয়।

কিন্তু ১৯০৯ সালে লর্ডস সভা বিখ্যাত লয়েড জর্জ বাজেট প্রত্যাখ্যান করেন। কমন্স সভা লর্ড সভার এই আচরণকে সংবিধান বিরোধী বলিয়া মনে করেন ও ১৯১১ সালের পার্লামেন্টের আইন বিধিবদ্ধ করেন। উক্ত আইনের বলে লর্ডস সভা অর্থ সংক্রান্ত বিল নাকচ অথবা অনুমোদনে অযথা বিলম্ব করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন।

প্রয়োজন অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের সংস্কার সম্ভব ও সহজ পরিবর্তনশীলতা বিদ্যমান বলিয়া প্রথাগত বিধানের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

(Characteristics of the British Constitution)

[(১) সংবিধান অলিখিত, যদিও কতিপয় অংশ লিখিত—(২) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা—(৩) সুপরিবর্তনীয়—(৪) ক্ষমতা এককেন্দ্রীকরণ নীতি—(৫) আইনের অনুশাসনের প্রভাব—(৬) পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতা—(৭) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র—(৮) সংবিধানের ধারাবাহিকতা]

ফরাসী রাষ্ট্রনীতিবিদ্ টকেয়াভেলী (Toqueville) এবং অন্যান্যের মতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের কোন অস্তিত্বই নাই। তিনি বলেন "En Angleterre la Constitution—elle n' existe point." মার্কিন রাষ্ট্রনীতিবিদ্ টমাস পেইনের (Thomas Paine) মতে, যাহা দ্রষ্টব্য নহে, যাহা উপস্থাপিত করা যায় না তাহাকে কখন সংবিধান আখ্যা দেওয়া যায় না। কথিত আছে লণ্ডনের কোন এক পাঠাগারে কোন মার্কিন ছাত্র একখানি ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র দেখিতে চাহেন কিন্তু পাঠাগারের অধ্যক্ষ দুঃখের সহিত তাঁহার অক্ষমতা স্বীকার করেন।

সংবিধান বলিতে সাধারণতঃ রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হইবে, সরকারের কার্যাবলী, নাগরিকের অধিকার প্রভৃতি সম্পর্কিত একটি মৌলিক আইন ও নিয়মাবলীর লিখিত দলিল বুঝায়। এই সংজ্ঞা মার্কিন সংবিধান সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য হইলেও ব্রিটেনে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া অধ্যাপক মনরো বলেন, "It is a complex amalgam of institutions, principles and practices, it is composite of charters and statutes, decisions of common law, of judicial precedents, usages and traditions. It is not one document but thousands of them. It is not derived from one source but from several."

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে লিখিত শাসনতন্ত্র নহে। প্রথা, ঐতিহ্য, প্রচলিত রীতিনীতির সমন্বয়ে অলিখিত শাসন-ব্যবস্থা ব্রিটেনে প্রচলিত।

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে লিখিত নহে

অবশ্য পৃথিবীর কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণ লিখিত দলিল নহে। কিছু পরিমাণ অলিখিত অধ্যায়ের সমন্বয়েই প্রত্যেক শাসনতন্ত্র গঠিত। অনেকে মনে করেন, লিখিত সংবিধানের অভাবে নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা সম্ভব নহে। ব্রিটেন এই সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম।

ব্রিটেনে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া ও কাঠামো রক্ষার জন্য লিখিত দলিলের প্রয়োজন আজিও অনুভূত হয় নাই। নাগরিক অধিকারে অহেতুক অন্যায় সরকারী হস্তক্ষেপের কোন সুস্পষ্ট নজীর আজিও স্থাপিত হয় নাই। বস্তুতঃ অধিকার প্রকৃতির দান নহে।

সংবিধানের কতকাংশ লিখিত

মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশের জন্য অধিকারের প্রয়োজন আর সে অধিকার অর্জন করিতে হয়। রাজনৈতিক সচেতন-নাগরিক, অধিকার সর্বদা সর্ব অবস্থায় উপভোগ করে। এতদ্ব্যতীত ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মধ্যে লিখিত অংশ যে একেবারেই নাই, একথা সত্য নহে। সনদ, বিধিবদ্ধ আইন, আইনের ব্যাখ্যা প্রভৃতিও ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অন্যতম উৎস।

লর্ড ব্রাইস্ ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বলিয়াছেন, a "mass of precedents carried in men's minds or recorded in writing, of dicta of lawyers or statesmen, of customs, usages, understandings and beliefs bearing upon the methods of government together with a certain number of statutes⋯."

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র এককেন্দ্রিক শাসনতন্ত্র, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রীয় নহে। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই রাষ্ট্রের সমুদয় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন বিভাগ যথা—কাউন্টি ও বারো প্রভৃতির নিজস্ব কোন স্বাধীন সত্তা নাই। সমগ্র ইংলণ্ড কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাসিত। অবশ্য অধ্যাপক Wheare-এর মতে

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারগুলিও এককেন্দ্রিক কাঠামোর রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান ভয়াবহতা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বেকার ও শিক্ষা সমস্যা প্রভৃতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করিতেছে।

সহজে পরিবর্তনশীল সংবিধান

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অন্যতম অপর এক বৈশিষ্ট্য হইল সহজ পরিবর্তনশীলতা। ব্রিটিশ সংবিধানের অংশবিশেষ পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। ব্রিটেনে সাধারণ আইনের সহিত শাসনতন্ত্রের আইনের কোন পার্থক্য করা হয় না। পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া বা ভারতবর্ষের সংবিধানের সংশোধনের জন্য বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতা

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব। পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবর্তন প্রভৃতি সকল ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। পার্লামেণ্টের সদস্যদিগের মধ্য হইতে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় এবং পার্লামেণ্টের নিকট মন্ত্রিপরিষদ দায়ী থাকে। আদালতগুলি পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা (interpretation) করিতে পারে কিন্তু কোন ক্রমেই বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। পার্লামেণ্ট শাসন ব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তিত করিতে পারে। পার্লামেণ্টের গুরুত্ব প্রসঙ্গে অধ্যাপক মন্‌রো বলেন, "The British Constitution is the mother of Constitutions, the British Parliament is the mother of Parliaments." বস্তুতঃ কোন এক রসিক রাষ্ট্রনীতিবিদ বলেন, নারীকে পুরুষে বা পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ব্যতীত সকল কার্যই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সাধন করিতে পারে। আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যাপারে পার্লামেণ্টেব অবাধ ক্ষমতা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ক্ষমতার সীমারেখা

বর্তমানে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সার্বভৌম ক্ষমতার সীমারেখা নির্ধারিত হইয়াছে। আইন অনুসারে পার্লামেণ্ট সার্বভৌম হইলেও রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা জনগণ বা নির্বাচক মণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত।

দ্বিতীয়তঃ, ব্ল্যাকস্টোনের মতে আন্তর্জাতিক আইনের প্রচলন পার্লামেণ্টের সার্বভৌম অবাধ ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করিয়াছে। আন্তর্জাতিক বিধি-নিষেধ, চুক্তি প্রভৃতি পার্লামেণ্টকে মানিয়া চলিতে হয়।

তৃতীয়তঃ, ডোমিনিয়নগুলির ক্ষেত্রে ১৯৩১ সালে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়। ডোমিনিয়নগুলির বিনা আমন্ত্রণে পার্লামেণ্ট ডোমিনিয়নগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ হইতে বিরত হয়।

সাধারণতঃ প্রথাগত আইনের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্ট আইন বিধিবদ্ধ করে না।

ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতা পৃথকীকরণের কোন ব্যবস্থা নাই। আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ একে অপরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ও সম্পর্কযুক্ত। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। পার্লামেণ্টের যেমন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশের অধিকার আছে মন্ত্রিসভাও ইচ্ছা করিলে পার্লামেণ্টের অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রাণী বা রাজাকে পরামর্শ দান করিতে পারেন। লর্ডস সভায় লর্ড চ্যান্সেলর সভাপতি, তিনি মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং সর্বোচ্চ আপীল আদালতের বিচারক।

ক্ষমতা এককেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি

ব্রিটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় একজন নামেমাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিনায়ক থাকে। ইংলণ্ডে রাজাই নামেমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজার করণীয় কিছুই নাই। তাঁহার ক্ষমতা বিশেষ সীমিত। আইনগতভাবে রাজা সর্বক্ষমতার অধিকারী হইলেও ব্রিটেনে প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। Ogg বলিয়াছেন, "The Government of U. K. is in ultimate theory an absolute monarchy and in actual character a democratic republic."

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকভাবে গঠিত হইয়াছে। জার্মানী, রাশিয়া, ফ্রান্স সর্বত্র বিপ্লব, দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে কোন বড় রকমের সংঘাত কখনও উপস্থিত হয় নাই। ব্রিটিশ সংবিধানকে মনরো "a process of growth" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিলেন। তিনি আরো বলেন, "It

সংবিধানের ধারাবাহিকতা

is a child of wisdom and a chance whose course has sometimes been guided by accident and sometimes by high design." প্রয়োজনের সহিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সমতা রক্ষা করিয়া ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র রিবর্তন লাভ করিয়াছে।

গ্রেট ব্রিটেনে দায়িত্বশীল সরকার স্থাপিত হইয়াছে। মন্ত্রিপরিষদই পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকিয়া সকল শাসনকার্য নির্বাহ করে।

দায়িত্বশীল সরকার

রাশিয়ার ন্যায় ব্রিটেনে মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত কোন লিখিত দলিল নাই। ডাইসির মতে, আইনের অনুশাসনের প্রভাবে ইংলণ্ডের নাগরিক মৌলিক অধিকারগুলি উপভোগ করিতে পারে। ক্ষমতা ও মর্যাদা নির্বিশেষে ইংলণ্ডে সকল ব্যক্তিই আইনের চক্ষে সমান। প্রধানমন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া নগণ্য কর আদায়কারী পর্যন্ত সকলেই আইনের চক্ষে সম অপরাধের জন্য সমভাবে দায়ী। ডাইসি বলেন, "With us every official from the Prime Minister to a constable or a collector of taxes, is under the same responsibility for every act done without legal justification to any other citizen."

মৌলিক অধিকারের লিখিত দলিল নাই

আইনের অনুশাসন (Rule of Law):

আইনের অনুশাসন ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আইনের অনুশাসনের ফলে সরকার যথেচ্ছাচার করিতে সাহসী হয় না। আইনের চক্ষে সকলে সমান বলিয়া বিবেচিত হয়। আইনের অনুশাসন ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

ডাইসির ব্যাখ্যা অনুসারে সুস্পষ্ট আইন লঙ্ঘনের নজীর ব্যতীত কোন ব্যক্তির শাস্তি বিধান করা আইনের অনুশাসন অনুযায়ী অসঙ্গত। উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সকলেই আইনের চক্ষে সমান। আইনের দ্বারা জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করা হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রিটেনে নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলি আইনের অনুশাসন মারফৎ সংরক্ষিত হয়। আইন প্রণয়নের

ব্যাপারে আইনের অনুশাসন পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করে। আইনের ব্যাখ্যার জন্য আদালত আইনের অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

আইনের অনুশাসন অনুযায়ী ইংলণ্ড একটি আইন দ্বারা শাসিত এবং সেই আইন সকলের নিকট মহান। মানুষের অধিকার সংরক্ষণের জন্য শাসনতান্ত্রিক আইনের সৃষ্টি হইয়াছে।

বস্তুতঃ ইংলণ্ডের প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে গঠিত আইনের অনুশাসন শতাব্দী ধরিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনের যথোপযুক্ত প্রতিফলন। আমেরিকার ন্যায় অবশ্য ক্ষমতার পৃথকীকরণ সম্ভব হয় নাই বলিয়া ব্রিটেনে স্বাধীনতা সংকুচিত হয় নাই। ব্রিটেনে ব্যক্তিস্বাধীনতা পূর্ণভাবেই বিরাজমান।

মূলতঃ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে, আইনের চক্ষে শ্রেণীগত বিভেদ সৃষ্টির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আইনের অনুশাসন এক জীবন্ত প্রতিবাদ।

কিন্তু আইনের অনুশাসনেরও সীমাবদ্ধ আয়তন আছে। আইনের অনুশাসনের কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে, রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না। (The King can do no wrong)। কোন কাজের জন্য রাজা জবাবদিহি করেন না। ইংলণ্ডের রাজাকে বিচার করিবার অধিকার কোন আদালতের নাই। রাজার বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা আনয়ন সম্ভব নহে।

আইনের অনুশাসনের কতিপয় ব্যতিক্রম

কোন সরকারী কার্য সম্পাদনের জন্য সরকারী কর্মচারীকে আইনের অনুশাসনের এক্তিয়ারভুক্ত করা যায় না। আদালতে বিচারকার্য পরিচালনার সময় বিচারকগণ তাঁহাদের কার্যের জন্য আইনের অনুশাসনের নিকট দায়ী থাকেন না।

যদি কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করা হয় তাহা হইলে হেবিয়াস কর্পাস আইনের বলে বন্দী ব্যক্তিকে কোন আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে এবং আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত শাস্তিবিধান স্থগিত রাখিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্র

(Monarchy in Great Britain)

[রাজতন্ত্র—ব্যক্তি রাজা ও প্রতিষ্ঠানগত রাজা—গণতান্ত্রিক কাঠামো ও রাজতন্ত্র—রাজশক্তির প্রাধিকার—রাজার ক্ষমতা—রাজতন্ত্রের উপযোগিতা—রাজতন্ত্রের টিকিয়া থাকিবার কারণ—প্রিভি কাউন্সিল—উদ্ভব—প্রিভিকাউন্সিল হইতে ক্যাবিনেট সভার উদ্ভব—গুরুত্বপূর্ণ কার্য—বর্তমান সদস্যসংখ্যা ও গুরুত্ব]

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজা রাজতন্ত্রের নিদর্শন স্বরূপ পূর্বাহ্নে স্বয়ং সরকার পরিচালনা করিতেন। রাজা একাধারে শাসনবিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইনবিভাগের সর্বময় অধিকর্তা ছিলেন। ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র যখন স্বৈরতন্ত্রের নামান্তর ছিল তখন আইন প্রণয়ন বা শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে রাজা যথেচ্ছাচার করিতে পারিতেন। এক কথায় তদানীন্তন সময় রাজা ছিলেন প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী।

রাজা রাজতন্ত্রের নিদর্শন স্বরূপ

একদা ইংলণ্ডের রাজা নির্বাচিত হইতেন, অবশেষে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজার সিংহাসনে আরোহণ করিবার প্রথা প্রচলিত হয়।

বর্তমানে সময় ও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তিতে গঠিত ইংলণ্ডে রাজার ক্ষমতা সংকুচিত করা হইয়াছে।

গণতান্ত্রিক কাঠামোতে রাজার ক্ষমতা

রাজা ও রাজতন্ত্রের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা বিধেয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, রাজতন্ত্র রাজার নিদর্শনস্বরূপ। ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে গণতান্ত্রিক ইংলণ্ডে রাজা শুধু রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। গ্ল্যাডস্টোনের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য "there are many subtle distinctions in the vernacular of British Government but none more vital than the distinction between the King and the Crown." রাজার সম্পূর্ণ বাস্তব অস্তিত্ব আছে, পক্ষান্তরে রাজতন্ত্র একটি ধারণায় পর্যবসিত হইয়াছে। রাজা একজন ব্যক্তি যাঁহার হস্তে শাসন-ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে. অপরদিকে রাজতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান বা একটি বিশেষ

রাজা ও রাজতন্ত্র

পদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাজা এবং রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য "রাজার মৃত্যু নাই" "রাজার মৃত্যু হইয়াছে রাজা দীর্ঘজীবি হউন" প্রভৃতি প্রচলিত বাক্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। প্রচলিত বাক্যগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করিলে রাজা ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়। ব্যক্তি হিসাবে রাজার মৃত্যু হইতে পারে কিন্তু প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজপদের মৃত্যু নাই। ব্যক্তি হিসাবে রাজার অস্তিত্ব সাময়িক হইলেও প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজপদ চিরন্তন। অতীতে ব্যক্তি রাজা যে সকল ক্ষমতা উপভোগ করিত বর্তমান গণতান্ত্রিক কাঠামোতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেই সকল ক্ষমতার আধাররূপে পর্যবসিত হইয়াছে।

রাজশক্তির নিজস্ব :প্রাধিকার (Personal Prerogatives of the King):

রাজার প্রাধিকারসমূহ বিশেষ আদিম ক্ষমতা এবং ঐ প্রাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজা পার্লামেন্টের অনুমোদন ভিক্ষা নাও করিতে পারেন। এইগুলি রাজার স্বকীয় ক্ষমতা বলিয়া পরিচিত। অবশ্য বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভাই রাজার প্রাধিকারসমূহ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না (The king can do no wrong):

ব্যক্তিগতভাবে রাজাকে কেবল রাজকার্যের জন্য দায়ী করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে রাজাকে কোন আদালত বিচার করিতে পারেন না। অবশ্য ১৯৪৭ সালের আইন অনুসারে (Crown Proceedings Act) রাজার যে কোন বিভাগের বিরুদ্ধে আদালত মামলা আনয়নে সক্ষম। রাজার নামে মন্ত্রিসভা শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং রাজার প্রতিটি কার্যের জন্য কোন না কোন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা মন্ত্রিসভা দায়ী থাকে। রাজার নামে অনুষ্ঠিত কোন অন্যায় কার্যের জন্য জবাবদিহি করে মন্ত্রিসভা। রাজা শুধু অন্যায় কার্য করিতেই অক্ষম নহেন অন্যায় কার্য করিবার আদেশ দানেও তিনি অপারগ। কোন রাজকর্মচারীই রাজার আদেশের অজুহাতে অন্যায় করিয়া ব্যক্তিগতভাবে নিষ্কৃতি লাভ কবিতে পারিবে না।

একথাও বলা হয় রাজা অন্যায় কার্য, অন্যায় আদেশ দেওয়া দূরে থাকুক, অন্যায় চিন্তাও করিতে অপারগ।

রাজার মৃত্যু নাই (The king never dies)

প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজতন্ত্র অমর। ব্যক্তিগত রাজার (individual monarch) মৃত্যু সম্ভব, কিন্তু প্রতিষ্ঠানগত রাজার (institutional monarchy) মৃত্যু সম্ভব নহে। ব্ল্যাকস্টোন (Blackstone) বলিয়াছেন, ব্যক্তি হিসাবে হেনরী, এডওয়ার্ড প্রভৃতির মৃত্যু ঘটিতে পারে কিন্তু রাজপদের অস্তিত্ব অবিনশ্বর প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজতন্ত্র রাজশক্তির নিয়ন্ত্রক। এক রাজার মৃত্যু হইলে অন্য রাজা শাসনভার গ্রহণ করেন এবং এইভাবে রাজকীয় ক্ষমতার ধারাবাহিকতা অপ্রতিহত থাকে।

রাজা কোন অবস্থাতেই শিশু নহেন (The king is never an infant):

রাজবংশের কোন শিশু উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করিলে রাজকার্য সম্পাদনের সময় তাহাকে শিশু বলিয়া গ্রহণ করা হয় না। শিশু বলিয়া রাজকার্য যথারীতি পরিচালনা করিতে দিতে কেহ বাধা দেন না। পার্লামেণ্টের বিল অনুমোদন হইতে শুরু করিয়া সকল রাজকার্য সম্পাদনের তিনি যোগ্য বলিয়া স্বীকার করা হয়।

সময়ের ব্যবধানে রাজার মামলা আনয়নে কোন বাধা নাই (Lapse of time does not bar king's right to sue):

অতীতে সময়ের ব্যবধানের অজুহাতে রাজার মামলা রুজু করিবার ক্ষমতা ব্যাহত করা যাইত না। বর্তমানে পার্লামেণ্ট রাজার এই প্রাধিকার বিশেষ সঙ্কুচিত করিয়াছে।

রাজার ক্ষমতা (Powers of the king):

রাজার বিশেষ আদিম ক্ষমতা (Prerogative) সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ডাইসি (Dicey) বলিয়াছেন, "The residue of discretionary or arbitrary authority which at any time is legally left in the hands of the crown." রাজা ব্যক্তিগত প্রাধিকার ব্যতিরেকে যে সকল

ক্ষমতা উপভোগ করেন তাহার উৎস হইল পুরাতন কালের প্রচলিত রীতিনীতি ও পার্লামেন্টের বিধিবদ্ধ আইন।

শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা ঃ

নামে রাজা হইলেন শাসনবিভাগের অধিকর্তা কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে শাসনবিভাগ পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাজা প্রধান মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রিবর্গকে নিয়োগ করেন। শাসন বিভাগের প্রায় সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগকে রাজা নিয়োগ করেন। বিচারক প্রভৃতি কয়েকটি নির্দিষ্ট কর্মচারী ব্যতীত সকলকেই রাজা পদচ্যুত করিতে পারেন। বৈদেশিক নীতি পর্যালোচনার অধিকার রাজার হস্তে ন্যস্ত। রাজা বিদেশী রাষ্ট্রদূতদিগের গ্রহণ (receive) করেন ও অন্যান্য রাষ্ট্রে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন। তাঁহার নামে যুদ্ধঘোষণা ও শান্তিস্থাপনা হয়। স্থল, নৌ ও বিমানের সর্বময় কর্তৃত্ব রাজার হস্তে ন্যস্ত।

আইন প্রণয়ন সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ঃ

রাজা পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন অথবা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। রাজার অনুমোদন ব্যতিরেকে পার্লামেন্টে গৃহীত কোন বিল আইনরূপে প্রচলিত হইতে পারে না। প্রয়োজন হইলে রাজা পার্লামেন্টের পুনর্গঠনের আদেশ দিতে পারেন ও নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। রাজা সপরিষদ রাজাজ্ঞার মাধ্যমে (Order in Council) আইন প্রণয়ন করিতে পারেন।

বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ঃ

রাজা ন্যায় বিচারের অন্যতম উৎস। অতীতে রাজার বিচার বিভাগে সক্রিয় অংশ ছিল। বর্তমানে রাজার বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা সংকুচিত হইয়াছে। রাজাকে কেবল ন্যায় বিচারের উৎসস্বরূপ বলিয়াই মনে করা হয় না, কেহ কেহ সুবিচারের পরিবেশক (distributor) রূপেও রাজাকে চিত্রিত করিয়াছেন। রাজা বিচারকগণকে নিয়োগ করেন, ফৌজদারী মামলা রাজার নামে রুজু করা হয়। দণ্ডাদেশ—মকুব, লঘু বা প্রত্যাহার

করিবার ও অপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার রাজার আছে। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ডোমিনিয়নগুলি হইতে প্রিভি কাউন্সিলে যে আপীল করা হয় তাহার রায় প্রদান করেন রাজা। নূতন আদালত সৃষ্টি করিবার জন্য রাজা প্রাধিকার প্রয়োগ করিতে পারেন।

সম্মান বিতরণের উৎস (Fountain of Honour):

রাজা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিবর্গকে সম্মানমণ্ডিত উপাধিদ্বারা উদ্ভাসিত করিতে পারেন। অবশ্য এ ব্যাপারেও তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করেন।

বিবিধ ক্ষমতা:

রাজা ইংলণ্ডের গীর্জার প্রধান অধিকর্তা এবং তিনি সকল বিশপ ও আর্চবিশপগণকে নিয়োগ করেন।

শ্রেষ্ঠ ও প্রধান সামন্ত হিসাবে রাজা সাধারণ বা অসাধারণ উপায়ে রাজস্ব আদায় করিবার প্রাধিকার প্রয়োগ করিতে পারেন। এইজন্য রাজাকে গুপ্তধনের অধিপতি (Treasure Trove) বলা হয়। সামরিক প্রয়োজনে অথবা আপৎকালীন সময়ে রাজা প্রজাদিগের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।

অবশ্য একথা সর্বদাই মনে রাখা বিধেয় যে অধিকাংশ ক্ষমতাই রাজা ব্যক্তি হিসাবে প্রয়োগ করিতে অক্ষম, রাজশক্তি উহা প্রয়োগ করিয়া থাকে।

রাজতন্ত্রের উপযোগিতা (Utility of Monarchy):

অনেকে মনে করেন গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় রাজতন্ত্রের অবস্থান বিসদৃশ ব্যাপার। গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র পরস্পর আপাত-বিরোধী। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ মনে করেন ক্ষমতাবিহীন রাজতন্ত্র বজায় রাখা সম্পূর্ণ অহেতুক এবং ব্যয়বহুল।

ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের অবস্থানের কয়েকটি বিশেষ যুক্তিপূর্ণ কারণ আছে।

প্রথমতঃ, ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র কোন অবস্থাতেই গণতন্ত্রের সহিত সংঘাতে লিপ্ত হয় নাই। গণতান্ত্রিক বিবর্তনকে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র কোন অবস্থাতেই প্রতিহত করে নাই। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের কাঠামো মানিয়া লইয়াছে। বস্তুতঃ ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। রাজতন্ত্রের সহিত গণতন্ত্রের কোন বিরোধ উপস্থিত হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের রাজার জনপ্রিয়তা অনস্বীকার্য। রাশিয়ার জার বা ফ্রান্সের রাজার ন্যায় ইংলণ্ডের রাজা এক ভয়াবহ জীব বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজতন্ত্রকে ইংরাজ মাত্রই শ্রদ্ধাসহকারে প্রীতির চক্ষে দেখেন।

তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্টারী কাঠামোতে একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসকের অবস্থান প্রয়োজন। রাজা ইংলণ্ডে এই প্রয়োজন মিটান। ইংলণ্ডের রাজার কয়েকটি নির্দিষ্ট কার্যাবলী আছে। রাজা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করিতে আহ্বান জানান। রাজা পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করেন। তিনি ইচ্ছা করিলে অধিবেশন স্থগিত বা ভঙ্গ করিতেও পারেন।

পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার পদত্যাগের ফলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন কোন সরকার শাসন করে না। ঐরূপ জটিল অবস্থায় একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক অধিকর্তাই শাসনভার গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে রাজা পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা চালু রাখিতে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

রাজা দল উপদল প্রভৃতির ঊর্ধ্বে। সমগ্র জাতি রাজার প্রতি সেইজন্য স্বাভাবিক আনুগত্য প্রদর্শন করে। দেশপ্রেম ও আনুগত্য জাগ্রত করিবার জন্য রাজতন্ত্রের অবদান অনস্বীকার্য। রাজতন্ত্র ইংলণ্ডের নাগরিকদিগের মনে এক নিরাপত্তার সৃষ্টি করে। বলা হইয়াছে –"With the King in Buckingham palace, people sleep the more quietly in their beds."

কিছুকাল পূর্বেও রাজা কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির ঐক্যের নিদর্শনস্বরূপ ছিলেন।

সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রেও রাজতন্ত্রের প্রভাব সীমাহীন। রাজার আচার ব্যবহার সাধারণ লোক অনুকরণ করে। রাজা নাগরিকদিগের আদর্শের প্রতীক।

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজা, যুক্তিযুক্ত পরামর্শদানে মন্ত্রিসংসদকে প্রভাবিত করিতে পারেন এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে উৎসাহিত করিতে সক্ষম হন। বস্তুতঃ রাজা ঐক্যের, মর্যাদার ও স্থায়িত্বের মূর্ত প্রতীক। Lowell যথার্থই বলিয়াছেন, "If the King is no longer the motive power of the

State, it is the spar on which the sail is bent, and as such it is not only useful but an essential part of the vessel."

প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council)

রাজার নামে মন্ত্রিপরিষদ ব্রিটিশ সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা করিলেও প্রিভি কাউন্সিলকে মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতার অন্যতম শাসনতান্ত্রিক যন্ত্ররূপে অভিহিত করা যায়। পূর্বে রাজার ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে প্রিভি কাউন্সিল পরামর্শদাতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। নরম্যান শাসনকালে কুরিয়া রেজিস্ (Curia regis) হইতে প্রিভি কাউন্সিলের উদ্ভব হয়। কুরিয়া রেজিসের সদস্যবৃন্দ অধিকাংশই ছিলেন ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান সামন্ত। টিউডর রাজাদিগের আমলে কুরিয়া রেজিসের সদস্যবৃন্দের ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করে। রাজার অর্থনৈতিক, বিচারবিভাগীয়, ও শাসনবিভাগীয় প্রভৃতি সকল প্রাধিকার ও ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কুরিয়া রেজিসের সভ্যবৃন্দ সমষ্টিগতভাবে উপদেশ প্রদান করিত। কালের গতিতে কুরিয়ার সদস্যসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি লাভ করে, ফলে দ্বিতীয় চার্লস কুরিয়ার সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে কয়েকজন প্রধান সহকর্মী মনোনয়ন করেন তাঁহাকে সর্বব্যাপারে উপদেশ দানের জন্য। এইভাবে মন্ত্রিপরিষদ বা ক্যাবিনেটের জন্ম হয়।

কুরিয়া রেজিস

ক্যাবিনেট সৃষ্টির পর কুরিয়া তথা প্রিভি কাউন্সিলের গুরুত্ব বিশেষ হ্রাস পায়। অতীতে প্রিভি কাউন্সিলের উপদেষ্টা ও কাযকরী দুইটি বিভাগই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু রাণী এ্যানের (Anne) মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রিভি কাউন্সিলের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচিত হয়। অবশ্য ক্যাবিনেটের শক্তির উৎসস্বরূপ প্রিভি কাউন্সিলের অস্তিত্ব এখনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত সপরিষদ রাজাজ্ঞা প্রবর্তনে প্রিভি কাউন্সিলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রাজার কার্যাদি প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দের সম্মতি ও অনুমোদন ক্রমে প্রযোজিত হয়। অবশ্য বর্তমানে রাজাকে পরামর্শদানের দায়িত্ব ক্যাবিনেট গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রিভি কাউন্সিলের কার্য আনুষ্ঠানিকরূপে পর্যবসিত হইয়াছে।

ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভব

যুদ্ধ ঘোষণা, পার্লামেণ্টের সভা আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করা,

জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে সপরিষদ রাজাদেশ প্রণয়নে (orders in council) প্রিভি কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। এতদ্ব্যতীত প্রিভি কাউন্সিলের পরিচালনায় মন্ত্রী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের শপথ গ্রহণ করান হয়। শেরিফগণ প্রিভি কাউন্সিল কর্তৃক নিয়োজিত হন।

প্রিভি কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি

প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে প্রায় তিনশত ত্রিশ। সদস্যগণ রাজা কর্তৃক আজীবন সদস্যরূপে মনোনীত হয়। বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিগণ, রাষ্ট্রীয় মন্ত্রিগণ, ক্যাবিনেটের সকল সদস্য, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক; রাজপরিবারের সদস্য ক্যাণ্টারবেরী ও ইয়র্কের আর্চবিশপ প্রভৃতি প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য পদ পান। এতদ্ব্যতীত কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে কৃতি ব্যক্তিদিগকে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য বলিয়া মনোনয়ন করা হয়।

সদস্য সংখ্যা

সকল সদস্যের পক্ষে মিলিত হইয়া কাউন্সিলের কার্য পরিচালনা সকল সময় সম্ভব নহে অতএব কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেণ্ট ও ক্লার্ক সহ চার অথবা পাঁচজন সদস্য দ্বারা প্রয়োজনীয় কর্ম পরিচালিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেট

(The Ministry and the Cabinet)

[ক্যাবিনেট সভার গুরুত্ব—ধারাবাহিকতা—প্রথম চার্লস—ওয়ালপোল ও ক্যাবিনেট সভা—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও সর্বদলীয় ক্যাবিনেট প্রথা—ক্যাবিনেটের কায—শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান—শাসননীতি নির্ধারণ—সংহতি রক্ষা—পররাষ্ট্রনীতি নির্ণয়—আইন প্রণয়ন—অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা—ক্যাবিনেটের বৈশিষ্ট্য—ঐক্যের নীতি, পৃথক ও যৌথ দায়িত্ব—আইনগত দায়িত্ব—পার্লামেন্টের সহিত অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র—গোপন বৈঠক—রাজাকে পরামর্শদান—মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেট—ক্যাবিনেট ও পার্লামেন্ট—ক্যাবিনেট সভাই বর্তমানে কমন্স সভাকে নিয়ন্ত্রণ করে—মন্ত্রিগণের দায়িত্ব—মন্ত্রিসভা ভঙ্গ করিবার পদ্ধতি—বিভিন্ন সরকারী দপ্তর—ক্যাবিনেট-একনায়কতন্ত্র—প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ—কার্যক্ষমতা—ক্ষমতার উৎস]

ক্যাবিনেট সভার গুরুত্ব

ক্যাবিনেট—গ্রেট ব্রিটেনের শাসকবর্গ প্রকৃতপক্ষে ক্যাবিনেট সভা কর্তৃক পরিচালিত। অগ্ ও জিংক বলিয়াছেন—"Manifestly, we must look far beyond king-in-council to discover the men and agencies carrying on the actual work of government, and the quest soon brings us to the ministry and the Cabinet."

ধারাবাহিকতা

অবশ্য ক্যাবিনেট সভা আকস্মিকভাবে একদিনে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে নাই। বহু বৎসরের বহু ঘটনাজালের মধ্য হইতে ক্যাবিনেট সভার সৃষ্টি। প্রথম চার্লসের আমলে অনুষ্ঠানবিহীন আড়ম্বরহীন ভাবে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যদিগের মধ্য হইতে রাজা ক্যাবিনেটের সদস্যদিগকে মনোনয়ন করেন। দ্বিতীয় চার্লসের আমলে ক্যাবিনেট প্রিভি কাউন্সিলের সহিত সম্পর্কহীন এক সংস্থারূপে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। এই সময় দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার ও আধুনিক দলীয় প্রথার প্রথম উন্মেষ দেখা যায়। ১৬৮৮ খ্রীঃ গৌরবময় বিপ্লব (Glorious Revolution) হয় ও তাহার ফলে পার্লামেন্টের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে দল নির্বিশেষে রাজা মন্ত্রী নিয়োগ করিতেন কিন্তু তৃতীয় উইলিয়াম একদলীয় মন্ত্রিসভা প্রবর্তনে

বাধ্য হন। পরবর্তীকালে প্রথম জর্জের রাজত্বকালে ওয়ালপোলের নেতৃত্বে প্রধান মন্ত্রীর পদ সৃষ্টি হয়। জর্জের ইংরাজী ভাষায় অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া ওয়ালপোল মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৭৪২ খ্রীঃ পদত্যাগ করিয়া ওয়ালপোল ক্যাবিনেট শাসন প্রথার এক অন্যতম মূলনীতির প্রবর্তন করেন। ক্যাবিনেট যতদিন আইন সভার আস্থাভাজন থাকিবেন ততদিন শাসনকার্য পরিচালনা করিবে। এই নজির ওয়ালপোল প্রবর্তন করেন।

পরবর্তীকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রেট ব্রিটেনে সর্বদলীয় ক্যাবিনেট সৃষ্টির মাধ্যমে ক্যাবিনেট শাসন প্রথার এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে চার্চিল যুদ্ধকার্য পরিচালনায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তাঁহার দলীয় নেতৃত্বের ভার ক্যাবিনেটের অপর এক সদস্যের হস্তে ন্যস্ত করিয়া ক্যাবিনেট শাসন প্রথার নূতন নজির স্থাপন করেন। এইরূপ ঘটনা পরম্পরায় ক্যাবিনেট শাসন প্রথার সৃষ্টি।

সাধারণ নির্বাচনের পর রাজা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ক্যাবিনেটের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ নিয়োজিত হয়। সাধারণতঃ ২০ অথবা ২৫ জন সদস্য লইয়া ক্যাবিনেট গঠিত হয়। আমেরিকার ক্যাবিনেটের সদস্য সংখ্যা অবশ্য অনেক কম। মাত্র দশজন লইয়া মার্কিন ক্যাবিনেট গঠন করা হয়। ১৯৩৭ সালের আইনের বলে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সদস্যদিগের অন্ততঃ তিনজনকে লর্ড সভার সদস্য হইতে হইবে। ব্রিটেনে একমাত্র পার্লামেন্টের সদস্যদিগের মধ্য হইতে ক্যাবিনেট সদস্য নিয়োগ করা হয় কিন্তু আমেরিকায় এইরূপ বাধ্যবাধকতা নাই। মার্কিন ক্যাবিনেট সদস্যগণ মার্কিন কংগ্রেসের কোন কক্ষেরই সদস্য নহেন। সর্বদলীয় ক্যাবিনেট সভা প্রবর্তন ব্যতীত অন্যান্য ক্যাবিনেট গঠনের সময় গ্রেট ব্রিটেনে একটি দলের সদস্যদিগের মধ্য হইতেই ক্যাবিনেট সদস্য মনোনয়ন করা হয়। কিন্তু আমেরিকায় বিভিন্ন দলের সদস্যদিগের মধ্য হইতে ক্যাবিনেট সদস্য মনোনয়ন করা সম্ভব। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যবৃন্দ যৌথ দায়িত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে।

শাসনকার্যের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দপ্তরের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, ফলে ক্যাবিনেটের আয়তন বৃদ্ধি অপরিহার্য হইয়াছে। যুদ্ধকালে

অবশ্য ক্ষুদ্রায়তন এক ক্যাবিনেটের সৃষ্টি করা হয়। যুদ্ধকার্য সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য এক যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেট (War Cabinet) গঠন করা হয়। আপৎকালীন সময় এইরূপ ক্ষুদ্রায়তন ক্যাবিনেটের উপযোগিতা অনুভূত হইলেও স্বাভাবিক সময় পাঁচ সাতজন সদস্য বিশিষ্ট ক্যাবিনেট গঠন বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় না।

ক্যাবিনেটের কার্যাবলী (Functions of the Cabinet):

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে ক্যাবিনেট শাসন প্রথার গুরুত্ব সম্পর্কে বাজেহট (Bagehot) বলেন, ক্যাবিনেট হইল "a combining Committee, a hyphen which joins a buckle which fastens the legislative part of the State with the executive part." অর্থাৎ ক্যাবিনেট আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সেতু রচনা করে।

আইনবিভাগ ও শাসন-বিভাগের সামঞ্জস্য রক্ষাকারী ক্যাবিনেট সভার দায়িত্ব

ক্যাবিনেট গ্রেট ব্রিটেনের শাসনকার্য পরিচালনা করে। ক্যাবিনেট, শাসন পদ্ধতি নির্ণয়ের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। পার্লামেণ্টের আইন অথবা শাসন বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের নীতি ক্যাবিনেট প্রবর্তিত শাসন পদ্ধতির প্রতিফলন। রাজার সমস্ত শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা ক্যাবিনেট প্রয়োগ করে। সামরিক, বৈদেশিক বা বিচারবিভাগীয় দপ্তরের সমস্ত নিয়োগ ব্যবস্থা ক্যাবিনেট কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং রাজার নামে ঐ নিয়োগ ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়।

শাসন পদ্ধতি ও সরকারী নীতি নির্ণয়

আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণও ক্যাবিনেটের একটি অন্যতম প্রধান কার্য। ক্যাবিনেটের অধিকাংশ সদস্য শাসনবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির প্রধান অধিকর্তা। ক্যাবিনেট শাসনবিভাগের বিভিন্ন দপ্তরগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ক্যাবিনেটের একজন ভারপ্রাপ্ত সদস্য বাৎসরিক বাজেট নির্ধারণ করেন এবং অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ণয়ে সাহায্য করেন। যুদ্ধ ঘোষণায় বা শান্তি স্থাপনায় ক্যাবিনেট রাজাকে পরামর্শ দান করে। আন্তর্জাতিক চুক্তি স্থাপনের ব্যাপারে বা রাজার প্রাধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে সমস্ত

পররাষ্ট্র নীতি নির্ণয়

দায়িত্ব ক্যাবিনেট গ্রহণ করে। শাসনবিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া এবং পার্লামেন্টের নীতি অনুসরণপূর্বক জাতীয় শাসকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রক হিসাবে ক্যাবিনেটের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। আমেরিকার ক্যাবিনেটের শাসন পরিচালনা সম্পর্কিত কার্য অত্যন্ত সীমিত। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি শাসন পরিচালনা করেন ও ইচ্ছানুসারে ক্যাবিনেটের পরামর্শ গ্রহণ করেন।

আইন প্রণয়নে ক্যাবিনেটের ভূমিকা

আইন প্রণয়ন বিষয়ক কার্যেও ক্যাবিনেটের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। পার্লামেন্টের সভার নূতন অধিবেশনের পূর্বে রাজা জাতীয় সমস্যা-সম্পর্কিত যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহা ক্যাবিনেট কর্তৃক রচিত হয়। রাজার ঐ বক্তৃতায় ভবিষ্যৎ আইনের পরিবর্তন বা সংস্কারের আভাসও থাকিতে পারে। ক্যাবিনেট সভার সদস্যভুক্ত মন্ত্রিগণ পার্লামেন্টে আইনের খসড়া উপস্থাপিত করে। এতদ্ব্যতীত পার্লামেন্টের কার্যসূচী সীমাবদ্ধ করিয়া বেসরকারী সদস্যদিগের বিল উত্থাপনের প্রয়াস সংকুচিত করিতে পারে। ক্যাবিনেটের সদস্যবৃন্দ পার্লামেন্টের সদস্য, এবং পার্লামেন্টের নানা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়া তাহারা পার্লামেন্টের নীতি ও পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। ক্যাবিনেট পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকে এবং পার্লামেন্টের আস্থা হারাইলে পদত্যাগে বাধ্য হয় কিন্তু বর্তমানে ক্যাবিনেট ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ক্যাবিনেট জনসাধারণের বিচারপ্রার্থী হইতে পারে। এমতাবস্থায় কমন্সসভা ভঙ্গ করিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। আমেরিকার ক্যাবিনেটের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। আমেরিকায় ক্ষমতা পৃথকীকরণ ব্যবস্থা বলবৎ থাকায় ক্যাবিনেট আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপে অপারগ। ব্রিটেনে ক্ষমতার পৃথকীকরণ না থাকায় আইনবিভাগের সহিত ক্যাবিনেটের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে কমন্স সভার অধীনে ক্যাবিনেট স্থাপিত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও মূলগতভাবে ক্যাবিনেটই কমন্সসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মন্ত্রিগণ ব্যতিরেকে অন্যান্য সদস্য আইনের প্রস্তাব পেশ করিতে পারেন কিন্তু ক্যাবিনেটের বিনা অনুমোদনে এ প্রস্তাব কার্যকরী হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। পার্লামেন্টে প্রণীত আইন কার্যকর হইয়াছে কিনা তাহা তদারক করা এবং যে ক্ষেত্রে আইন নাই

তাহার নীতি নির্ধারণ করা ক্যাবিনেটের কার্য। নানা জটিলতার জন্য পার্লামেন্ট বর্তমানে আইনের পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারে না। সময়ের অভাব পার্লামেন্টের এই অক্ষমতার একটি কারণ। ক্যাবিনেটের সদস্যবৃন্দ পার্লামেন্ট প্রদত্ত আইনের কাঠামোকে পরিপূর্ণরূপ দান করে।

অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা

অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে বাজেট পেশ করা, ব্যয়ের হিসাব (Estimate) সম্পর্কিত বিরোধ প্রভৃতির সমাধানের দায়িত্ব ক্যাবিনেটের। চ্যান্সেলার অব্ এক্সচেকর বৎসরের বাজেট প্রস্তুত করিয়া পার্লামেন্টে পেশ করে।

ক্যাবিনেটের বৈশিষ্ট্য (Features of the British Cabinet):

ফরাসী শব্দ ক্যাবিনেট কথাটির অর্থ একটি কক্ষ। যদিও ইংলণ্ডে শাসন সংক্রান্ত সমস্ত কার্য রাজার নামে নির্বাহ করা হয় প্রকৃতপক্ষে ক্যাবিনেটই শাসনকার্য পরিচালনা করে। ক্যাবিনেট হইল সেই কেন্দ্রবিন্দু যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ব্রিটিশ শাসন পদ্ধতি বিবর্তিত হইয়াছে। স্যার জন ম্যারিয়েটের ভাষায় ক্যাবিনেট হইল "pivot round which the whole political machinery revolves." ক্যাবিনেট শাসন প্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি একদিনে প্রবর্তিত হয় নাই। বহু বৎসরের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ফলে ও আংশিক ভাবে প্রথা ও ঐতিহ্যমণ্ডিত রীতিনীতির মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে।

রাজনৈতিক আদর্শের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যগণের মধ্য হইতে ক্যাবিনেট সভার সদস্য মনোনয়ন করা হয়। ফলে ঐক্যসূত্রের দ্বারা সদস্যবৃন্দকে গ্রথিত করা হয় (Principle of Homogeneity)। মতানৈক্য ঘটিলে ক্যাবিনেট সভার সদস্যবৃন্দ নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিতে পারেন কিন্তু পার্লামেন্টে বা প্রকাশ্যভাবে, ঐ মতান্তর বা বিরোধিতা, ভোট বা ঘোষণা বা বক্তৃতার দ্বারা প্রকাশ করিতে পারেন না। অবশ্য সর্বদলীয় ক্যাবিনেট প্রথায় বিভিন্ন দলের সদস্য-সমন্বয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান করা হয়। ক্যাবিনেটের সদস্যগণ পার্লামেন্টে অধিকাংশ সভ্যের সমর্থন

লাভ করেন। রাজা তৃতীয় জর্জের আমল হইতে প্রধান মন্ত্রী যে ক্যাবিনেট সদস্যের তালিকা পেশ করেন তাহা রাজা কর্তৃক বিনা দ্বিধায় মানিয়া লওয়ার নজীর স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য ক্যাবিনেটের সদস্য হিসাবে এমন ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করা হয় যিনি কমন্স সভার অধিকাংশ সভ্যের সমর্থন লাভে সমর্থ।

তৃতীয়তঃ, পার্লামেন্টের নিকট মন্ত্রিগণ যৌথভাবে ও এককভাবে দায়ী বলিয়া ক্যাবিনেট প্রথা দাবী করে। কমন্স সভার নিকট ক্যাবিনেট যৌথ-ভাবে দায়ী। মন্ত্রিসভার এই দায়িত্ব দ্বিবিধ, আইনগত ও রাজনৈতিক। আইনগত দায়িত্ব হইতে রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না (The king can do no wrong) প্রভৃতি প্রথার প্রবর্তন হইয়াছে। রাজার প্রতি কার্য কোন না কোন মন্ত্রীদ্বারা স্বাক্ষরিত হয়, ফলে রাজা দায়িত্ব এড়াইবার সুযোগ লাভ করেন। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে রাজার নামে পরিচালিত কাজের জন্য আদালতে দায়ী করা যাইতে পারে। ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক দায়িত্ব ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্যের মেরুদণ্ড স্বরূপ। প্রত্যেক মন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে পার্লামেন্টের নিকট দায়ী এবং সামগ্রিকভাবে নীতি-নির্ধারণের জন্য ক্যাবিনেট যৌথভাবে পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকে। যদি কখনও কমন্স সভা কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করে তাহা হইলে উক্ত মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইবে অথবা সামগ্রিকভাবে ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইলে মন্ত্রিসভার পতন অনিবার্য হইয়া পড়ে।

১৭৮২ সালে লর্ড নর্থের নেতৃত্বাধীন ক্যাবিনেটের পতন ঘটে। ব্যক্তিগত-ভাবে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

চতুর্থতঃ, ক্যাবিনেট সভার সহিত পার্লামেন্টের যোগসূত্র ক্ষমতার পৃথকী-করণের অভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্যাবিনেটের সদস্যগণকে অবশ্যই পার্লামেন্টের সভ্য হইতে হইবে, অবশ্য প্রধান মন্ত্রী সাময়িকভাবে ছয় মাসের জন্য বাহির হইতে কাহাকেও ক্যাবিনেটের সদস্য মনোনীত করিতে পারেন।

পঞ্চমতঃ, প্রধান মন্ত্রীকে পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অধিকাংশ সভ্যের সমর্থন লাভ করিতে হইবে। ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটস্থ গৃহের অভ্যন্তরে প্রধান মন্ত্রীর সহিত যতই মতবিরোধ হউক না কেন

সহকর্মিগণ প্রধান মন্ত্রীকে প্রকাশ্যে অবমাননা করিয়া দলীয় ঐক্য ও নিষ্ঠার বিলোপ সাধনে কখনই তৎপর হইবে না।

ষষ্ঠতঃ, ক্যাবিনেট সভার আলোচনা বৈঠক গোপনে সংগঠিত হয়। রাজার গোপন পরামর্শমণ্ডলী হিসাবে এবং বিশেষত বিরোধীদল শত্রুতা করিতে পারে এই আশঙ্কায়, ক্যাবিনেট সভার আলোচনা ও নীতি বিশেষ গোপন রাখা হয়।

সপ্তমতঃ, প্রধান মন্ত্রীই দলের নেতা এবং ক্যাবিনেট সভার নেতা। সকল মন্ত্রী তাঁরই নেতৃত্বে শাসনকার্য পরিচালনা করে। তিনি মন্ত্রী নিয়োগ ও বিতাড়নের বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ও দলের নিয়মানুবর্তিতার তদারকে প্রয়াসী। সমষ্টিগতভাবে ক্যাবিনেট সদস্যবৃন্দের ঐক্য, সংহতি ও নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশেষভাবে মননিবেশ করেন। প্রধান মন্ত্রীর সহিত যদি কোন মন্ত্রী একমত হইতে না পারেন তাহা হইলে তিনি স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্যতামূলকভাবে পদত্যাগ করেন। প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ক্যাবিনেটের পতন ঘটে।

ক্যাবিনেট রাজার পরামর্শদানের বিভাগ হিসাবে পরিচিতি লাভ করিলেও ক্যাবিনেটের গোপন সভায় রাজার উপস্থিতি কাম্য বলিয়া বিবেচিত বা প্রচলিত হয় নাই।

গ্ল্যাডস্টোন ক্যাবিনেট প্রথার বহুমুখী কার্যকারিতা ও সম্প্রসারণশীলতার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন "It is perhaps the most curious formation in the political world of modern times, not for its dignity but for its subtlety, its elasticity and its many sided diversity of power."

মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেট (The Ministry and the Cabinet) :

মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেট একই বস্তু বলিয়া অনেকের নিকট প্রতীয়মান হয় কিন্তু বাস্তবে উভয়ের মধ্যে সবিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্য মৌলিকভাবে গঠনপ্রণালী ও কার্যাবলীর মধ্যে সুস্পষ্ট।

পার্লামেণ্টের সভ্য, রাজার এমন সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সমন্বয়ে মন্ত্রি-পরিষদ গঠিত, পরিষ্কারভাবে বলিতে গেলে পার্লামেণ্টের সভ্য এবং

পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী অর্থাৎ পার্লামেণ্ট অনাস্থা জ্ঞাপন করিলে পদত্যাগে বাধ্য এমন সকল কর্মচারী, সচিব ও মন্ত্রিগণকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত। বলা বাহুল্য মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে।

অপরদিকে ক্যাবিনেটের সদস্যসংখ্যা পরিমিত ও মন্ত্রিসভার তুলনায় নিতান্ত অল্প। মন্ত্রিসভায় ক্যাবিনেট সভার সদস্যবৃন্দ ব্যতীত এটর্নী জেনারেল, মিলিটারি জেনারেল, পার্লামেণ্টের স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ (Chancellor of Exchequer), রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত কর্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারী লইয়া গঠিত মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ষাট সত্তর জনের কম নহে, পক্ষান্তরে ক্যাবিনেট সভার সভ্যসংখ্যা বিশ হইতে পঁচিশ।

মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে ক্যাবিনেটের সভ্যগণ নির্বাচিত হন। মন্ত্রিসভার চক্রের ভিতর ক্যাবিনেট চক্রের অবস্থান (a wheel within a wheel)। মন্ত্রিসভাকে মনুষ্য দেহের শরীরের সহিত তুলনা করিলে ক্যাবিনেটকে মনের সহিত তুলনা করা যায়। ক্যাবিনেটের সকল সদস্য মন্ত্রিসভার সদস্যভুক্ত হইলেও মন্ত্রিসভার সকল সদস্য ক্যাবিনেট সভার অন্তর্ভুক্ত নহে।

ক্যাবিনেট সভার অন্যতম প্রধান কার্য হইল শাসন পরিচালনার নীতি নির্ধারণ, কিন্তু মন্ত্রিসভার এ সম্পর্কে কোন ক্ষমতা নাই। নীতি নির্ধারণের কোনরূপ প্রয়াস মন্ত্রিসভার সাধারণ এক্তিয়ারের বহির্ভূত।

ক্যাবিনেট সভার অধিবেশনের যে নিয়মিত ধারা আছে সেইরূপ কোন বাধ্যবাধকতা মন্ত্রিসভার ব্যাপারে অনুভূত হয় না।

ক্যাবিনেট সভার যৌথ রাজনৈতিক ও আইনগত দায়িত্ব আছে, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের অনুরূপ যৌথ দায়িত্বের কথা শুনা যায় না।

ক্যাবিনেট একটি প্রথাগত-বিধানের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে পক্ষান্তরে মন্ত্রিসভা একটি আইন-সম্মত প্রতিষ্ঠান।

ক্যাবিনেটের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভার পতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। একই সময় মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেট সভার গঠন ও পতন হয়।

মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। শাসনবিভাগের নামমাত্র অথবা প্রকৃত প্রধান অধিনায়ক, যথা বৈদেশিক ব্যাপারের রাষ্ট্রসচিব, প্রতিরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী, চ্যান্সেলর অব এক্সচেকর,

লর্ড চ্যান্সেলর, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায় ঐতিহ্যমণ্ডিত উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উল্লেখ করা যায় যথা লর্ড প্রিভিসিল (Lord Privy Seal) বা পরিষদের লর্ড সভাপতি (Lord President of the Council)। এই সকল পদস্থ ব্যক্তি কোন. বিভাগীয় দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। তৃতীয় পর্যায় মন্ত্রী নহে এমন স্থায়ী অধস্তন সচিবদিগের কথা উল্লেখ করা যায়। এই সকল সচিবগণকে রাষ্ট্রনৈতিক কর্মচারী আখ্যা দেওয়া যায় না। মন্ত্রিসভার উত্থান-পতনের সঙ্গে ইহাদের কর্মকালের বা চাকুরির নিরাপত্তা নির্ভর করে না। চতুর্থতঃ রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন কর্মচারী যথা কোষাধ্যক্ষ, কম্পট্রোলার প্রভৃতি মন্ত্রীদিগের পর্যায়ের উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রনৈতিক কর্মচারী বলিয়া বিবেচিত হয়।

পার্লামেন্টের অধিবেশনকালে সপ্তাহে একবার প্রধান মন্ত্রীর ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে ক্যাবিনেট সভার অধিবেশন হয় এবং ইহা দ্বারা বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থাও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। ক্যাবিনেট সভার অধিবেশনে ভোট গ্রহণ করা হয় না। অথবা সভার কার্যনির্বাহের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

আইনসভায় ক্যাবিনেট সভার সদস্যবৃন্দ নেতৃত্ব প্রদান করেন। প্রত্যেক অধিবেশনে আইনসভার কর্মসূচী ক্যাবিনেট নির্ধারণ করে।

ক্যাবিনেট ও আইন সভা (Cabinet and the Parliament) :

পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠদলের মধ্য হইতে ক্যাবিনেট সভার সদস্যবৃন্দ মনোনীত হয়। অতএব ক্যাবিনেট সভা কর্তৃক প্রণীত আইন বিনা বাধায় আইন সভা কর্তৃক পাশ হইয়া যায়।

প্রথাগত বিধান অনুসারে অর্থসংক্রান্ত বিল বা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বিল ক্যাবিনেটের সদস্যগণ কর্তৃক উদ্ভূত হয়।

আইনসভার সময় নির্ধারণ, স্থায়িত্ব ও আইনসভার কার্যাবলী ক্যাবিনেটের সভ্যবৃন্দের উপর নির্ভর করে।

প্রধান মন্ত্রী ও ক্যাবিনেট সভার পরামর্শ অনুসারে রাজা পার্লামেন্টের অধিবেশন ভঙ্গ করিতে পারেন এবং নূতনভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠদলের অধিকাংশের সমর্থন লাভ করিয়া, অর্থসংক্রান্ত বিল পেশ করিবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়া এবং প্রয়োজনে পার্লামেণ্ট ভঙ্গ করিবার ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় ক্যাবিনেট পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

পক্ষান্তরে ক্যাবিনেট সভার সদস্যবৃন্দ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে এবং আইনসভা অনাস্থাজ্ঞাপন করিলে ক্যাবিনেট সভার সদস্যবৃন্দ পদত্যাগ করিতে বাধ্য। অতএব অনাস্থাজ্ঞাপনের দ্বারা আইনসভা ক্যাবিনেট সভাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্যাবিনেট পরাজিত হইলে ক্যাবিনেটের সদস্যবৃন্দ পদত্যাগ করেন।

আইনসভার যে কোন সদস্য মন্ত্রিগণকে প্রশ্ন করিতে পারে এবং শাসনবিভাগের নানাকার্যের জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিয়া মন্ত্রিগণের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে। এইরূপে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করিয়া আইনসভা ক্যাবিনেট সভাকে প্রভাবিত করিতে সক্ষম হয়।

রাজকীয় বক্তৃতার সমালোচনা করিয়া আইনসভার কর্মসূচী ও শাসন-বিভাগের সাধারণ নীতি সংকুচিত অথবা অপরিবর্তিত করিবার প্রয়াস আইনসভা পাইতে পারে।

ক্যাবিনেটের সহিত রাজার সম্পর্ক (Cabinet and the King) ঃ

নরম্যান আমলে কুরিয়া রেজিস্ হইতে প্রিভি কাউন্সিল গঠিত হয়। প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যগণের একাংশ লইয়া ক্যাবিনেট গঠিত হয়। পূর্বাহ্নে ক্যাবিনেটের সদস্যবৃন্দ রাজার উপদেষ্টারূপে কার্য পরিচালনা করিত। প্রধান-মন্ত্রী ও অন্যান্য ক্যাবিনেটের সদস্যগণ রাজাকে শাসনবিভাগীয় কার্য পরিচালনায় উপদেশ দান করিত। রাজাই তাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রিভি কাউন্সিলের সভ্যবৃন্দকে মনোনীত করিতেন। বর্তমানে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেণ্টের সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে ক্যাবিনেটের সভ্যগণকে নির্বাচন করা হয়। বর্তমানে ক্যাবিনেটই প্রকৃত শাসন-ক্ষমতার অধিকারী। শাসন বিভাগের সকল কার্য ক্যাবিনেটই পরিচালনা করে। রাজা নামে শাসক, প্রকৃতপক্ষে ক্যাবিনেট শাসনকার্য পরিচালনা করে। রাজার পক্ষে বর্তমানে ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব।

ক্যাবিনেট সভা কমন্স সভাকে নিয়ন্ত্রণ করে না কমন্স সভা ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে ?

লাস্কির মতে সরকার গঠন তথা সরকারী কার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত শাসনবিভাগকে ক্ষমতা দান কমন্স সভার অন্যতম কার্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কমন্স সভা ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্ততঃ ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ক্যাবিনেট সভা কমন্স-সভারই কার্যকরী সমিতি। আপাতঃদৃষ্টিতে কমন্স সভার অনুমোদন লাভের উপর ক্যাবিনেট সভার জীবন নির্ভর করে। কারণ আমরা জানি কমন্স সভার নিকট ক্যাবিনেট সভা দায়ী থাকে। প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে, অনাস্থা প্রকাশের মাধ্যমে, কোন বিশেষ পদ্ধতির সমালোচনা করিয়া, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিল নাকচ করিয়া দিয়া, মন্ত্রীদিগের বেতন হ্রাস করিয়া দিয়া, কমন্স সভা ক্যাবিনেটের কার্যকাল নির্ধারণ করিতে পারে এবং ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। বস্তুতঃ যতদিন ক্যাবিনেট কমন্স সভার আস্থাভাজন থাকে ততদিনই তাহার কার্যকাল অটুট থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাবিনেটকে কমন্স সভার আজ্ঞাবহ দাস বলিয়া অভিহিত করা যায়।

কিন্তু আমরা সুখজনিত বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিব যে ভৃত্যই মনিবকে শাসন করিতেছে। সাধারণ ক্ষেত্রে ভৃত্য মনিবের নিয়ন্ত্রাতা হিসাবে উপস্থিত না হইলেও এক্ষেত্রে ক্যাবিনেট কমন্স সভাকে পরিচালিত করে।

কঠোর দলীয় নিয়মানুবর্তিতার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কোন সদস্যের পক্ষে ক্যাবিনেট প্রণীত বিলের বিরোধিতা করা সম্ভব হয় না। বিরোধী দল ক্ষমতা লাভ করিবে এই আশঙ্কায় ক্ষমতায় আসীন দলের সকল সদস্য বিনা দ্বিধায় ক্যাবিনেটকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। ক্যাবিনেট যাহা নির্দেশ দান করে দলের সদস্যগণ সেই মতে চলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাধ্য হয়। অতএব কমন্স সভা অপেক্ষা দলীয় শক্তির উপরই ক্যাবিনেটের জীবনকাল নির্ভরশীল। অতএব "So long as the party supports the cabinet, it is the cabinet which controls the House and not the House that controls the cabinet, the Government in power."

কমন্স সভা নিঃসন্দেহে ব্রিটেনের অন্যতম আইন সভা, কিন্তু আইন প্রণয়নের বা খসড়া আইনের প্রস্তুতির দায়িত্ব ক্যাবিনেটের সভ্যগণের উপর

ন্যস্ত থাকে। আইন সভার কর্মসূচী নির্ধারণ ও প্রয়োগ ক্যাবিনেট সভাই করে।

শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারেও ক্যাবিনেটের ক্ষমতা সন্দেহাতীত ভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কমন্স সভার কার্যাদি, নীতি প্রভৃতি ক্যাবিনেট নির্ধারণ করে।

বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন, আয় ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ, কিভাবে ও কত পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা হইবে ও ব্যয় করা হইবে, তাহা ক্যাবিনেট স্থির করে। কমন্স সভা সমালোচনা করিতে পারে কিন্তু নূতন কর আরোপ বা নূতন হিসাব উত্থাপন কমন্স সভার এক্তিয়ার বহির্ভূত।

এতদ্ব্যতীত কমন্স সভার কার্যনির্বাহ সবিশেষ জটিলতাপূর্ণ। জটিল সময় সাপেক্ষ কার্যাদি নির্বাহ করিতে হয় বলিয়া ক্যাবিনেট সভার গুরুত্ব বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। অতএব "While nominally supreme the House of Commons has virtually become subservient to the cabinet."

মন্ত্রীদিগের দায়িত্ব (Ministerial Responsibility) :

ক্যাবিনেট শাসন প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ইংলণ্ডে মন্ত্রিগণের পৃথক দায়িত্বের (individual responsibility) ব্যবস্থা ছিল। এমতাবস্থায় মন্ত্রিগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্যের জন্য দায়ী থাকিতেন এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাঁহার দপ্তরের অন্যায় কার্যের জন্য জবাবদিহি ও প্রয়োজনে পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকিতেন। কোন একজন মন্ত্রীর জন্য সামগ্রিকভাবে মন্ত্রিসভাকে দায়ী করা যাইত না। দপ্তরের কার্যের অনেক বিষয়ে সরকারী কর্মচারিগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা তদারক করে। কিন্তু ঐ সকল কর্মচারীর ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকেই জবাবদিহি করিতে হয়। অর্থাৎ মন্ত্রীদিগের নিজ নিজ দপ্তরের কার্যের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব বহন করিতে হয়। কখনও কখনও মন্ত্রিগণকে বিচার কার্যের (impeachment) দ্বারা অপসারণ করা হইত। কিন্তু দায়িত্বশীল সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বিচার-কার্যের দ্বারা মন্ত্রীদিগের অপসারণের প্রয়োজন হ্রাস পায়। দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীদিগের যৌথ দায়িত্ব অপরিহার্যরূপে দেখা দিয়াছে।

দায়িত্বশীল সরকারের (Responsible Government) অর্থ হইল মন্ত্রিগণ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আইনসভার সদস্য জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগের নিকট প্রত্যক্ষভাবে এবং নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট পরোক্ষভাবে বা চরমভাবে (ultimately) দায়ী থাকিবেন। মন্ত্রীদিগের কার্যের সমালোচনা, ও পর্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা আইনসভার থাকিবে। দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ।

যৌথ দায়িত্ব (collective responsibility) বলিতে আমরা বুঝি, সরকারী নীতি ও কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ক্যাবিনেটকে সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকিতে হয়। প্রত্যেক মন্ত্রীকে ক্যাবিনেট সভার ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য বিশেষ নিয়মানুবর্তিতা প্রদর্শন করিতে হয়। ক্যাবিনেট সভার প্রত্যেক সদস্যকে অকুণ্ঠভাবে ক্যাবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কার্যসূচী সমর্থন করিতে হয়। ক্যাবিনেট সভার অভ্যন্তরে ব্যক্তিগতভাবে হয়ত কোন মন্ত্রী কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে তাঁর ব্যক্তিগত বিরোধিতা প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু প্রকাশ্যে বা আইনসভায় তিনি ক্যাবিনেট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ জানাইতে পারেন না। গুরুতর মতবিরোধ ঘটিলে মন্ত্রীকেই ক্যাবিনেট সভা হইতে পদত্যাগ করিতে হইবে। ক্যাবিনেট বৈঠকের পর গৃহীত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা ও আইনসভায় তাহা প্রতিষ্ঠা করা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মহান দায়িত্ব।

মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম যৌথ দায়িত্ব হইল জাতীয় নীতি ও আইনসভার কর্মসূচী নির্ধারণ। অতঃপর মন্ত্রিগণ ঐ নীতির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও আলোচনা দ্বারা সমর্থন জ্ঞাপন করেন। কোন একজন মন্ত্রীর কার্যের জন্য সমগ্র ক্যাবিনেট এবং সামগ্রিকভাবে ক্যাবিনেটের কার্যের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রী দায়ী বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অতএব মন্ত্রী কর্তৃক আনীত বা মন্ত্রিপরিষদ সমর্থিত কোন সরকারী বিল কমন্স সভায় উপস্থাপিত হইলে নিশ্চিত ধরিয়া লওয়া হয় যে, ঐ বিল আইনরূপে গৃহীত হইবে নচেৎ নূতন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হইবে। কারণ বিল গৃহীত না হইলে আপন মর্যাদা রক্ষা করিতে ও দায়িত্বের পরিচয় দিতে মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর পায় না।

ক্যাবিনেট শাসনপ্রথায় মন্ত্রীদিগের দায়িত্ব বলিতে মূলগতভাবে সংহতি ও ঐক্যবদ্ধতা বুঝায়। ১৭৮২ সালে কমন্স সভায় বিরোধিতার সম্মুখে নতি স্বীকারপূর্বক পদত্যাগ করিয়া লর্ড নর্থের মন্ত্রিসভা দায়িত্বশীল সরকারের এক ঐতিহাসিক নজীর স্থাপন করেন। বস্তুতঃ নর্থ মন্ত্রিসভার পদত্যাগের অব্যবহিত পরই মন্ত্রিসভার দায়িত্ব ব্যক্তিগত বা পৃথক ও যৌথরূপে প্রকাশ পায়। অবশ্য ১৯৩১ সালে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের প্রধান মন্ত্রিত্বকালে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভায় ক্যাবিনেট শাসন ব্যবস্থায় চিরাচরিত যৌথদায়িত্বের প্রথা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। কিন্তু বর্তমানে ব্রিটেনে ক্যাবিনেট সভার যৌথ দায়িত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ও কালের গতিতে অপ্রতিহত।

কোন একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করা হইলে সামগ্রিকভাবে ক্যাবিনেটের পতন ঘটে। অবশ্য কোন মন্ত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত অযোগ্যতা অসদাচরণ বা ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য অপরাধী হইলে তাঁহার অপরাধের জন্য সমগ্র ক্যাবিনেটের পতন অনিবার্য হইয়া পড়ে না। ব্যক্তিগত অন্যায় ও অসদাচরণের জন্য প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে রাজা কোন মন্ত্রীকে অপসারণ করিতে পারেন। ১৯২২ সালে, সহকর্মীদের বিনা অনুমতিতে রাষ্ট্রের একটি জরুরী দলিল প্রকাশ্যে প্রকাশ করিবার অপরাধে মণ্টেগুকে অপসারণ করা হয়। ১৯৩৬ সালে বাজেট সম্বন্ধীয় গোপনীয়তা অবলম্বন না করিতে পারায় থমাসকে পদত্যাগ করিতে হয়। জনসাধারণ তথা পার্লামেন্টের বিরাগভাজন হইবার ফলে মন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। ১৯৩৫ সালে স্যার স্যামুয়েল হোর জনমতের চাপে পদত্যাগ করেন।

ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণের দায়িত্বের তিনটি প্রধান প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। মন্ত্রিগণ প্রাথমিকভাবে রাজার নিকট দায়ী থাকেন, অবশ্য এ দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আপাত ও মামুলী। কারণ রাজা বা রাণী কোন মন্ত্রীকেই অপসারিত করিতে পারেন না। অবশ্য মন্ত্রী যদি প্রধান মন্ত্রী বা কমন্স সভার আস্থা হারায় সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে। কিন্তু পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজা বা রাণীকে ওয়াকিবহাল রাখা মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। লর্ড পামারস্টোনকে একবার রাণী ভিক্টোরিয়া পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না রাখার অপরাধে তিরস্কার করেন।

দ্বিতীয়তঃ মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্য একে অপরের নিকট নিজ নিজ কার্যের জন্য দায়ী থাকেন। মন্ত্রিপরিষদের সংহতি রক্ষার জন্য এ ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করা হয়। ১৯২২ সালে মণ্টেগু তাঁহার সহকর্মীদের সহিত পরামর্শ না করিয়া একটি সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন বলিয়া তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। অনুরূপ অপরাধের জন্য ১৮৫১ সালে লর্ড পামারস্টোন পদত্যাগে বাধ্য হন।

তৃতীয়তঃ ক্যাবিনেট সভার সভ্যবৃন্দ এককভাবে ও যৌথভাবে কমন্স সভার নিকট দায়ী থাকে। এই দায়িত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আইনগত প্রক্রিয়ার না থাকিলেও চিরাচরিত প্রথা অনুসারে কমন্স সভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে।

মন্ত্রিসভা ভঙ্গ করিবার পদ্ধতি (How a Ministry can be ousted) :

নানা পদ্ধতির মাধ্যমে কমন্স সভা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করিতে পারে। আয়ব্যয় সংক্রান্ত আলোচনার সময় যদি কমন্স সভা কোন মন্ত্রীর বেতন নামমাত্র হ্রাস করে তাহা হইলে সামগ্রিক ভাবে ক্যাবিনেটের পতন অনিবার্যরূপে দেখা দেয়।

ক্যাবিনেট সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত কোন বিল যদি কমন্স সভার অনুমোদন না লাভ করে তাহা হইলে ক্যাবিনেটের সদস্যদিগের একযোগে পদত্যাগ করিতে হয়। বস্তুতঃ ১৯৩৭ সালে চেম্বারলেন কয়েকটি নূতন করের প্রস্তাব করিলে বিরোধীদল তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে থাকে ফলে অনাস্থা জ্ঞাপক পরিস্থিতি এড়াইবার জন্য ঐ প্রস্তাব তুলিয়া লওয়া হয়।

সরকারী দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও যদি কোন বিরোধীদলের আনীত বিল গৃহীত হয় তাহা হইলেও মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ পায়।

ক্যাবিনেট অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর বিরুদ্ধে সাধারণভাবে অনাস্থা জ্ঞাপন করা হইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়।

কোন বিশেষ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করা হইলে মন্ত্রিসভার ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগ করে।

একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার নিরাপত্তার একমাত্র রক্ষা কবচ হইল কমন্স সভায় দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

এতদ্ব্যতীত উগ্র কমন্স সভার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বিধান স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী রাজাকে কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতে পারেন।

বিভিন্ন সরকারী বিভাগ (Different Departments of the State) ঃ

সাধারণভাবে ও সামগ্রিকভাবে সরকারের সমস্ত কার্য কয়েকটি দপ্তরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। প্রত্যেক দপ্তরের ভার একজন মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করা হয়। মন্ত্রীদিগের সচিব, সহকারী সচিব প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ সাহায্য করে। বিভাগীয় মন্ত্রীকে সাহায্য করেন একজন স্থায়ী ও একজন অস্থায়ী সচিব। ইঁহারা যথাক্রমে Permanent Under-Secretary ও Parliamentary Under-Secretaryরূপে পরিচিত। মন্ত্রি-সভার পতনের সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী সচিবকে পদত্যাগ করিতে হয়। স্থায়ী সচিবের অধীনে বহু স্থায়ী কর্মচারী কার্য করেন। মন্ত্রিসভার রদবদলের সহিত স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদিগের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই।

শাসন-সংক্রান্ত প্রধান বিভাগগুলি সম্পর্কে আলোচনা নিম্নে করা হইল।

স্বরাষ্ট্র বিভাগ (Home office) ঃ

আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র বিভাগের। স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব পুলিশ, জেল প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত প্রভৃতির সংগঠন করেন।

পররাষ্ট্র বিভাগ (Foreign office)

বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ, দূত বিনিময় পূর্বক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি এই দপ্তরের অন্যতম কার্য।

রাজস্ব বিভাগ (The Treasury) ঃ

আর্থিক ব্যবস্থা পরিচালনা এবং সরকারী আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা এই দপ্তরের অন্যতম মহান দায়িত্ব। সরকারী চাকুরির ব্যবস্থা ও তদারক করাও এই দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত কাজ। লর্ড কমিশনরগণের নেতৃত্বে রাজস্ব বিভাগের চ্যান্সেলার বা মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই বিভাগ পরিচালিত হয়।

প্রতিরক্ষা বিভাগ (Defence office)

রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব এই দপ্তরের হস্তে ন্যস্ত। স্থল, নৌ ও বিমান বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন পূর্বক প্রতিরক্ষা দপ্তরের সৃষ্টি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এই দপ্তরের নিয়ন্ত্রক।

ঔপনিবেশিক বিভাগ (The Colonial office) :

ব্রিটেনের উপনিবেশগুলির তত্ত্বাবধান করাই এই দপ্তরের অন্যতম কার্য।

ব্যবসা সংক্রান্ত বিভাগ (Board of Trade) :

ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে নীতি প্রণয়ন, অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ, শিল্পের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি এই দপ্তর একজন প্রেসিডেণ্টের নেতৃত্বে সম্পাদন করে।

শিক্ষা বিভাগ (Ministry of Education) :

শিক্ষামন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে এই বিভাগ সামগ্রিকভাবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে।

স্বাস্থ্য বিভাগ (Ministry of Health) :

স্বাস্থ্য ব্যাপারের তদারক করা ও সেই সঙ্গে গৃহ সমস্যার সমাধান ও নগর পরিকল্পনা এই দপ্তরের এক্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

পরিবহন বিভাগ (The Ministry of Transport) :

যানবাহন, পোতাশ্রয়, রেলপথ, রাস্তা, পথঘাট প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা এই বিভাগের কর্তব্য।

শ্রম বিভাগ (Ministry of Labour) :

শ্রমিক সমস্যার সমাধান, বেকার বীমা আইন প্রভৃতি পরিচালনা করা এই বিভাগের দায়িত্ব। এতদ্ব্যতীত আরো বহু ছোট ও বড় বিভাগ শাসন ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়।

ক্যাবিনেট একনায়কতন্ত্র (Cabinet Dictatorship) :

ক্যাবিনেট সভার নানাবিধ কার্য পর্যালোচনা করিয়া, কমন্স সভায় দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে ক্যাবিনেট সভা একনায়কতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা

প্রবর্তনে সক্ষম, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে আশ্চর্যের কোন কারণ নাই।

ক্যাবিনেটকে একাধারে ক্ষুদ্র আইনসভা, শাসক ও সমন্বয় সাধকের রূপ পরিগ্রহ করিতে হয়। বিপুল সভ্যসংখ্যা ভারে কমন্স সভা ব্যতিব্যস্ত অতএব স্বল্পসংখ্যাবিশিষ্ট ক্যাবিনেট সভাকেই আইনের খসড়া ও আইন সভার কর্মসূচী প্রণয়নে তৎপর হইতে হয়। ক্যাবিনেট সভার প্রত্যেক সদস্যই শাসন সংক্রান্ত কোন না কোন বিভাগের প্রধান অধিকর্তা এবং শাসনকার্য পরিচালনা ক্যাবিনেট সভার কর্তব্য। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধন মারফৎ শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠু রাখাও ক্যাবিনেট সভার এক্তিয়ারভুক্ত দায়িত্ব।

ক্যাবিনেট সভা যে ভাবে কমন্স সভাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ক্যাবিনেট সভা যে বিল সমর্থন করিবে তাহা গৃহীত হইবে এবং ক্যাবিনেট সভা বিরোধিতা করিলে ঐ বিল অগ্রাহ্য হইবে। সাধারণ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যাপারে জনমতের চাপ সৃষ্টি করা অসম্ভব হইয়া পড়ে ফলে মন্ত্রি-পষিদের কার্যের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিবার জন্য নির্বাচককে সাধারণ নির্বাচনের জন্য কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়। সাময়িকভাবে ক্যাবিনেট সভার পরিচালনা ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করা বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

প্রায়শঃই দেখা যায় যে নির্বাচনী ইস্তাহার ও প্রতিশ্রুতির অবমাননা করিয়া ক্যাবিনেট সভা আপন গতিতে অগ্রসর হইতেছে। দলীয় সংখ্যা-গরিষ্ঠতার শক্তিতে নির্ভর করিয়া ক্যাবিনেট সভা যে কোন বিধিবদ্ধ আইনের সংস্কার বা যে কোন নীতির পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। ইহার প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য নির্বাচকমণ্ডলীকে অসহায়ভাবে সাধারণ নির্বাচনের দিন গুণিতে হয়। বস্তুতঃ ১৯৩৫ সালের নির্বাচনে লীগ্ অব নেশনস্‌কে সমর্থন জানাইবার প্রতিশ্রুতিতে রক্ষণশীলদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু কয়েকমাস পরেই রক্ষণশীল ক্যাবিনেট সভা লীগের বিরুদ্ধাচরণ করে ও অ্যাবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে ইতালীর অভিযান সমর্থন করে।

দলীয় নিয়মানুবর্তিতা ও আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা সরকারের ক্যাবিনেট সভাকে স্বেচ্ছাচারী হইবার সুযোগ প্রদান করে।

আইনসভা ভঙ্গ করিবার ক্ষমতা, সময় ও কর্মসূচী নির্ধারণের ক্ষমতা ক্যাবিনেটকে বস্তুতঃ একনায়কতন্ত্রী হইবার সুযোগ দিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister)

ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় প্রধান মন্ত্রীকে ক্যাবিনেটসভার মধ্যমণি বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী হইলেন, "The key stone of the Cabinet Arch"। ক্যাবিনেটসভার উত্থান পতন, জীবন ও মৃত্যু প্রধানমন্ত্রীর উপর নির্ভর করে। সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতারূপে, ক্যাবিনেটসভার সভাপতি রূপে, সমকক্ষদের মধ্যে সর্বপ্রথমরূপে (Primus Inter Pares) প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিত্বের অধিকারী কোন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করিলে ক্ষমতার উচ্চশিখরে তাঁহার পক্ষে উত্তরণ অসম্ভব নহে। সময় ও সুযোগ, বিশেষ করিয়া আপৎকালীন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে পারেন। যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন চেম্বারলেন অপরাপর প্রধানমন্ত্রিগণ অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেন, ইহাই স্বাভাবিক। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিক দিয়া বিচার করিলে গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সমকক্ষ রাষ্ট্রনায়ক পাওয়া দুষ্কর। রাজা, আইন সভা, ক্যাবিনেট সভা, বিরোধীদল, জনমত প্রভৃতি সকলের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপরিচালনায় তৎপর হইতে হয়। বলা হইয়াছে, "An English Prime Minister with his majority secure in Parliament can do what the German Emperor and the American President and all the Chairmen of the Committees cannot do, for.he can alter the laws, he can impose taxation or repeal it and he can direct all the forces of the State."

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা

কিন্তু সুখজনক বিস্ময়ের সহিত আমরা লক্ষ্য করিব যে ১৮৭৮ সালের বার্লিনের সন্ধিপত্রে এবং পরে ১৯০৫ সালের ২রা ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর পদ ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় প্রথম উল্লেখ করা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রথাগত ভিত্তিতে গঠিত এই পদটির জন্য ১৯৩৭ সালের রাজমন্ত্রী আইনে রাজস্ববিভাগের প্রথম লর্ড হিসাবে মাহিনা ধার্য করা হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী: পদ আইন দ্বারা সৃষ্ট নহে

১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিন চুক্তির প্রস্তাবনায় প্রধানমন্ত্রী শব্দটি একবার ব্যবহার করা হয়। ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটে প্রধান মন্ত্রীর জন্য সরকারী ভবন স্থাপন করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী অবসরগ্রহণকালে পেনসন্ পাইতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার উৎস

ক্যাবিনেট সভার সদস্যবৃন্দ প্রায়শঃই নিজ নিজ দপ্তর লইয়া ব্যস্ত থাকেন। ফলে প্রধানমন্ত্রী তাঁহার নির্বাচিত কয়েকজন উপদেষ্টার সাহায্যে সাধারণ জাতীয় নীতি ও কর্মসূচী প্রবর্তন করেন।

দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী সবিশেষ সম্মান লাভ করেন। সদস্যবৃন্দ স্বভাবতঃই নেতার নির্দেশ মানিয়া চলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য হইল দলের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা। জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ও নিজ দলের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী দলীয় নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারণ করেন। নেতার মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দল পরিচিতি লাভ করে বলিয়া দলের সভ্যবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে প্রচারকার্য চালায় ও লোকচক্ষে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হয়।

ব্যক্তিত্বও তাঁর ক্ষমতার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রথাগত ভাবেই হউক বা আইনগত ভাবেই হউক প্রধানমন্ত্রীকে জুলিয়াস সীজারের ন্যায় একনায়কতন্ত্রী হইবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই, তৎসত্ত্বেও যদি কোন প্রধানমন্ত্রী অদ্বিতীয় অপ্রতিহত শক্তিধর শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করে তাহা হইলে তাহা প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের জন্যই সম্ভব। তাই বলা হয়, "The office of Prime Minister is what its holder chooses to make it."

প্রধানমন্ত্রী নিজের দলের স্বার্থ ও পার্লামেন্টের সমস্যা ভিন্ন জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থাকেন। ফলে সাধারণের সহিত তিনি যোগসূত্র স্থাপনের সুযোগ লাভ করেন। ইহা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

প্রধানমন্ত্রী নির্ধারণ পদ্ধতি ঃ

কোন আইনগত বিধানের উপর ভিত্তি করিয়া প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করা হয় নাই। নির্বাচকমণ্ডলী প্রত্যক্ষভাবেও এই গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীকে

নির্বাচন করেন না। সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথা অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করিবার জন্য রাজা আহ্বান করেন। গ্ল্যাডস্টোন চারিবার প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। যে কোন ব্রিটিশ প্রজা প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করিতে পারেন। অবশ্য কয়েকজন ব্যতিরেকে অধিকাংশ প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন ইংরাজ। অন্য কয়েকজনের কেউ বা স্কটিশ কেউ বা আইরিশ ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীদিগের অধিকাংশ হয় অক্সফোর্ড না হয় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীদিগের মধ্যে অধিকাংশই রাজনীতিতে অভিজ্ঞ ও জীবনের প্রারম্ভেই রাজনীতির সহিত জড়িত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা (Powers):

ক্যাবিনেটের নেতা হইলেন প্রধানমন্ত্রী। বস্তুতঃ প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়াই ক্যাবিনেট সভা গঠিত হয়। রাজা সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে প্রধান-মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন, পক্ষান্তরে প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট সভার অন্যান্য সদস্যগণকে মনোনীত করেন। মৌলিক-ভাবে ক্যাবিনেট সভার সদস্য মনোনয়নে প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণ স্বাধিকার থাকিলেও দলীয় স্বার্থ, বাস্তব পরিস্থিতি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রধানমন্ত্রীকে সহকর্মী নির্বাচন করিতে হয়। দলের প্রধানদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া সদস্য নির্বাচন করিলে ক্যাবিনেট গঠিত হইবার পর গোলযোগ দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রধানমন্ত্রীকে সহকর্মী নির্বাচন করিতে হয়। অবশ্য বিশেষ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নিজের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী কেবল ক্যাবিনেট সভা গঠনই করেন না, ইচ্ছা করিলে তিনি ক্যাবিনেট সভা ভঙ্গ করিতে পারেন। অসদাচরণ বা অবমাননার অপরাধে কোন একজন বা কয়েকজন মন্ত্রীকে তিনি পদত্যাগে বাধ্য করিতে পারেন। ১৯২২ সালে মণ্টেগু ও ১৯৩৫ সালে স্যার স্যামুয়েল হোর পদত্যাগে বাধ্য হন। এতদ্ব্যতীত প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে সমগ্র মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনেট সভার অন্য সকল সদস্য পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। কোন মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সহিত

ক্যাবিনেট সভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী

কোন ব্যাপারে একমত না হইতে পারিলে উক্ত মন্ত্রীকেই পদত্যাগ করিতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীকে ক্যাবিনেট সভার জীয়ন কাঠি ও মরণকাঠি দুইই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বিভিন্ন মন্ত্রীদিগের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য। দুই বা ততোধিক মন্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার নিষ্পত্তি করেন প্রধানমন্ত্রী। এক কথায় ক্যাবিনেট সভার সদস্যদিগের পরিচালক হইলেন প্রধানমন্ত্রী।

মন্ত্রিসভার সংহতি রক্ষার দায়িত্ব

প্রধান শাসনকর্তারূপে প্রধানমন্ত্রী

ইংলণ্ড রাষ্ট্রের প্রধান অধিনায়ক হইলেন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। তিনি ক্যাবিনেট সভা আহ্বান স্থগিত বা ভঙ্গ করেন। ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করাও তাঁহার কাজ। সরকারের সাধারণ নীতি সহকর্মীদিগের সাহায্যে তিনিই নির্ধারণ করেন। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন এবং সরকারের মূল নীতি ব্যাখ্যার ভার গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যে বিবৃতি দেন। তিনি একাধারে এক বিরাট রাজনৈতিক দলের ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদিগের নেতা। ক্যাবিনেট সভার আলোচনায় বিচক্ষণতার সহিত পর্যালোচনা করিয়া তাঁহাকে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়।

রাজার উপদেষ্টা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী

সাধারণ ক্ষেত্রে রাজা ও রাণীর সহিত প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমেই মন্ত্রীদিগের বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। প্রধানমন্ত্রীই সাধারণভাবে সরকারের নীতি ও প্রয়োজনে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পৃথক পৃথক দপ্তরের কার্যাদি রাজার নিকট ব্যাখ্যা করেন। তাঁরই উপদেশ মত নানা ব্যক্তি ও গুণীজনকে রাজা সম্মান প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রী, সচিব, সহকারী সচিব ইত্যাদি রাজা নিয়োগ করেন। রাজার ক্ষমা প্রদর্শনের প্রাধিকার প্রধানমন্ত্রীই প্রয়োগ করেন। তাঁরই পরামর্শে রাজা পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই সীমাহীন আধিপত্যের মাধ্যমেই ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে।

কমন্স সভার নেতা প্রধানমন্ত্রী

কমন্স সভার অদ্বিতীয় নেতা হইলেন প্রধানমন্ত্রী। কমন্স সভার কার্য তাঁহার নির্দেশ অনুসারে অগ্রসর হয়। প্রত্যেক বিষয়ে পার্লামেণ্টে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন প্রধানমন্ত্রী। নিজের দপ্তর ব্যতিরেকে অন্যান্য মন্ত্রিগণের দপ্তরের কার্য ব্যাখ্যা করিয়া মন্ত্রীদিগের কার্যের সমর্থনে তিনি কমন্স সভায় বক্তৃতা করেন। সরকারী বিল প্রণয়নে তিনি বিশেষ সজাগ দৃষ্টি রাখেন। হুইপগণের মারফৎ তিনি দলের সদস্যদিগের আদেশ প্রেরণ করেন। পরিষদের কার্যসূচী তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন ও চরম অবস্থায় কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিবার অস্ত্র প্রয়োগ করেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী রাজা কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োজিত হন। পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে নিজ দলের সদস্যদিগের নিয়ন্ত্রণ করা ব্যতিরেকে সামগ্রিকভাবে দেশে নিজ দলের জনপ্রিয়তা রক্ষার চেষ্টা তাঁহাকেই করিতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর আচরণের মাধ্যমেই সাধারণ ব্যক্তি দলের প্রকৃতি অনুধাবনে প্রয়াস পায়। পরবর্তী নির্বাচনে স্বীয় দলের জয়লাভের জন্য কি করণীয় তাহা প্রধানমন্ত্রীই নির্ণয় করেন। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, সততা দলের শক্তি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক।

প্রধানমন্ত্রী ও বৈদেশিক নীতি

ইংলণ্ডের বৈদেশিক নীতি মূলতঃ প্রধানমন্ত্রীই প্রণয়ন করেন। তিনিই রাষ্ট্রদূতগণকে আহ্বান করেন এবং অন্য রাষ্ট্রের মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী-দিগের সহিত সরকারী মত বিনিময় করেন। যুদ্ধ বা আপৎকালে ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী একনায়করূপে প্রকাশ পান। পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার গ্রহণ না করিলেও পররাষ্ট্র ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীই চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হ্যালিফ্যাক্স পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন হিটলারের সহিত মিউনিক্ চুক্তি সম্পাদন করেন।

র‍্যামসে মুয়ির (Ramsay Muir) প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে ঠিকই বলিয়াছেন যে "He is in fact, though not in law, the working head of the state, endowed with such a plenitude of powers as no other constitutional ruler in the world possesses, not even the President of the U. S. A."

সপ্তম অধ্যায়

স্থায়ী বেসামরিক কর্মচারিবৃন্দ
(Permanent Civil Service)

[স্থায়ী বেসামরিক কর্মচারিবৃন্দের দায়িত্ব ও গুরুত্ব—ট্রেভিলিয়ান রিপোর্ট ১৮৫৬ সাল—রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি ও ব্যাপকতা এবং বেসামরিক কর্মচারীদিগের প্রয়োজনীয়তা—স্থায়ী কর্মচারীদিগের কর্মকুশলতা—মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারী—কর্মচারীদিগের শ্রেণীবিভাগ]

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে স্থায়ী বেসামরিক কর্মচারিবৃন্দ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে এই কর্মচারিবৃন্দের আবির্ভাব সূচিত হয়। মনোনয়নের মাধ্যমে তখন ঐ সকল কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ হইত, কিন্তু অবশেষে উপযুক্ত উৎকর্ষ ও যোগ্যতার অভাব হওয়ায় হেইলিবেরীতে উক্ত কর্মচারিবৃন্দের শিক্ষণের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৫৩ সালে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে স্থায়ী সরকারী কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগের বিষয় বিবেচনা করা হয়। ট্রেভিলিয়ান রিপোর্টে (Trevelyan Report) বলা হয়—"as an indispensable means of attracting able youngmen into the Service, admission should be placed on a basis of competitive examination open to all and administered by an independent central board." ১৮৫৫ সালে বেসামরিক সরকারী চাকুরি কমিশন গঠিত হয় ও উক্ত কমিশনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে সরকারী কার্যে প্রায় সকল স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ বেসামরিক সরকারী চাকুরির বিধিসম্মত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিযুক্ত হন। স্থায়ী বেসামরিক সরকারী কর্মচারিবৃন্দ বর্তমানে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে আইন ও অর্থসংক্রান্ত কার্য পরিচালনায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। আইনের কাঠামো, ও কর ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণে উক্ত কর্মচারিবৃন্দের বিশেষ দায়িত্ব অনস্বীকার্য। র‍্যামসে মুইর (Ramsay Muir) বলিয়াছেন, "Bureaucracy has become during the last century, and especially during the last

generation, a far more potent and vital element in our system of Government than the text book realises."[1]

বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাপকতা ও জটিলতা লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রের কার্যের সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রীদিগের একক প্রচেষ্টায় শাসনব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালনা করা দুঃসাধ্য। মন্ত্রী-দিগের অধীনস্থ দপ্তরগুলি পরিচালনার ভার মুখ্যতঃ স্থায়ী সরকারী কর্মচারি-বৃন্দের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মন্ত্রিগণ স্থায়ীভাবে নিয়োজিত হন না। একটি নির্দিষ্টকালের জন্য মন্ত্রিপদে আসীন থাকার পর তাহাদের কার্যের অবসান ঘটে। এমতাবস্থায় তাঁহাদের উপর যে দপ্তরগুলি পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয় সেই দপ্তর সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রতিভাত হয় না। অপরদিকে স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ কর্মকুশল ও বিশেষ দপ্তর সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠেন। অনভিজ্ঞ মন্ত্রীদিগের ঐ কর্মচারিবৃন্দের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা ভিন্ন-গত্যন্তর থাকে না। বহু ক্ষেত্রে মন্ত্রীদিগের উপর এমন দপ্তর-সকলের ভার অর্পণ করা হয় যেগুলি সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই। গাণিতিক শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে হয়ত অর্থসংক্রান্ত দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হইল। একদা ডিস্‌রেলী কোন এক ব্যক্তিকে বাণিজ্য দপ্তরের ভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিলে উক্ত ব্যক্তি স্থানীয় শাসন বিভাগীয় দপ্তরের ভার গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উত্তরে ডিস্‌রেলী বলেন, "It does not matter...I suppose you know as much about trade as the first Lord of Admiralty knows about ships." বলডুইন মন্ত্রিসভায় কূটনীতি-অনভিজ্ঞ চেম্বারলেনকে বৈদেশিক দপ্তরের এবং কূটনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনীতি-অভিজ্ঞ চার্চিলকে অর্থসংক্রান্ত দপ্তরের ভার অর্পণ করা হয়। ইহা হইতে বেশ বোধগম্য হয় যে মন্ত্রিসভা শাসনবিভাগের মধ্যমণিরূপে অবস্থান করিলেও স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দকেই প্রকৃত ক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। অবশ্য সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায় কিয়ৎ পরিমাণে অনভিজ্ঞ মন্ত্রীদিগের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসার লাভ করে ও উদারনৈতিক আদর্শের দ্বারা ঐ মন্ত্রিগণ অনুপ্রাণিত হন। অপর পক্ষে বিশেষজ্ঞ কর্মচারিবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তব অভিজ্ঞতার দরুণ সংকীর্ণ ও সীমিত হয়। জনসাধারণের বৃহত্তর চাহিদা ও

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত সরবরাহের মধ্যে মন্ত্রিসভা এক সেতু নির্মাণ করে।

মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারী

আইন সভার সদস্য ও আইন সভা নিয়ন্ত্রিত মন্ত্রী বিশেষভাবে রাজনীতির সহিত সম্পর্কযুক্ত কিন্তু স্থায়ী কর্মচারী প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সহিত সংযুক্ত নহেন। স্থায়ী সরকারী কর্মচারিবৃন্দ মন্ত্রীদিগের ন্যায় কমন্স সভার সদস্য নহেন। মন্ত্রিগণ একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন কিন্তু সরকারী কর্মচারীদিগের পদাধিকার স্থায়ী। মন্ত্রিসভার রদবদল হইলেও কর্মচারীদিগের রদবদলের সম্ভাবনা থাকে না। মন্ত্রিগণ প্রায়শঃই নিজ নিজ দপ্তর পরিচালনায় অনভিজ্ঞ; কিন্তু কর্মচারিবৃন্দ কর্মকুশল, দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ হন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মন্ত্রিসভার অধীনে থাকিতে হয় বলিয়া স্থায়ী সরকারী কর্মচারীকে পরিবর্তনশীল মনের অধিকারী হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত সরকারী নীতি নির্ধারণ মন্ত্রীদিগের দায়িত্ব। ঐ নীতিকে বাস্তব কার্যে রূপ দেওয়া কর্মচারীর দায়িত্ব। ইহার ফলে সরকারী নীতির ভালমন্দ সকল কিছুর জন্য মন্ত্রিগণই দায়ী থাকেন। নিন্দা বা প্রশংসা কর্মচারিবৃন্দকে স্পর্শ করে না।

কর্মচারীদিগের শ্রেণীবিভাগ

স্থায়ী বেসামরিক সরকারী কর্মচারিবৃন্দকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথকভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই শ্রেণীবিভাগের কাঠামো অনেকটা পিরামিডের ন্যায়। সাধারণভাবে মূল পরীক্ষায় সকলকেই অংশ গ্রহণ করিতে হয় এবং পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে প্রার্থীকে দপ্তর ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ক্ষমতার ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করিলে আমরা সর্বপ্রথম স্থায়ী অধীনস্থ সচিবের কথা উল্লেখ করিব। উক্ত সচিবকে সাহায্য করিবার জন্য দুইজন সহকারী সচিব আছেন। এই পদগুলির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন বলিয়া এই পদে মনোনয়নের ভিত্তিতে প্রার্থীকে গ্রহণ করা হয়। প্রথম শ্রেণীর কেরাণীগণ মূল কেরাণীর পদে উন্নতি লাভ করেন। 'সাধারণ

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রথম শ্রেণীর কেরাণীগণ নিয়োজিত হন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কেরাণীদিগের জন্যও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পৃথক ব্যবস্থা আছে। বিভাগীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সহকারী কেরাণীগণকে নিয়োগ করা হয়। এতদ্ব্যতীত সর্বনিম্ন ধাপে প্রাথমিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে বয় ক্লার্ক নিয়োগ করা হয়।

অতএব স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে হইয়া থাকে। অবশ্য রাজা প্রত্যক্ষভাবে যে স্থলে কোন কর্মচারী নিয়োগ করেন বা যে ক্ষেত্রে ক্রম-উন্নতির ভিত্তিতে কর্মচারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয় সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কোন প্রশ্ন উঠে না।

অগ্ এবং জিনক্ স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দকে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—শাসন সংক্রান্ত কর্মচারিগণ (The Administrative Class), কার্যনির্বাহক কর্মচারিগণ (The Executive Class), কেরাণীগণ (The Clerical Class) ও সহকারী কেরাণীবৃন্দ (The Clerical Assistant Class)।

শাসন সংক্রান্ত কর্মচারিগণ শাসন ব্যবস্থার কাঠামোতে শীর্ষস্থান গ্রহণের অধিকারী। এই কর্মচারিগণের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় তিন সহস্র। একুশ হইতে চব্বিশ বৎসরের স্নাতকোত্তর যুবকবৃন্দের মধ্য হইতে লিখিত ও মৌখিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে এই পদের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করা হয়।

কার্যনির্বাহক কর্মচারিবৃন্দের বর্তমান সংখ্যা প্রায় ৬৫০০০। ১৮ বা ১৯ বৎসর বয়স্ক যুবকবৃন্দ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এই পদে আসীন হইতে পারে। অবশ্য আংশিকভাবে সর্বক্ষেত্রে ক্রম-উন্নতির ভিত্তিতেও অধস্তন বিভাগ হইতে কিছু কর্মচারী উর্ধ্বতন বিভাগে অধিষ্ঠিত হয়।

১৯৫২ সালের হিসাব অনুসারে কেরাণীর সংখ্যা এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে গৃহীত পরীক্ষার ফলের উপর এই পদের প্রার্থীদের নিয়োগ নির্ভর করে। ১৬।১৭ বৎসরের তরুণগণ এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তিতে গৃহীত এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সহকারী কেরাণীগণকে নিয়োগ করা হয়।

স্থায়ী বেসামরিক সরকারী কর্মচারিগণকে নির্বাচন করিবার নিমিত্ত এক বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগ কমিশন আছে। কমিশনের সদস্যগণ রাজা কর্তৃক মনোনীত। লিখিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিবার পর প্রার্থীদিগের এক সাক্ষাৎকারে (interview) উপস্থিত হইয়া বুদ্ধিবিবেচনার পরিচয় দিতে হয়। কমিশন কর্তৃক নির্বাচিত প্রার্থিগণকে নিজ নিজ দায়িত্বপালনে কুশলতা লাভের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

দক্ষতা ও কর্মকুশলতার উপর অনেকাংশে পদোন্নতি নির্ভরশীল। এতদ্ব্যতীত পদোন্নতির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে কর্মচারিবৃন্দ অংশ গ্রহণ করিতে পারেন।

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ রাজনীতির সহিত সম্পর্কবিহীন বলিয়া স্থায়ী ভাবে নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অসদাচরণ, অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগহেতু ঐ কর্মচারিবৃন্দ অপসারিত হইতে পারেন। রাজার সদিচ্ছার উপর সকল কর্মচারিগণের চাকুরি নির্ভর করে। কিন্তু সাধারণতঃ কর্মকুশলতার অভাব ও অসদাচরণ ব্যতীত অন্য কারণে কাহাকেও অপসারণ করা হয় না।

অবসর গ্রহণের পর কর্মচারিবৃন্দ পেনসন ভোগ করিতে পারেন। সাধারণতঃ ৬০ হইতে ৬৫ বৎসরের মধ্যে কর্মচারিগণ অবসর গ্রহণ করে।

ত্রুটি :—ব্রিটিশ স্থায়ী বেসামরিক কর্মচারিবৃন্দ তাঁহাদের দক্ষতা কর্মকুশলতা ও কর্মনিষ্ঠার জন্য বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিহীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

প্রথমতঃ—পূর্বে সকলক্ষেত্রে উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হয় নাই। পৃষ্ঠপোষকতা লাভের দ্বারা সময় সময় অনুপযুক্ত ব্যক্তিও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইত।

দ্বিতীয়তঃ—পুঁথিগত বিদ্যার উপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে জোর দেওয়া হয়। বিভাগীয় কর্মকুশলতার পরিচয় ঐ পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রার্থিগণ দিতে সক্ষম হন না।

তৃতীয়তঃ—সরকারী প্রথা ও নিয়মের জটিলতা এই ব্যবস্থায় দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালিত হইতেছে।

চতুর্থতঃ—কর্মচারিবৃন্দ ধীরে ধীরে ক্ষমতা সচেতন হইয়া উঠিতেছেন। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় বেসামরিক কর্মচারীর গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা ক্রমে সচেতন হইয়া উঠিতেছেন ও ক্ষমতা লোভীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেছেন।

পঞ্চমতঃ শাসনকার্যকে বিভাগীয় ভিত্তিতে বিভক্ত করিবার জন্য এক বিভাগের সহিত অন্য বিভাগের সহযোগিতা, যোগাযোগ হ্রাস পাইতেছে ও সামগ্রিক ভাবে শাসনকার্য পরিচালনা ব্যাহত হইতেছে।

ষষ্ঠতঃ—স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ যতই সুসংগঠিত হইবেন ততই গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তরালে নিজেদের ক্ষমতা লিপ্সা চরিতার্থ করিতে প্রয়াসী হইবেন। ফলে ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শিথিল হইয়া পড়িবে।

স্থায়ী কর্মচারীদিগের অবদান ঃ

একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমানে বিশেষ উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক শ্রেণী স্থায়ী বেসামরিক কর্মে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। চাকুরির স্থায়িত্ব, নিরপেক্ষতা, কর্মচারিগণের সহজ পরিবর্তনশীল মনোভাব বহু ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। ফলে মেধাবী, প্রতিভাদীপ্ত যুবকবৃন্দ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণে তৎপর হইয়াছেন। ইহাতে শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের সুশাসনের ফলেই এককেন্দ্রিক ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক কাঠামো স্থাপন সম্ভব হইয়াছে।

অতিরিক্ত বিভাগীয় বণ্টন, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি জনিত যেসকল ত্রুটি স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি তাহার প্রতিষেধক হিসাবে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছে। বস্তুতঃ মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতার জন্য মন্ত্রী ও কর্মচারিগণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে। জনমতের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া প্রয়োজনবোধে নীতির পরিবর্তন-সাধনপূর্বক কর্মচারিগণ কাজ করিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত কর্মচারিগণ সর্বদা সুশৃংখলভাবে মর্যাদা রক্ষা করিয়া কাজ করিবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

কর্মচারীদিগের বিরুদ্ধে আমলাতন্ত্র প্রবর্তনের যে অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা সঠিক নহে। যেস্থলে কর্মচারীদিগের হস্তে সামগ্রিকভাবে

শাসন-ক্ষমতা ন্যস্ত হয় সেইক্ষেত্রেই আমলাতন্ত্রের প্রবর্তন হইয়াছে বলা যায়। কিন্তু ইংলণ্ডে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার অবস্থানহেতু কর্মচারিগণ আমলাতন্ত্র প্রবর্তনে সাহসী হইতে পারেন না।

অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা ও স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ (Delegated Legislation)

মন্ত্রিগণ শাসনবিভাগের শীর্ষস্থানীয় কর্মচারী হিসাবে সরকারের নীতি নির্ধারণ করেন এবং নীতির উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করেন। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে শাসনকার্যের সম্প্রসারণ ও জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এককভাবে মন্ত্রিপরিষদ সকল বিভাগের খুঁটিনাটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও সময় সময় দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। ফলে, নির্দিষ্ট কালের জন্য অধিষ্ঠিত মন্ত্রিগণকে প্রায়শঃই স্থায়ী, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও দপ্তরের বিভাগীয় কার্যে বিশেষজ্ঞ কর্মচারিবৃন্দের উপর নির্ভর করিতে হয়।

মন্ত্রিগণ নামমাত্র আইনের সাধারণ উদ্দেশ্য বা কাঠামো প্রণয়ন করেন এবং বিস্তারিত ভাবে আইন প্রণয়নের কার্য কর্মচারিবৃন্দের উপর অর্পিত হয়। শাসনকর্তৃপক্ষ-প্রবর্তিত প্রতিটি আইনের উপর কর্মচারীদিগের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। অর্পিত ক্ষমতার বলে স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা
(Local Government)

[স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা কাহাকে বলে—গুরুত্ব—স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার সংগঠন—পৌর জিলা ও গ্রাম্য জিলা শাসন-ব্যবস্থা—কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সহিত সম্পর্ক]

স্থানীয় শাসন সম্পর্কিত ব্যাপার যখন স্থানীয় নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তখন সেই শাসন-পদ্ধতিকে স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা বলা যায়। ইংলণ্ডের স্বাধীনতা-স্পৃহার মূল উৎস হইল স্বাধীন স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা। ব্ল্যাকস্টোন বলিয়াছেন "The liberties of England may be ascribed above all things to her free local institution." গণতন্ত্রের সাফল্য স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। গণতন্ত্রকে শিক্ষার বাহনরূপে আখ্যায়িত করা হয়। স্থানীয় শাসন-যন্ত্রের প্রকৃতি ও চরিত্রের উপর গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রসার নির্ভর করে। ইংলণ্ডের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি অতি প্রাচীন ও প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত করিতে ও গণতান্ত্রিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে সহায়ক হইয়াছে।

স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার সংজ্ঞা

স্যাক্সন আমলে শায়ার (Shire), বারো (Borough), টাউনশিপ (Township) প্রভৃতির অবস্থান ছিল। নর্ম্যান আমলে শায়ারগুলি কাউন্টিতে (County) রূপান্তরিত হয়। মধ্যযুগে ইংলণ্ডে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান বলিতে কাউন্টি, বারো, পারিশ (Parish) বুঝা যাইত। শিল্পবিপ্লবের পর স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সহরে প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়, ফলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের প্রয়াস দেখা দেয়। ১৮৩৫ সালের স্থানীয় কর্পোরেশনের আইন অনুসারে বারোগুলিকে স্থানীয় শাসনের একটি কাঠামো দেওয়া হয় অর্থাৎ বারোগুলির সংস্কারসাধন করা হয়। ১৮৮৮ সালে

স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার অতীত ও বর্তমান কাঠামো

কাউন্টিগুলির সংস্কারসাধন হয়। শাসন-বিভাগীয় কতকগুলি ক্ষমতা এই আইনের বলে কাউন্টিগুলির হস্তে অর্পিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত কাউন্সিলের সহায়তায় স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইবার নজীর স্থাপিত হয়।

স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রধানতঃ দুই ভাগে, যথা কাউন্টি বারো ও শাসন (administrative) কাউন্টিতে দেশকে বিভক্ত করা হইয়াছে।

স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার সংগঠন

এক একটি কাউন্টিকে বহুসংখ্যক জিলায় (Districts) বিভক্ত করা হইয়াছে। জিলাগুলি দুই প্রকারের, যথা সহরাঞ্চল জিলা (Urban Districts) ও গ্রামাঞ্চল জিলা (Rural Districts)। অনেকগুলি পারিশের (Parish) সমন্বয়ে জিলাগুলি গঠিত।

শাসন কাউন্টি (administrative counties)-গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে প্রায় ৬২টি শাসন কাউন্টি ও প্রায় ৮০টি কাউন্টি বারো ইংলণ্ডে বর্তমান। কাউন্টিগুলির ঐতিহাসিক ঐতিহ্য আছে। সভাপতি, অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলর সমন্বয়ে গঠিত কাউন্টি কাউন্সিল, কাউন্টি পরিচালনা করে। কাউন্সিলরগণ নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হন। বৎসরে চারিবার কাউন্টি কাউন্সিলের অধিবেশন বসে।

জিলাগুলিরও পৃথক কাউন্সিল আছে। জিলা কাউন্সিলগুলি জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে। পারিশগুলি জিলার মধ্যে অবস্থিত মহকুমাস্বরূপ। নিজ নিজ কাউন্সিলের মাধ্যমে পারিশগুলি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রয়োগ করে। স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলির যে ব্যয় হয় তাহা স্থানীয় কর, ঋণ, ব্যবসাগত আয় প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করা হয়। নাগরিকগণের জন্য স্বাস্থ্যকর সুস্থ পরিবেশ গঠন, পথঘাটে আলোর ব্যবস্থা, অগ্নিনির্বাপণ, পুলিশবাহিনী গঠন, ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক উন্নয়নসাধন প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম কর্তব্য।

বারোগুলি, বারো কাউন্সিলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মেয়র, অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলরগণের সমন্বয়ে বারো কাউন্সিল গঠিত হয়। বারো কাউন্সিলরগণ তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং কাউন্সিলরদিগের

মধ্য হইতে অল্ডারম্যান নির্বাচিত হন। মেয়র পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বিশেষ সম্মান লাভের অধিকারী। বারো কাউন্সিলগুলির কোন আভ্যন্তরীণ কার্যে বাহিরের হস্তক্ষেপ সহ্য করা হয় না। জনসংখ্যার অনুপাতে বারো, কাউন্টি, পারিশ প্রভৃতি কাউন্সিলের কাউন্সিলরগণের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। বারোগুলির অধীনে কয়েকটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি আছে, ঐ কমিটিগুলির মাধ্যমে স্থানীয় শাসনকার্য বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বর্তমানে পার্লামেণ্ট স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিয়ৎ পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। শিক্ষা, পুলিশ ইত্যাদি বিভাগে সাহায্যের জন্য পার্লামেণ্ট স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য করে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য, স্বরাষ্ট্র, পরিবহন, শিক্ষা, বাণিজ্য, বিদ্যুৎ প্রভৃতির দপ্তর হইতে প্রয়োজন অনুসারে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অভিযোগ শ্রবণ, অভিযোগের কারণ অনুসন্ধান, তৎসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা, গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাহার নিষ্পত্তি করা ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকার আপন দায়িত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

অতীতে স্থানীয় শাসন সম্পর্কিত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ দেখা যায় নাই। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রবর্তনের ব্যাপক প্রবণতা দেখা যায়। ইহার ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিশেষরূপে ব্যাহত হইবে বলিয়া আশংকা করা যায়। বর্তমানে পরামর্শদান ব্যতীত আইনের সীমারেখা, কার্যের পরিধি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়াসী হইয়াছে। টকেয়াভেলী বলিয়াছেন, "Local Assemblies of citizens constitute the strength of citizens" কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের আধিক্য ঘটিলে নাগরিকের এই স্বাধিকার বিলুপ্ত হইবে বলিয়া আশংকা করিবার কারণ আছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্ক

নবম অধ্যায়

ইংলণ্ডের বিচার-ব্যবস্থা

(Judicial System in England)

[ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত—আদালতসমূহের সংগঠন, ফৌজদারী বিচারালয়ে জুরী প্রথার প্রবর্তন]

গ্রেট ব্রিটেনের বিচারালয়গুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা দেওয়ানী ও ফৌজদারী।

দেওয়ানী আদালতের সংগঠন

দেওয়ানী বিচারালয়ঃ কাউন্টি ও বারো আদালতগুলিই ক্ষুদ্রতম দেওয়ানী আদালত। কাউন্টি অথবা বারো আদালত-গুলিতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের মামলা বা সাধারণ দাবিদাওয়া লইয়া মামলা অনুষ্ঠিত হয়। লণ্ডনের সিটি আদালতই লণ্ডনের কাউন্টি আদালত। বৃহত্তর স্বার্থের দাবিদাওয়া লইয়া নিম্ন আদালত হইতে আনীত আপীলের বিচার, অধিক অর্থ সম্বন্ধীয় সকল মামলা উচ্চ বিচারালয় The High Court of Justiceএ অনুষ্ঠিত হয়। উচ্চ বিচারালয়ের তিনটি প্রধান বিভাগ আছে, যথা রাজার বিচার বিভাগ (King's Bench), দ্বিতীয়তঃ চ্যান্সারী বিভাগ (The Court of Chancery), তৃতীয়তঃ ইচ্ছাপত্র (Probate), বিবাহ বিচ্ছেদ (Divorce) ও নৌবাহিনীর (Admiralty) বিভাগ।

রাজার বিচার বিভাগ

রাজার বিচার-বিভাগের প্রথাগত আইন-স্বীকৃত (Common Law) সকল ক্ষমতা ও প্রাধিকার আছে। চ্যান্সারী বিভাগ তাহার আদিম পূর্বতন কিছু ক্ষমতা হারাইলেও বর্তমানে যোগপ্রথায় ব্যবসা, বন্ধকী ব্যবসা ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে একক ও বিশেষ বিচার ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

লর্ড চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে রাজা কর্তৃক উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ মনোনীত হন। উচ্চ বিচারালয় হইতে আপীল আদালতে আপীল করা যায় (Court of Appeal)। আপীল আদালতের বিচারকগণ প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হন। লর্ডস্ সভাই (House of Lords) সর্বশেষ স্তরের আপীল আদালত। জটিল আইন সংক্রান্ত প্রশ্নে লর্ডস সভার নিকট আপীল করা যায়। লর্ড চ্যান্সেলর সহ মোট

দশজন আইনজ্ঞ লর্ডস্ সভায় আপীলের বক্তব্য শ্রবণ করেন ও সেইমত রায় দান করেন। ডোমিনিয়ন বা উপনিবেশসমূহ হইতে আনীত আপীল প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনালে গৃহীত হয়। প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে প্রিভি কাউন্সিলের বিচার কমিটিতে আপীলের শুনানী হয়। লর্ডস্ সভার বিচারকগণ পরস্পর-বিরোধী রায় প্রদান করিতে পারেন কিন্তু বিচার বিভাগীয় কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে একটি রায় প্রদানে কেবল সক্ষম।

লর্ডস্ সভা আপীল গ্রাহ্য না হয় অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল সপরিষদ রাজা বা রাণীকে অনুজ্ঞা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

ব্রিটিশ প্রজাবৃন্দ আদালতের ন্যায় বিচারে সন্দিগ্ধ হইয়া রাজা বা রাণীর নিকট প্রতিকার দাবী করিতে পারেন। সপরিষদ রাজা বা রাণী সেই আবেদন গ্রাহ্য করিতে সক্ষম।

ফৌজদারী বিচারালয়ঃ

ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য সর্বনিম্ন আদালত হইল একতরফা আদালত বা Court of Summary Jurisdiction। ছোট ছোট অপরাধের বিচারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে আদালতে বিচারকার্য পরিচালিত হয়। ত্রৈমাসিক আদালত (Quarter Sessions) হইল পরবর্তী উচ্চ বিচারালয়।

ফৌজদারী বিচারালয়ের সংগঠন ও শ্রেণীবিভাগ

ত্রৈমাসিক আদালত কাউন্টি আদালতের সমপর্যায়ভুক্ত। নিম্ন আদালত হইতে আনীত আপীলের শুনানী ও জুরীপ্রথার ভিত্তিতে কতকশ্রেণীর ফৌজদারী মামলার বিচার এই আদালতে চলে। গুরুতর অপরাধের মামলার বিচারের শুনানী পরবর্তী আদালত ভ্রাম্যমাণ বিচারালয়ে (Assizes) হয়। বৎসরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে এই আদালতের অধিবেশন বসে। জুরীর সাহায্যে প্রধান বিচারালয়ের একজন বিচারপতি এই আদালত পরিচালনা করেন। সরকারী কর্মচারী দ্বারা অনুষ্ঠিত গুরুতর অপরাধের বিচার রাজা বা রাণীর বিচার বিভাগে পরিচালিত হয়। ফৌজদারী আপীল আদালত (Court of Criminal Appeal) হইল ফৌজদারী বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত। ইংলণ্ডের লর্ড জাষ্টিস্ ও উচ্চ বিচারালয় বা রাজা বা রাণীর বিচার বিভাগের একাধিক বিচারপতির সমন্বয়ে এই আদালত গঠিত হয়। জটিল আইন সংক্রান্ত বিষয়ে রায়দানের

সর্বশেষ ক্ষমতা লর্ডস্ সভার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এ্যাটর্ণী জেনারেলের সম্মতিক্রমে গুরুত্বপূর্ণ মামলার আপীল লর্ডস্ সভায় গৃহীত হইতে পারে।

উচ্চ আদালতসমূহের বিচারকগণ লর্ড চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে রাজা বা রাণী কর্তৃক ও নিম্ন আদালতের বিচারকগণ লর্ড চ্যান্সেলরের দ্বারা নিযুক্ত হন। যতদিন বিচারকগণ সদাচারী থাকেন ততদিন তাঁহারা স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। একমাত্র অসদাচরণের জন্য অথবা পার্লামেণ্ট সভার উভয় পরিষদের যুক্ত আবেদনের বলে, বিচারকগণকে পদচ্যুত করা যায়। এমন কি রাজা বা রাণীর ইচ্ছানুসারে উচ্চ আদালতের বিচারকগণকে অপসারিত করা সম্ভব হয় না। কার্যকালে বিচারকগণ আইনের অনুশাসন (Rule of Law) দ্বারা আবদ্ধ হন না। বিচারকার্য পরিচালনা প্রসঙ্গে বিচারকগণ যে সকল কথা উচ্চারণ করেন বা যে সকল কার্য করেন তাহার জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইতে পারে না। রাজনীতির সহিত বিচার বিভাগ জড়িত হইয়া পড়িবে এই আশংকায় ইংলণ্ডে বিচারকগণকে নিয়োগ করা হয় কিন্তু নির্বাচন করা হয় না।

বিচারকগণের নিয়োগ পদ্ধতি

বিনা বিলম্বে দ্রুতগতিতে ইংলণ্ডের আদালতে বিচারকার্য পরিচালিত হয়। বিচারকগণ ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ আইন বিষয়ের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকায় এই গতিসম্পন্ন বিচারকার্য পরিচালনার মাধ্যমে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন সম্ভব হইয়াছে। দীর্ঘসূত্রতা বা অহেতুক বিলম্ব করিবার কোন অবকাশ আইন বিশারদগণ কোন অবস্থাতে লাভ করেন না। ইংলণ্ডের আদালতে সলিসিটর ও ব্যারিস্টার এই দুই শ্রেণীর ব্যবহারজীবির কথা শুনা যায়। সলিসিটরগণ প্রত্যক্ষভাবে মক্কেলের সহিত কথাবার্তা বলিয়া ওকালতনামা প্রস্তুত করেন, ব্যারিস্টারগণ তাহার ভিত্তিতে বিতর্কের সূত্রপাত করেন।

দ্রুত বিচার-ব্যবস্থা

সুস্থ, রুচিসম্পন্ন পরিবেশের মধ্যে আদালতের কার্য সম্পাদন ইংলণ্ডের বিচার বিভাগের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাক্ষীকে কোন অবস্থায় অসৌজন্য প্রদর্শন করা হয় না। আদালত কক্ষে সৌজন্যমূলক পরিবেশ গঠনের দিকে স্বয়ং বিচারপতি দৃষ্টি রাখেন।

সুস্থ পরিবেশ

অপসারণের ভয় না থাকায়, চাকুরির স্থায়িত্ব থাকায় নিরপেক্ষভাবে বিচারকগণ কার্য পরিচালনায় সক্ষম। বস্তুতঃ আইন বা শাসনবিভাগ এমন কি রাজার সহিত সম্পর্কবিহীনভাবে ইংলণ্ডের বিচারকগণ কার্য সম্পাদনে সক্ষম। কোন অবস্থাতেই প্রভাবিত হইবার কোন কারণ বিচারকদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত হয় না। নির্ভীকভাবে বিচারকগণ আপন কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন। অবশ্য বিচারকগণও রাষ্ট্রের ভৃত্য এবং রাষ্ট্রের আইন বলবৎ রাখা তাঁহাদেরও সুমহান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। অভিযোগ আছে, ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে অধিকাংশ বিচারপতি নিয়োজিত হন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী অতিক্রম করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারা ও ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিচারকগণ আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করিয়া থাকেন, ফলে নিরপেক্ষতা কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাহত হইতে পারে।

বিচারকগণের নিরপেক্ষতা

ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। ফলে পার্লামেন্টের প্রাধান্য বিচারালয়গুলিও মানিতে বাধ্য। ইংলণ্ডের আদালত পার্লামেন্টের আইনের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইলেও আইনের বৈধতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপনে সক্ষম নহে। পার্লামেন্টের আইন দ্বারা বিচারালয়ের যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করা সম্ভব।

পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব

জুরীর সাহায্যে বিচার প্রবর্তন ইংলণ্ডের আদালতের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিচারক যাহাতে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ না করিতে পারেন সেইজন্য জুরী প্রথার প্রবর্তন করা হয়। ফৌজদারী মামলা ও গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানী মামলার বিচার জুরীর সাহায্যে সম্পাদিত হয়। জুরীর সাহায্যে বিচারকে সমর্থন জানাইয়া লর্ড ক্যামডন বলেন, "Trial by jury is indeed the foundation of our free constitution, take that away and the whole fabric will soon moulder into dust."

জুরীর প্রবর্তন

দশম অধ্যায়

রাজনৈতিক দল

(Political Parties)

[দায়িত্বশীল সরকার ও দলীয় প্রথা—হুইগ ও টোরী দল—উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দল, শ্রমিক দলের উদ্ভব—বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ও নীতি—দলীয় সংগঠন]

দায়িত্বশীল সরকারের গঠন ও উৎকর্ষ, দলীয় প্রথার উপর সবিশেষ নির্ভরশীল। বস্তুতঃ দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। জনমত সংগঠন করিবার ক্ষেত্রে সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক দলগুলির কার্য-পদ্ধতি ও উৎকর্ষ অনুধাবন না করিতে পারিলে ব্রিটিশ রাজনীতি ও শাসন-পদ্ধতি সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলের অবস্থান হেতু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে ও রাজার ক্ষমতা সীমিত হইয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ব্রিটেনে সরকার গঠন করে ও উক্ত দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী রূপে মনোনয়ন করা হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলির মধ্যে সুবৃহৎ দলটি সরকারী বিরোধী দল হিসাবে কার্য করে।

পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থা ও দলীয় প্রথা

প্রাচীনকাল হইতেই গ্রেট ব্রিটেনে দুইটি রাজনৈতিক দলের অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। স্বৈরাচারী স্টুয়ার্ট রাজাদিগের বিরুদ্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় প্রথম পার্লামেণ্টারী বিরোধী দল কার্য আরম্ভ করে। ১৬৮০ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে হুইগ (Whig) ও টোরী (Tory) দল আত্মপ্রকাশ করে। উনবিংশ শতকে হুইগ ও টোরী দল উদারনৈতিক (Liberal) ও রক্ষণশীল (Conservative) দলে রূপান্তরিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তৃতীয় রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। বর্তমানে ব্রিটেনে তিনটি দল আছে রক্ষণশীল, শ্রমিক (Labour) ও উদারনৈতিক দল।

দলীয় ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরিক্রমা

ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলগুলি আইনসভার অভ্যন্তরে ও বাহিরে দলীয় সংহতি ও নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করে। দলীয় নেতার নির্দেশক্রমে সকল সদস্য কার্য পরিচালনা করে। ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালনা

নিয়মানুবর্তিতা

ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়করণের ব্যবস্থা বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা দলের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অধিক। কেন্দ্রীয় নির্দেশের দ্বারা দলের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রভাবিত হয়। ছোট দেশ ও জনসংখ্যা পরিমিত বলিয়া ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় কেন্দ্রীয়করণ সম্ভব হইয়াছে।

কেন্দ্রীয়করণের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দলের অভ্যন্তরে নিয়মানুবর্তিতার কঠোরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দলীয় সংগঠনশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যক্তির প্রতিপত্তি দলীয় পরিচালনার কাঠামোতে হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে নিবাচন-প্রার্থী জানেন তাঁহার সাফল্য নির্ভর করে দলের সংগঠন শক্তির উপর, সেই হেতু ব্যক্তি প্রতিপত্তিশালী হইলেও দলের সংগঠন শক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারে না। দলীয় নেতার ক্ষমতা অপরিসীম, বিশেষতঃ নেতা যদি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন। সাধারণ নাগরিকবৃন্দ দলের নীতিসংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না বুঝিতে সক্ষম হইলেও দুই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন। ডিসরেলী ও গ্লাড্‌স্টোনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধারণ নাগরিককে সহজেই উৎসাহী করিয়া তুলে।

শ্রমিক ও রক্ষণশীল দলের প্রাধান্য

বর্তমানে ব্রিটেনে তিনটি দল বিদ্যমান থাকিলেও, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব শ্রমিক দল (Labour) ও রক্ষণশীল (Conservative) দলের মধ্যে তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। দুইটি প্রধান দল থাকায় নির্বাচকদিগের অনেক সুবিধা হইয়াছে। ভোট দিবার সময় তাহারা কাহাকে সমর্থন করিতেছে এবং দুইটি দলের নীতিগত পার্থক্য ইত্যাদি বিশেষভাবে বুঝিতে পারে।

শ্রমিক দল (Labour Party)

গণতান্ত্রিক সমাজবাদে (Democratic Socialism) বিশ্বাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত শ্রমিক দল দেশের শিল্পগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানা (Private Enterprise) হইতে রাষ্ট্রের মালিকানায় (Public Enterprise) আনয়নের জন্য প্রয়াসী। শিল্পের জাতীয়করণ, শ্রমিক সমাজের মঙ্গল শ্রমিক দলের বিশেষ কাম্য। শ্রমিক দলের সদস্যগণ বিশেষভাবে

আদর্শ ও ভাবাবেগের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই জন্য শ্রমিক দলে একাধারে বুদ্ধিজীবি, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর সমাবেশ ঘটিয়াছে।

শ্রমিক সংস্থা (Trade Union), সমবায় সংস্থা (Co-operative units) ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে শ্রমিক দল সংগঠনগত কার্য পরিচালনা করে। এতদ্ব্যতীত সমাজতান্ত্রিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে শ্রমিক দলের পক্ষ সমর্থন করে। ফেবিয়ান সংস্থা, সমাজবাদী চিকিৎসকদিগের সংস্থা, ইহুদি সমাজবাদী শ্রমিক সংস্থা প্রভৃতি শ্রমিক দলের অন্যতম সাংগঠনিক উৎসস্বরূপ। কিঞ্চিদধিক ৯০টি শ্রমিক সংস্থা এই দলটির সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। দলের অধিকাংশ সদস্য শ্রমিক সংস্থার মধ্য হইতে সংগ্রহ করা হয়। দলের ব্যয়ভারের এক বৃহৎ অংশের দায়িত্ব শ্রমিক সংস্থাগুলি গ্রহণ করে।

শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় সংস্থা বৎসরে একবার প্রকাশ্য অধিবেশন আহ্বান করে এবং উক্ত অধিবেশনে এক কার্যকরী সমিতি নির্বাচন করে। আইন সভার নির্বাচিত দলের সভ্যগণ পৃথকভাবে মিলিত হইয়া আইনসভায় দলীয় নেতার নির্বাচন করেন। কার্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দ, শ্রমিক সংস্থা ও সমবায় সংস্থাগুলির প্রতিনিধি এবং পার্লামেণ্টে নির্বাচিত দলের সদস্যগণ জাতীয় শ্রমিক কাউন্সিলে মিলিত হন। জাতীয় শ্রমিক কাউন্সিলের অন্যতম কর্তব্য হইল বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সংহতি ও সমন্বয় বজায় রাখা। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি কেন্দ্রীয় দপ্তরে মিলিত হইয়া স্থানীয় সংস্থাগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে, প্রয়োজনে বক্তা নির্বাচন করে, স্থানীয় সংস্থাগুলির নিজস্ব অধিবেশন আহ্বানে সহায়তা করে ও পরামর্শ দেয়। প্রার্থী মনোনয়ন, প্রচার কার্য ও নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করাও ইহার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। পার্লামেণ্টে নির্বাচিত শ্রমিক দলের সদস্যগণ পৃথকভাবে মিলিত হইয়া তাহাদের কার্যপদ্ধতি নির্ণয় করে। হুইপগণ পার্লামেণ্টে দলীয় কার্যনির্বাহে সহায়তা করে।

রক্ষণশীল দল (Conservative Party)

জাতির রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে কায়েম রাখিবার উদ্দেশ্যে জমিদার, শিল্পপতি, মহাজন, ধর্মযাজক, ব্যাংক মালিক প্রভৃতির সমন্বয়ে রক্ষণশীল

দল গড়িয়া উঠিয়াছে। টোরী দল রূপান্তরিত হইয়া রক্ষণশীল দলে পরিণত হইয়াছে। রক্ষণশীল দল সমাজব্যবস্থায় বা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন বড় রকমের পরিবর্তন চান না। চার্চ ও রাজশক্তির অন্যতম উপাসক ও সমর্থক হিসাবে অতীতে এই দলের সূত্রপাত ঘটে। বর্তমানে রক্ষণশীল দলের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দুই শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। দক্ষিণপন্থিগণ চরমভাবে অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চান। বর্তমানে অনেকে মনে করেন শ্রমিক সমাজের আস্থাভাজন না হওয়া পর্যন্ত রক্ষণশীল দলের উপযোগিতা প্রকাশ করা যাইবে না। লর্ড র‍্যানডলফ, চার্চিল, বাটলার প্রমুখ দলীয় নেতাগণ এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ সালে শ্রমিক সম্পর্কিত ব্যাপারে এক দলিল প্রকাশিত হয় ও ১৯৫১ সাল হইতে সমাজতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র-গঠনের দিকে রক্ষণশীল দলের ঝোঁক দেখা দিয়াছে।

রক্ষণশীল দল ও ইউনিয়নিস্ট সমিতির জাতীয় সংঘ (The National Union of Conservative and Unionist Association) বলিয়া রক্ষণশীল দলের জাতীয় প্রতিষ্ঠান পরিচিত। রক্ষণশীল দল দাবী করে যে শ্রমিক দল অপেক্ষা তাহাদের সংগঠনগত পরিচালনা ব্যবস্থা অধিকতর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই দাবীর স্বপক্ষে বলা হয় যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগ পায় ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা কম প্রভাবিত হয়। এতদ্ব্যতীত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে প্রতিনিধিগণ নির্ভীকভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের স্বাধীনতা লাভ করে। জনসংখ্যা ও এলাকার পরিমাপ নির্বিশেষে প্রতিটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। দলের জাতীয় সংস্থায় একটি কার্যকরী সমিতি ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল বিদ্যমান। কাউন্সিল বৎসরে দুইবার অধিবেশন আহ্বান করে এবং কার্যকরী সমিতির বিবরণ পর্যালোচনা করিয়া দেখে। দলের নেতা যাহাতে দলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন ও সকল দলীয় বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকেন সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া জাতীয় কাউন্সিল ও কার্যকরী সমিতির প্রধান লক্ষ্য। শ্রমিক দলে জাতীয় সংস্থার

প্রকাশ্য অধিবেশনে গৃহীত নীতি অনুসরণ করাই দলের নেতার অন্যতম কার্য বলিয়া বিবেচিত হয় কিন্তু রক্ষণশীল দলের নেতার প্রাধান্য এতই অধিক যে তিনিই দলীয় নীতি নির্ধারণ করেন ও দলের সর্বময় কর্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। রক্ষণশীল দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবে৷ (Abbey) হাউস হইতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য পর্যবেক্ষণ, প্রার্থী মনোনয়ন, অর্থসংগ্রহ, প্রচারকার্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। পার্লামেন্টে নির্বাচিত সদস্যগণ পৃথকভাবে পার্লামেন্টে দলীয় নেতার নির্বাচন করেন। শ্রমিক দলের পার্লামেন্টারী নেতার ন্যায় প্রতি বৎসর রক্ষণশীল দলের পার্লামেন্টারী নেতার নির্বাচন হয় না। পার্লামেন্টারী নেতাই পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে দলীয় নীতি নির্ধারণ করিবার প্রাধিকার অর্জন করেন। ১৯৪৫ সালে রক্ষণশীল দলের কর্মসূচী "চার্চিলের ঘোষিত নীতি" রূপে আখ্যায়িত হইয়াছিল ("Churchill's Declaration of Policy to the Electors")। ১৮৮৬ সাল হইতে রক্ষণশীল দল আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির (Regional Organisations) উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছে। সমগ্র দেশটিকে স্কটল্যাণ্ড ও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড ব্যতিরেকে ১২টি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রতিটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানে ২০ হইতে ৩০ জনকে লইয়া একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং একজন নির্বাচিত আঞ্চলিক সভাপতির নেতৃত্বে আঞ্চলিক কমিটিগুলি কাজ করে।

উদারনৈতিক দল (Liberal Party)

অতীতে উদারনৈতিক দল ব্রিটিশ রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে দলের সমর্থকগণ বিভিন্ন এলাকায় বিস্তৃত হইয়া পড়ায় ইহার সংগঠন শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং দল হিসাবে ইহার গুরুত্ব সীমিতরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। পার্লামেন্টে উদারনৈতিক দলটি সাধারণতঃ রক্ষণশীল দলের সদস্যদিগের সমর্থন জানায়। অবাধ বাণিজ্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সমর্থক হিসাবে উদারনৈতিক দল প্রকাশ পায়। বর্তমানে আপন স্বার্থরক্ষার জন্য

উদারনৈতিক দল সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional representation) সমর্থন করে। উপযুক্ত কার্যসূচীর অভাবও দলকে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছে।

উপসংহারে পুনরায় স্বীকার করিতে হইবে ব্রিটেনে দায়িত্বশীল সরকারের অবস্থান দলীয় ব্যবস্থার উপর সবিশেষ নির্ভর করে। "Parties are inevitable. No free country has been without them. No one has shown how representative government could be worked without them." ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা হেতু দলীয় ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন আছে একথা ব্রাইস বলিয়াছেন। ইংলণ্ডের দলীয় ব্যবস্থায় দুইটি প্রধান দলের অবস্থান দেখা যায়। লাস্কি দুই দলীয় ব্যবস্থার উগ্র সমর্থক ছিলেন। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচক মণ্ডলী সরাসরি সরকার নির্বাচনে সক্ষম হয়। লাস্কি বলেন, "If we assume that parties seek for power, that they may translate into action the principles they profess the more direct and decisive choice of the electorate and of the legislature is likely to be performed."

ক্যাবিনেট প্রথায় শাসনের জন্য দ্বিদলীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কমন্স সভার অধিকাংশ সভ্য মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব স্বীকার না করিলে পার্লামেন্টারী প্রথায় সরকার পরিচালনা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার পক্ষে অধিকাংশের সমর্থন লাভ সহজ হয়। বহু দলের সদস্য আইনসভায় থাকিলে ঐক্যবদ্ধভাবে দলের সদস্যদের সমর্থন লাভ করা সম্ভব হয় না। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি লাভ করে। এই ব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যগণের পক্ষে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করা অধিকতর সহজ হয়। এতদ্ব্যতীত এই ব্যবস্থায় বিরোধী দলের সংগঠন শক্তি নৈপুণ্য লাভের সুযোগ লাভ করে। সুসংগঠিত বিরোধী দলের আনুকূল্যে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় এবং সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়। ক্ষমতায় আসীন দলের পতনের সাথে সাথে বিরোধী দল সরকার গঠন করিতে সক্ষম হয়।

অবশ্য দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বিপক্ষেও অনেকে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, এই ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মত স্পষ্টরূপে

প্রকাশ পায় না। জনসংখ্যা পরিমিত ও স্বল্প থাকিলে দুই দলীয় ব্যবস্থা কার্যকর হইতে পারে কিন্তু জনসংখ্যা অধিক হইলে ইহার কার্যকারিতা বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে। ফেরী (Ferry) দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলিয়াছিলেন, "To keep united the only way is to stand disunited." এই ব্যবস্থার ফলে ক্ষমতায় আসীন দলটি দলীয় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে। দলীয় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বর্তমানে ইংলণ্ডে কমন্স সভা ক্যাবিনেট নিয়ন্ত্রণ না করিয়া, ক্যাবিনেটই কমন্স সভাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

একাদশ অধ্যায়

পার্লামেণ্ট

[পার্লামেণ্টারী প্রথার উদ্ভব—ব্রিটেনে পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব—কমন্স সভা ও লর্ডস সভা]

শাসন-ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা

ফ্রান্স রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্রের দ্রুত, সহসা অতর্কিত বৈপ্লবিক ধারায় রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হইয়াছে কিন্তু ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য স্বরূপ তাহার ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। ইহার অন্যতম কারণ ব্রিটেনের পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা।

উইটান কাউন্সিল ও পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার বিবর্তন

এ্যাংলো স্যাক্সন যুগের উইটান (Witan) কাউন্সিল হইতে পার্লামেণ্টারী প্রথার উদ্ভব হয় বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। নর্মান বিজয়ের পর উইটান কাউন্সিলের পর ম্যাগনাম কনসিলিয়ামের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ সময় আর্কবিশপ, বিশপ, আর্ল, নাইট প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ নর্মান বিজেতাদিগের এই কনসিলিয়ামের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। রাজাকে উপদেশ দানের জন্য কুরিয়া রেজিস নামক একটি ক্ষুদ্রাকৃতি কাউন্সিলের অবস্থানের কথা শুনা যায়। ক্রমে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কুরিয়া রেজিস্ স্থায়ী কাউন্সিলে রূপান্তরিত হয় এবং উক্ত কাউন্সিলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি প্রিভি কাউন্সিল গড়িয়া উঠে।

সাইমন

অর্থ আদায় ও নূতন কর স্থাপনের জন্য জনমতকে প্রভাবিত করিতে রাজা আঞ্চলিক নাইটগণকে আহ্বান করিতেন ও তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতেন। ১২১৩ সালে রাজা জন্, ১২৫৪ সালে রাজা তৃতীয় হেনরী প্রতি কাউন্টি হইতে যথাক্রমে চারিজন ও দুইজন করিয়া নাইটকে আহ্বান করেন। ১২৬৫ সালে সাইমন ডি মণ্টফোর্ড (Simon De Montford) রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার পর নাইটদিগের সহায়তায় এক পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন। এই প্রচেষ্টা

সাময়িক সাফল্য লাভ করিলে এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ও পরবর্তী কালে প্রথম এডওয়ার্ড ১২৯৫ সালে আদর্শ পার্লামেণ্ট স্থাপন করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে পার্লামেণ্ট দুইটি পরিষদে বিভক্ত হয়। ইহার পর পার্লামেণ্ট কিছু কিছু আইনবিভাগীয় ক্ষমতা লাভ করে। ষষ্ঠ হেনরীর আমলে পার্লামেণ্টে উপস্থিত কমন্স, লর্ড স্পিরিচুয়াল প্রমুখের সম্মতিতে রাজা কর্তৃক পার্লামেণ্টবিধি বিধিবদ্ধ হইবে বলিয়া স্থির হয়। সপ্তম হেনরীর কালে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইলেও রোমান ক্যাথলিক ও অষ্টম হেনরীর সংঘাতকালে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি লাভ করে। ১৫২৯ ও ৫৩৬ সালে আহূত রিফর্মেসন পার্লামেণ্টের রাজনৈতিক গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ইহার পর প্রথম জেমসের আমলে পার্লামেণ্টের সহিত রাজার বিরোধ উপস্থিত হয়। ঐশ্বরিক মতবাদে বিশ্বাসী জেম্‌স্ পার্লামেণ্টের ক্ষমতা বা অধিকার স্বীকার করিতে প্রস্তুত না থাকায় পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৬১১ হইতে ১৬২১ পর্যন্ত প্রায় পার্লামেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকেই প্রথম জেম্‌স রাজকার্য পরিচালনা করেন। প্রথম চার্লস পর পর দুইবার পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত করেন ও পরে ভাঙ্গিয়া দেন। ১৬২৮ সালে পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহূত হইলে অধিকারের আবেদন (Petition of Right) রচনা করা হয়। ইহার পর প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ দেখা দেয় এবং ১৬৪৯ খ্রীঃ রাজাকে হত্যা করা হয়। ১৬৫৩ খ্রীঃ ক্রমওয়েল পার্লামেণ্টেরিয়ানদের পক্ষ হইতে লর্ড প্রোটেক্টর রূপে নিয়োজিত হন। কিন্তু পরে ক্রমওয়েলের সঙ্গেও পার্লামেণ্টের বিরোধ উপস্থিত হয় ও দ্বিতীয় চার্লস পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজত্বকালে পুনরায় পার্লামেণ্টের সহিত রাজার বিরোধের ফলে গৌরবময় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল দ্বারা এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা সম্ভব হয়। পার্লামেণ্টের আইনগত ক্ষমতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় ও ১৭০১ সালে পার্লামেণ্টের ক্ষমতাকে রাজা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন। হেনোভারিয়ান রাজা প্রথম ও দ্বিতীয় জর্জের আমলে প্রায় নাটকীয় ধারায় রাজশক্তি হ্রাস পাইতে থাকে ও ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত ঘটে। স্যার রবার্ট ওয়ালপোল প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করেন।

পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব

ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি হইল পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব। আইনগত ভাবে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট সর্বময় অধিকর্তা। যে কোন বিষয়ে যে কোন আইন পার্লামেণ্ট প্রণয়ন করিতে পারেন। পার্লামেণ্ট ব্যতীত আইনসম্মত অপর কোন উচ্চ প্রতিষ্ঠান নাই যাহা পার্লামেণ্টের সম্মতি ভিন্ন রাষ্ট্রের কোন আইন চালু করিতে পারে। ডি. লোমী (De Lolme) বলেন যে, পার্লামেণ্টের ক্ষমতা এতই অধিক যে স্ত্রীকে পুরুষ ও পুরুষকে স্ত্রীতে রূপান্তরিত করা ভিন্ন পার্লামেণ্ট অপর সকল কার্যই করিতে সক্ষম। ব্রিটিশ সংবিধানে, ডাইসীর মতে, সাধারণ আইন ও সাংবিধানিক আইনের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। ডাইসী ইত্যাদি নানা রাষ্ট্রনীতিবিদগণ পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহাদের ব্যাখ্যায় পার্লামেণ্টের আইনগত অস্তিত্বই চিত্রিত হইয়াছে। বাস্তবক্ষেত্রে ও কার্যক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের সত্যই সর্বময় কর্তৃত্ব আছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিবার কথা।

কমন্স সভা লর্ডস সভা ও রাজা

মনে রাখা বিধেয় যে রাজা, কমন্স সভা ও লর্ডস সভা এই তিনটির সমন্বয়ে পার্লামেণ্ট গঠিত হয়। ইহার একেকে বাদ দিয়া পার্লামেণ্টের সম্পূর্ণতা রক্ষা করা যায় না। ১৯১১ সালের পার্লামেণ্টে আইন প্রণীত হইবার পর লর্ডস সভার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইলেও কমন্স সভার ক্ষমতা প্রভূত বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। কমন্স সভার ক্ষমতা বাস্তবে কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সভ্যদের উপর বর্তায় ও শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ক্যাবিনেট সভাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়।

জনমত

নীতি বা প্রথার দ্বারা পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সংকুচিত করা যায় না। কিন্তু জনমতের চাপে পড়িয়া, সচরাচর পার্লামেণ্ট নীতিবর্জিত বা প্রথাবিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করিতে প্রয়াসী হয় না।

ঐতিহ্য

এতদ্ব্যতীত ঐতিহ্যমণ্ডিত এমন কতকগুলি ঐতিহাসিক আইন আছে যাহার সংশোধন বা পরিবর্তন করা পার্লামেণ্টের পক্ষে অসম্ভব। যথা ১৭৭৬ সালের উপনিবেশের উপর কর স্থাপন সংক্রান্ত আইন সংশোধন করিতে পার্লামেণ্ট কখনই সচেষ্ট

হইবে না। আইনগত ভাবে পার্লামেণ্ট ডোমিনিয়নগুলির ব্যাপারে আইন প্রণয়নে সক্ষম হইলেও বাস্তবে এরূপ প্রয়াস যথেষ্ট পরিমাণে সংকুচিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কোন আইন ডোমিনিয়নগুলিতে প্রযোজ্য হইবে না।

আন্তর্জাতিক আইন

আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা পার্লামেণ্টের ক্ষমতাব একক্রিয়ার সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। পার্লামেণ্ট আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ উপেক্ষা করিতে পারেন না।

বিচারকগণের মুখনিঃসৃত আইন, নবগঠিত শাসনতান্ত্রিক আইন ও অর্পিত ক্ষমতার বলে প্রণীত আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব কিয়ৎ পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে।

টেমস নদীর ধারে ওয়েস্টমিনস্টারে উপযুক্ত পরিবেশ ও ব্যবস্থার মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট অবস্থিত। সাধারণ নির্বাচনের পর পার্লামেণ্টের অধিবেশন শুরু হয় এবং বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় মাস অধিবেশন চলে। রুতহারে সদা প্রস্তুত পার্লামেণ্টে অধিবেশন আহ্বান করা হয়। যে কোন পরিষদ যে কোন মুহূর্তে স্বীয় অধিবেশন স্থগিত রাখিতে সক্ষম। একই সময় দুই পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হয়। রাজা প্রথম অধিবেশনের সময় বক্তৃতা করেন।

কমন্স সভা (House of Commons)

জনগণ-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কমন্স সভা গঠিত। সকল দল ও মতের জনগণের প্রতিনিধিগণ এই সভায় মিলিত হন। এক কথায়

জনপ্রতিনিধিগণের সভারূপে কমন্স সভা

যথার্থ প্রতিনিধিমূলক পরিষদরূপে কমন্স সভা পরিচিত হইতে পারে। কমন্স সভার সদস্যদিগের অধিকাংশ শিক্ষিত ও বিভিন্ন জীবিকার সহিত যুক্ত। আইনজীবি, কোম্পানী পরিচালক, ব্যবসায়ী, প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্য হইতে কমন্স সভার সদস্য নির্বাচিত হয়। শ্রমিক দলের গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কায়িক পরিশ্রমে নিযুক্ত শ্রমিকগণও কমন্স সভায় প্রতিনিধির আসন অলংকৃত করিবার সুযোগ পাইতেছেন। ফলে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধিদিগের মধ্যে বর্তমানে চিন্তাগত বৈষম্য ব্যতীত শ্রেণীগত বৈষম্যও দেখা দিতেছে।

ব্রিটেনকে কয়েকটি পার্লামেণ্টারী এলাকায় বিভক্ত করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক এলাকা হইতে জনসাধারণ দ্বারা একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। বর্তমানে কমন্স সভার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৬৩০ জন। তন্মধ্যে ইংলণ্ড হইতে ৫০৬ জন সদস্য নির্বাচিত হন এবং অন্যান্য সদস্য ওয়েলস্, স্কটল্যাণ্ড ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড হইতে নির্বাচিত হন। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যাপারে কাউণ্টি ও বারোগুলির মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় নাই। কাউণ্টি ও বারো সম্মিলিতভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করিত। পরে একজন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনী এলাকা গঠন করা হয়। ১৯৪৮ সালের জনপ্রতিনিধি আইনের দ্বারা (Representation of the People Act) এই ব্যবস্থা আরো সুদৃঢ়রূপে কায়েম করা হয়। একুশ বৎসরের প্রত্যেক ব্রিটিশ প্রজার নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অধিকার আছে। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালিত হয় না, ফলে বিভিন্ন দল নির্বাচকদিগের সমর্থনের সমানুপাতে কমন্স সভায় আসন লাভ করে নাই। উদারনৈতিক দল এইভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পার্লামেণ্টের সদস্য-দিগের নিজ নিজ এলাকার নির্বাচকমণ্ডলীর সহিত অন্তরঙ্গ যোগাযোগ স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সাধারণ নির্বাচনের ব্যয়ভার বহন করিতে অপারগ হইয়া অনেক উপযুক্ত ব্যক্তি কমন্স সভায় আসন সংগ্রহের আশা পরিত্যাগ করেন। সরকারী কর্মচারিবৃন্দ কর্তব্যে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। এই সকল কারণে বহু নাগরিক সক্রিয়ভাবে সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে অপারগ হন। নানাশ্রেণীর জনসমাজ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব হয় বলিয়া কমন্স সভাটি সাধারণ সমাজের এক উপযুক্ত প্রতিফলন স্বরূপ হইয়া পড়ে। নির্বাচনী মহরতে বিশেষ আতিশয্য পরিলক্ষিত হয় না। সভা সমিতি, সংবাদপত্র, বেতার, পল্লীতে পল্লীতে প্রার্থীর সমর্থক ও অনুগামীদিগের প্রচার কার্য দ্বারা নির্বাচনের প্রস্তুতি সংগঠিত হয়। ভাড়া করা সমর্থক পোষণ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ। গোপন ব্যালট প্রথায় নির্বাচন পরিচালিত হয়।

পার্লামেণ্টারী এলাকা ও কমন্স সভার সংগঠন

সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম সভার অধিবেশন যেদিন আহ্বান করা

হয় সেইদিন কমন্স সভার সদস্যগণ তাঁহাদের নিজ কক্ষে মিলিত হন।

সদস্যগণের অনেকেই অনুপস্থিত থাকেন

সদস্যদিগের কক্ষে ৪৫০ জনের বসিবার উপযোগী স্থান আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় সকল সদস্য অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন না এবং অনেকেই অনুপস্থিত থাকেন। নবনির্বাচিত সদস্যদিগের প্রাথমিক দায়িত্ব থাকে স্পীকার নির্বাচন। অতীতের প্রথামত লর্ড চ্যান্সেলর রাজার নামে নির্দেশ দিবার পর স্পীকার নির্বাচন করা হয়। ইহার পর রাজা বা রাণী সদস্যদিগের সমীপে উপস্থিত হইয়া বা তাঁর প্রতিনিধির সাহায্যে বক্তৃতা করেন (Speech from the throne)। বক্তৃতা সচরাচর দীর্ঘ হয় না, এবং পূর্বাহ্ণে বক্তৃতার সারমর্ম প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা শ্রবণের পর কমন্স সভার সদস্যগণ আপন কক্ষে প্রত্যাবর্তন করেন ও রাজকীয় বক্তৃতাটি পুনরায় স্পীকারের নিকট হইতে শ্রবণ করেন। এই অনুষ্ঠানের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে, কমন্স সভা স্বাধীনভাবে রাজার বক্তৃতার পূর্বেই সভার কাজ চালাইতে পারে এইরূপ নজীর স্থাপনের জন্য একটি নামমাত্র বিলের প্রথম পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পর রাজার বক্তৃতার উত্তর দানের পালা। উত্তরদান প্রসঙ্গে রাজকীয় বক্তৃতার উপর বিতর্ক ও সমালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতার উত্তর প্রতিবারই একই ধরণের হইয়া থাকে। প্রতিবার রাজাকে ধন্যবাদ ও আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়। বিরোধী দল ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাবে সংশোধন করিবার প্রয়াস পায়। বৈকালে প্রায় তিন ঘটিকায় প্রায় প্রতি সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার কমন্স সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঘরোয়া বৈঠক হিসাবে শুক্রবার কমন্স সভার অধিবেশন সকাল ১১টা নাগাদ শুরু হয়। মাত্র ৪০ জন সদস্য দ্বারা কোরাম পূর্ণ হয়। সদস্যগণ প্রায়ই অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন এবং কমন্স সভার কার্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন না। কমন্স সভার কার্য পদ্ধতি বা রীতিনীতি সংক্রান্ত কোন পুস্তক নাই, তাই পার্লামেণ্টের সকল খুঁটিনাটি বিষয় আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত সদস্যদিগের বহুদিনের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়।

প্রশ্নোত্তরের জন্য অধিবেশনের একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত থাকে, সদস্যগণ ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ দপ্তর সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করিতে

পারেন। একটি অধিবেশনে একজন সদস্য চারিটির বেশী প্রশ্ন করিতে সক্ষম হন না। সংবাদ সংগ্রহের মনোভাব লইয়া, প্রশ্ন করা হয়, অতএব প্রশ্নের মধ্যে ব্যঙ্গ বা কটাক্ষপাতের বিশেষ অবকাশ দেওয়া হয় নাই। প্রত্যেক সদস্য প্রশ্ন করিবার এই অধিকার সসম্মানে সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রিগণ যে বক্তব্য রাখেন তাহার উপর বিতর্কের কোন অবকাশ ব্রিটেনে দেওয়া হয় নাই।

প্রশ্নোত্তর

বিল আনয়নের সময় বা আইন প্রণয়নকালে বিতর্কের বহু অবকাশ পাওয়া যায়। আইন প্রণয়নের প্রতি স্তরে সদস্যগণ বিতর্ক করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিতর্ককালে কতকগুলি রীতি-নীতি ও সৌজন্যমূলক ব্যবস্থা মানিয়া চলা হয়। সদস্যগণ পরস্পরের নাম ধরিয়া সম্বোধন করেন না। 'মাননীয় সদস্য' বলিয়া সম্বোধন করিবার রীতি প্রচলিত আছে। নূতন সদস্য তাহার প্রথম বক্তৃতা দানের পূর্বে সদস্যদিগের ধৈর্যধারণের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানান এবং পরবর্তী বক্তা যিনি স্বভাবতঃ বিরোধী দলের অন্তর্ভুক্ত উক্ত নব সদস্যটিকে নিয়মমত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাহার বক্তৃতা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন। ভোট গ্রহণের সময়ও কমন্স সভায় কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। স্পীকারের মনে গণনা সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হইলে বা সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যবৃন্দ দাবী জানাইলে স্পীকার ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা লবী মহলের ও কক্ষস্থিত পুলিশগণকে আহ্বান জানান ও পুলিশবাহিনী "ডিভিসন" বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে। দুই মিনিট পর পুনরায় বিতর্কমূলক প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়। সমর্থক ও বিরোধী দলের সদস্যগণ পৃথক হইয়া পড়ে ও কণ্ঠধ্বনি সহযোগে (Voice vote) সমর্থন বা বিরোধিতা প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ লবী অভিমুখে চলিয়া যায়। ইহার পর অর্গলবদ্ধ কক্ষে স্পীকারের নির্দেশে ভোট গণনা শুরু হয়। কমন্স সভার আনুষ্ঠানিক কার্যাদি ও সৌজন্যমূলক আচরণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট।

বিল আনয়ন ব্যবস্থা ও বিতর্ক

পার্লামেণ্টারী প্রথার উৎকর্ষ দলীয় হুইপগণের উপর সবিশেষ নির্ভরশীল। দলের সদস্যদিগের সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও তাঁহাদের নানা বিষয়ে ওয়াকিবহাল রাখা হুইপগণের অন্যতম কর্তব্য।

দলীয় হুইপ

কমন্স সভার অধিক সংখ্যক সদস্য অধিবেশনে যোগদান হইতে বিরত থাকায় সভার প্রকৃতি ও আকৃতি পরিবর্তিত হয়। ছোট সভায় বাগ্মিতার বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি করা যায় না। সহজ, মামুলী কথোপকথনের ভঙ্গীতে কমন্স সভার নিজস্ব বিশিষ্টতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সভায় আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস মধ্যে মধ্যে সৃষ্ট হয়। হাল্কা বাক্যসর্বস্ব বক্তৃতা অপেক্ষা সারগর্ভ বক্তৃতার সমাদর বেশী হয়। বস্তুতঃ পরিবেশ ও সভার মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সকল সদস্যই সচেষ্ট থাকেন।

জনশিক্ষার কেন্দ্র

কমন্স সভা জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার একটি অন্যতম বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সভার অভ্যন্তরে নানাবিধ বিষয়ে যে জ্ঞানগর্ভ মননশীল সমঝদার আলোচনা হয়, তাহাতে বহু নাগরিকের কল্পনাবৃত্তি ও রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়। চার্চিল বলিয়াছেন, "The House of Commons is much more than a machine, it has earned and captured and held through long generations the imagination and respect of the British nation."

মন্ত্রিসভা ও কমন্স সভা

কমন্স সভাই মন্ত্রিসভার গঠন, পতন বা নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী থাকে। প্রধানমন্ত্রী সহ অধিকাংশ মন্ত্রীই কমন্স সভার সদস্য। কমন্স সভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভে সক্ষম বলিয়াই মন্ত্রিসভার পক্ষে কার্য পরিচালনা করা সম্ভব। কমন্স সভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে বা পুনরায় নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে হইবে। কমন্স সভা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে "it lives in a state of perpetual potential choice, at any moment it can choose a ruler and dismiss a ruler"। অবশ্য বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে কমন্স সভা এই ক্ষমতা উপভোগ করেন না। দলীয় প্রথার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যগণই প্রকৃত ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার নিয়ামক হিসাবে উপস্থিত হইয়াছেন। দলীয় নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার জন্য সাধারণ সদস্যগণ প্রায়শঃই বিনা দ্বিধায় দলীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশ মানিয়া যান ও সেইমত কার্য করেন। দলীয় প্রথার সম্প্রসারণের জন্য ক্যাবিনেট

একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। র‍্যামসে মুইর যথার্থই বলিয়াছেন, "Today it is not the House of Commons which controls the Cabinet but Cabinet which controls the House."

কমন্স সভার অধিবেশনগুলি বিরোধী দলকে মন্ত্রিপরিষদের কার্যাদির সমালোচনা করিবার সুযোগ দান করে। কমন্স সভায় বিরূপ মন্তব্য হইতে পারে এই আশংকায় মন্ত্রিগণ যথোপযুক্ত সতর্কতার সহিত দায়িত্বপূর্ণভাবে নিজ নিজ বিভাগীয় কার্য সম্পাদনে সচেষ্ট থাকেন।

বিরোধী দল

মুলতুবী প্রস্তাব বা প্রশ্ন উত্থাপনপূর্বক স্থায়ী বেসামরিক সরকারী কর্মচারিবৃন্দের নানাবিধ কার্যের জন্য বিভাগীয় মন্ত্রিগণকে বাধ্য করা যাইতে পারে। এইজন্য বেসামরিক কর্মচারিগণ যথেষ্ট সাবধানতার সহিত নিজ কর্মসূচী অনুসরণ করেন। মুলতুবী প্রস্তাবের উপর বিতর্কের সাহায্যে নাগরিকের পৌর স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়াস অনুভব করা যায়। অবশ্য মন্ত্রিগণ ও তাঁহাদের সহকারিবৃন্দ সরকারী নথীপত্র লইয়া সদাই প্রস্তুত থাকেন বলিয়া বিরোধী দলকে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণভাবে প্রশ্ন বা মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হয়। সাধারণতঃ পৌর অধিকার সংরক্ষণ বা গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ অথবা মন্ত্রিসভার ক্ষমতার অপপ্রয়োগ রোধ করিবার জন্য মুলতুবী প্রস্তাব পেশ করা হয়।

মুলতুবী প্রস্তাব

কমন্স সভার অন্যতম কার্য আইন প্রণয়ন করা। অতীতে আইন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে কমন্স সভার গুরুত্ব সর্বাধিক ছিল কিন্তু বর্তমানে দলীয় প্রথায় কমন্স সভার কার্য বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে। কি আইন প্রণয়ন করা হইবে, কিভাবে কখন তাহা পেশ করা হইবে এই সকল বিষয় ক্ষমতায় আসীন দলটিই চিন্তা করে। দলের নির্দেশে সম্মতি প্রদান করাই কমন্স সভার বর্তমান কার্য।

আইন প্রণয়ন

কমন্স সভার বিতর্কে সময় সময় নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ণীত থাকে। সাধারণতঃ সদস্যগণ বিতর্কে স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে আলোচনা করিবার

সুযোগ লাভ করে। কিন্তু দীর্ঘসূত্রতা ও অহেতুক উচ্ছ্বাস বর্জন হেতু বক্তৃতার ধারাকে সময় সময় নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে ক্লোসার ও গিলোটীন ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্লোসার ব্যবস্থায় যে কোন সদস্য বিতর্কের মাঝে পূর্বে উত্থিত প্রশ্ন পুনরায় পেশ করিতে পারেন ও স্পীকার সম্মতি প্রকাশ করিলে ঐ প্রশ্ন লইয়া ভোট গণনা হইতে পারে। কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সর্বাগ্রে আলোচনা হইবার জন্য গিলোটীন ব্যবস্থায় কিছু সময় নির্ধারিত হইতে পারে।

ক্লোসার ও গিলোটীন

কমন্স সভা, কতকগুলি পার্লামেণ্টারী সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া থাকেন। কমন্স সভা সভার কার্যাদি পরিচালনার জন্য রীতিনীতি নির্ধারণে সক্ষম। আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিবারও সম্পূর্ণ সুযোগ কমন্স সভায় বিদ্যমান। সুযোগের অপব্যবহারের জন্য শাস্তি প্রদান বা বিচারকার্য পরিচালনার অধিকার কমন্স সভা উপভোগ করে। এতদ্ব্যতীত অর্থ সংক্রান্ত বিল প্রথম উত্থাপন বা পেশ করিবার অধিকার কমন্স সভাকে দেওয়া হইয়াছে। কমন্স সভার সদস্যগণের অধিবেশনেব আলোচনায় বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার, সভার কোন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে প্রতিবাদ জানাইবার ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে। কমন্স সভার অধিবেশন কালে কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা যাইবে না এবং জুরী কার্যাদি হইতে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সাধারণভাবে সভার চারি দেওয়ালের মধ্যে অনুষ্ঠিত সদস্যদিগের সকল কার্যের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব কমন্স সভার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। শাস্তিস্বরূপ, সভা, অধিবেশনের শেষ পর্যন্ত যে কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখিতে পারে বা বহিষ্কার করিতে সক্ষম। সম্পূর্ণ বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করিলেও সদস্যগণকে কমন্স সভার প্রচলিত রীতিনীতি ও স্পীকারের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়। সভার কার্যের বিবরণ প্রকাশ করিবার নির্দেশ দিবার একমাত্র অধিকারী সভা স্বয়ং। অবশ্য সভার বিনা অনুমতিতে সঠিক বা সত্য সংবাদ পরিবেশন করা যাইতে পারে।

পার্লামেণ্টারী সুবিধা (Privileges)

লর্ড সভা (House of Lords)

পূর্বে বলা হইয়াছে, তুইটি পরিষদের সমন্বয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট গঠিত। লর্ড সভা পৃথিবীর সর্বপুরাতন উচ্চ পরিষদ। দ্বিপরিষদীয় পার্লামেণ্টের সমর্থনে জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, "The same reason which induced the Romans to have two consuls makes it desirable that there should be two chambers; that neither of them may be exposed to corrupting influence of undivided power, even for the space of a single year."

পুরাতন উচ্চ পরিষদ

বর্তমানে কিঞ্চিদধিক ৮০০ সদস্য লইয়া লর্ড সভা গঠিত। অধিকাংশ সদস্যই জন্মসূত্রে সভায় আসন গ্রহণের অধিকারী। রাজ পরিবারের যুবরাজ, উত্তরাধিকারসূত্রে পিয়ার (Peer)-গণ, স্কটল্যাণ্ডের ও আয়ারল্যাণ্ডের প্রতিনিধিমূলক পিয়ার; লর্ডস অব এপিল ও লর্ডস স্পিরিটুয়ালের সমন্বয়ে লর্ডস সভা গঠিত হয়। গ্রেট ব্রিটেনের পিয়ারগণের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ লক্ষ্য করা যায়, যথা—ডিউক, মারকুইস, আর্ল, ভাইকাউণ্ট ও ব্যারণগণ। এতদ্ব্যতীত বিশপ ও আর্কবিশপগণের জন্যও আসন সংরক্ষিত থাকে। লর্ড সভার সদস্যপদ হইতে সাধারণতঃ কেহ পদত্যাগ করিতে পারেন না। জন্মগত সূত্রে ও বংশানুক্রমে সভার সদস্যপদ সকল লর্ডের বংশধরগণের উপর বর্তায়। বস্তুতঃ ঘটনাক্রমে আটশত সদস্যের সকলেই নিজ নিজ আসনে আসীন হইয়াছেন, এই সভার সদস্যগণ জনমতের চাপে বা আইনগত বা শাসনগত উপযোগিতার দরুণ অথবা ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্য সদস্যপদে বহাল থাকেন না। এই সভা রক্ষণশীল দলের বিশেষ সমর্থন লাভ করে। লর্ড সভার গঠন প্রণালী অনুধাবন করিলে স্বতঃই মনে হইবে রাজকীয়, জমিদার বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট এই সভার অধিকাংশ সদস্য বিত্তবান ও সুবিধাবাদীর মুখপাত্র হিসাবে বিরাজ করিবে।

সদস্য সংখ্যা

লর্ড সভার সদস্যগণ কতকগুলি অধিকার ভোগ করিতেন। ক্রমে এই অধিকারগুলির অধিকাংশ হইতে সদস্যগণ বঞ্চিত হইয়াছেন।

আইন সভার অধিবেশন আহূত হইবার ৪০ দিন পূর্বে ও পরে কোন লর্ডকে আটক করা যায় না। লর্ডদিগের কর্মচারিগণকেও অধিবেশনের ২০ দিন পূর্বে ও পরে আটক রাখা যায় না। সদস্যগণ অধিবেশনকালে সর্বপ্রকার বাক্‌স্বাধীনতা উপভোগ করেন। প্রত্যেক লর্ড পৃথকভাবে রাজা বা রাণীর সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারেন। অতীতে প্রতিনিধির মারফৎ সদস্যগণ ভোট গ্রহণে অংশ লইতে সক্ষম ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিশ্বাসঘাতকতার ন্যায় অপরাধের জন্য সহকর্মী লর্ডদিগের সাহায্যে অপরাধী লর্ডের বিচার চলিতে পারিত। অযোগ্য ব্যক্তিকে লর্ড সভা অপসারিত করিতে সক্ষম।

অতীতে লর্ড সভার সদস্যদিগের অধিকার

আয়ারল্যাণ্ডের লর্ডগণ ব্যতীত লর্ড সভার অন্য কোন সদস্য কমন্স সভার সদস্য হইতে পারেন না। লর্ড সভার সহিত সাধারণ নির্বাচনের কোন যোগসূত্র স্থাপিত হয় নাই। লর্ড সভার উত্থান বা পতনের সহিত ক্যাবিনেটের উত্থান বা পতন নির্ভর করে না। লর্ড সভা ক্যাবিনেটের সহিত একমত না হইলে ক্যাবিনেটের কিছু আসে যায় না। ওয়েস্টমিনস্টারে আপন কক্ষ মধ্যে লর্ড সভার অধিবেশন বসে। জাঁকজমকপূর্ণ এই কক্ষে পূর্ণ মর্যাদা ও গাম্ভীর্যের মধ্যে অধিবেশন চলিতে থাকে। উলস্যাক নামক আসনে আসীন হইয়া লর্ড চ্যান্সেলর এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। লর্ড চ্যান্সেলর সভাপতি হিসাবে প্রস্তাব পেশ করিবার অধিকারী হইলেও সভার নিয়ম-শৃংখলা অথবা রীতিনীতি প্রবর্তনে সক্ষম হন না। সাধারণতঃ প্রতি মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবারে লর্ড সভার অধিবেশন বসে। এক বা দুই ঘণ্টার অধিককাল ধরিয়া অধিবেশনের কার্য চলে না। সভার কার্য পরিচালনার জন্য তিনজন সদস্যের উপস্থিতিই যথেষ্ট, তিনজনে সভার কোরাম (Quorum) গঠন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আট শত সদস্যের অনেকেই সভায় উপস্থিত থাকেন না। আলোচনায় উৎসাহ বা গতি বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না যদিও প্রতি বক্তাই তাঁর বক্তব্যের স্বর উচ্চগ্রামে নিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পান। সভার কার্য পরিচালনা সম্পর্কিত রীতিনীতি বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসর হয়।

লর্ড সভার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

রাজাকে উপদেশ দান

অতীতে রাজাকে আইন বিষয়ে উপদেশ দানের একমাত্র অধিকার লর্ড সভা উপভোগ করিত। ১৯২২ সালের পর এই ব্যাপারে কমন্স সভার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়।

১৯১১ সালের পার্লামেণ্টারী আইন

১৯১১ সালের পার্লামেণ্টারী আইন দ্বারা লর্ড সভার আইন বিষয়ক ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে সংকুচিত করা হইয়াছে। সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত বিল সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিবার অধিকার পূর্বে লর্ড সভার ছিল। অর্থসংক্রান্ত বিল ব্যতীত অন্য যে কোন বিল লর্ড সভায় গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু চলিত রীতি-হিসাবে বাস্তবে খুব কম বিলই লর্ড সভায় প্রথম পেশ করা হয়। প্রায় সকল সরকারী বিলের প্রথম পাঠ কমন্স সভায় অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারী বিল লর্ড সভায় উত্থাপিত হয়। ১৯১১ সালে পার্লামেণ্টারী আইন দ্বারা লর্ড সভার অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পর পর তিনবার যদি কমন্স সভা বিল পাশ করে তাহা হইলে লর্ড সভার বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজার সম্মতিতে বিলটি আইনরূপে গৃহীত হইবে। অবশ্য সম্মতি দিবার অছিলায় লর্ড সভা কিছু সময়ের জন্য যে কোন বিল স্থগিত করিয়া দিতে পারে। ১৯০৯ সালে লয়েড জর্জ বাজেট সংক্রান্ত ব্যাপারে কমন্স সভার সহিত লর্ড সভার সংঘাত উপস্থিত হয়। লর্ড সভা নূতন কর স্থাপনে বিরোধিতা করে ও ঐ বিরোধিতার ফলে প্রধানমন্ত্রী অনন্যোপায় হইয়া নির্বাচক মণ্ডলীর নিকট ঐ প্রসঙ্গে রায় ভিক্ষা করেন। ইহার ফলে ১৯১০ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং উদারনৈতিক দলের সাফল্যের ফলে লর্ড সভা জনমতের চাপে তাঁহাদের বিরোধিতা প্রত্যাহার করেন।

অর্থসংক্রান্ত বিল

১৯১১ সালের পার্লামেণ্টারী আইন দ্বারা স্থির করা হয় যে কমন্স সভা কোন অর্থ-সংক্রান্ত বিল পাশ করিলে একমাসের মধ্যে লর্ড সভার অনুমোদন ব্যতিরেকেই উহা কার্যকর হইবে। কোন বিল অর্থ-বিষয়ক কিনা তাহা নির্ধারণ করিবে কমন্স সভা। আরও স্থির করা হয় যে ৭ বৎসরের পরিবর্তে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত পার্লামেণ্টের কার্যকাল বহাল থাকিবে।

১৯৪৫ সালে শ্রমিকদলের বিজয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে লর্ড সভার ক্ষমতা ও কাঠামো পরিবর্তিত হয়। ১৯৪৯ সালে একটি বিলের সাহায্যে লর্ড সভার ক্ষমতা আরও সংকুচিত করা হয়। ইহার পরেও লর্ড সভার ক্ষমতা ও গঠনপ্রণালী পরিবর্তিত ও সীমিত করিবার ধারাবাহিক প্রয়াস চলে, অবশ্য বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে যে সকল নিয়মাবলী প্রবর্তিত করা হয় তাহা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের অধিকার লর্ড সভার আছে। কমন্স সভায় গৃহীত সকল বিল সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিবার অধিকার লর্ড সভার আছে। অতীতে ক্যাবিনেটের সদস্য ছিলেন এমন ব্যক্তি অথবা কমন্স সভার বিশেষ অভিজ্ঞ সদস্য লর্ড সভায় উপস্থিত থাকেন বলিয়া বিভিন্ন বিষয়ের রাষ্ট্রনৈতিক ও কূটনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া লর্ড সভার পক্ষে মতামত গঠন ও পোষণ করা সম্ভব হয়। লর্ড সভা যে কোন বেসরকারী বিল প্রত্যাহার করিতে পারে।

শ্রমিক দলের বিজয়লাভ ও লর্ডসভা

আইন বিভাগীয় ক্ষমতা ব্যতিরেকে লর্ড সভা বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা উপভোগ করে,. লর্ড সভাকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হাইকোর্টরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে লর্ড সভা সুপ্রতিষ্ঠিত। কোর্টরূপে কার্য পরিচালনাকালে লর্ড চ্যান্সেলারসহ নয়জন আইনজ্ঞ লর্ড ও বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞ লর্ড উপস্থিত থাকেন। দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে লর্ড সভা সর্বোচ্চ আপীল আদালতের কার্য সম্পাদন করেন। লর্ডদিগের দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে বিরোধ উপস্থিত হইলে লর্ড সভা তাহার নিষ্পত্তি করে। এতদ্ব্যতীত কমন্স সভা কর্তৃক আনীত গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত সরকারী কর্মচারীর বিচার কার্য লর্ড সভা পরিচালনা করে।

বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা

বেসরকারী বিল সংক্রান্ত কমিটিগুলির বিচার বিভাগীয় কার্যাদি লর্ড সভা পরিচালনা করেন। আইরিশ্ প্রজাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলায় এবং স্কটিশ ও আইরিশ্ লর্ডদিগের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি সাধন লর্ড সভার এক্তিয়ারভুক্ত। সভার সদস্যদিগের অধিকারের অপপ্রয়োগ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার লর্ড সভাই করিয়া থাকেন।

উপযোগিতা—কমন্স সভায় অনুমোদিত বিলগুলির পুনর্বিচার ও পুনর্বিবেচনায় লর্ড সভা বিশেষ উপযোগিতা সৃষ্টি করে। সম্পূর্ণরূপে কোন বিল বর্তমানে লর্ড সভা প্রত্যাহারে অপারগ হইলেও অন্ততঃ এক বৎসরের জন্যও উহা স্থগিত রাখিতে পারে এবং এইভাবে সময় গ্রহণ করিয়া বিলের ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সকলকে ওয়াকিবহাল করিতে সক্ষম হয়। যথার্থই বলা হইয়াছে, "Time reveals defects, new points of view develop, grievances change, and people may want more or less drastic provisions." লর্ড সভা হইতে নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করা হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন নানাবিধ প্রশ্নের পর্যালোচনা লর্ড সভায় সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পক্ষে একই সময় বিভাগীয় শাসনকার্য পরিচালনা ও কমন্স সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই জন্য লর্ড সভার কয়েকজন সদস্যকে ক্যাবিনেট সভায় গ্রহণ করা হয়। লর্ড সভার সদস্যদিগের নির্বাচক মণ্ডলীর উপর নির্ভর করিতে হয় না। ফলে তাহাদের পক্ষে স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয়। সাধারণতঃ লর্ড চ্যান্সেলারকে পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইত। অনেক সময় অবিতর্কমূলক বিলের উত্থাপন ও বিচার বিবেচনা করিয়া লর্ড সভা কমন্স সভার সময় সংক্ষেপে সহায়তা করে। এতদ্ব্যতীত প্রখ্যাত ও অভিজ্ঞ মনীষীদের সমন্বয়ে গঠিত লর্ড সভা জ্ঞানগর্ভ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত করে।

লর্ড সভার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা:

লর্ড সভার বিরুদ্ধে যত বিরূপ সমালোচনা হইয়াছে এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা অপর কোন শাসনযন্ত্রের বা আইন বিভাগের বিরুদ্ধে হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। বলা হইয়াছে ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক কাঠামোর সহিত রক্ষণশীল লর্ড সভা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অপারগ, অতএব ইহার মূলচ্ছেদ দাবী করা হইয়াছে। ১৯০৭ সালে শ্রমিক দল লর্ড সভাকে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী এবং সর্বসাধারণের মঙ্গল ও সামগ্রিকভাবে জাতীয় প্রগতি ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রূপায়িত করিয়াছিলেন। ১৯১৮ সালের শ্রমিক দলের কর্মসূচীতে লর্ড সভার সমাপ্তি করিবার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বলা হইয়াছে, "The House of Lords should either be ended or mended"

লর্ড সভার অধিকাংশ সদস্য জন্মসূত্রে সভ্যপদ লাভ করিয়াছেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সহিত এই সকল সদস্যের পরিচয় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ সভাটি যথার্থ প্রতিনিধিমূলক হিসাবে প্রকাশ পাইতে অক্ষম হইয়াছে। সকল শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে লর্ড সভার প্রকাশ সম্ভব হয় নাই। প্রধানতঃ, অভিজাত, ধনিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে লর্ড সভার সদস্য সংগৃহীত হয়। বলা হইয়াছে, "The House of Lords represents nobody but itself and it enjoys the full confidence of its constituents."

লর্ড সভা রক্ষণশীল দলের আদর্শ ও স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ মনোযোগী। ফলে দলমতনির্বিশেষে সকলের মতামত পোষণ ও গঠন করিবার ক্ষেত্রে লর্ড সভা সাফল্য লাভে অসমর্থ হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত দুইটি পরিষদের অবস্থিতি অনেকে অপ্রয়োজনীয় ও যুক্তিহীন বলিয়া মনে করিয়াছেন। বলা হয়, "If the second chamber dissents from the first it is mischievous, if it agrees it is superfluous."

লর্ড সভায় সদস্যগণের অনেকেই অনুপস্থিত থাকেন এবং উপস্থিত মুষ্টিমেয় সদস্যগণ সভার কার্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন না, ফলে এই সভার উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ পোষণ করে।

দ্বাদশ অধ্যায়

স্পীকার

[কমন্স সভার সভাপতি রূপে স্পীকার—কার্য ও গুরুত্ব]

কমন্স সভায় স্পীকার পদটির উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণার অবকাশ থাকিলেও বর্তমানে পদটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। স্পীকার পদ অতীব মর্যাদা ও ক্ষমতা-সম্পন্ন এবং সম্মানের। ১৩৭৭ সালে স্যার টমাস হাঙ্গারফোর্ড সর্বপ্রথম স্পীকার পদে আসীন হন। অতীতে আইন সভার কোন কার্যে সদস্যগণ বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না, সভার কায পরিচালনার জন্য একজন মুখপাত্র বা spokesman থাকিতেন। রাজার নিকট আর্জি বা প্রস্তাব মুখপাত্রের মাধ্যমেই পেশ করিতে হইত। এই ভাবেই স্পীকার পদের উৎপত্তি হয়।

বর্তমানে অবশ্য স্পীকারের আইনসভায় কথা বলিবার সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ফলে পদটির নামকরণের সার্থকতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। স্পীকার বিতর্কে কখনও অংশ গ্রহণ করেন না। তিনি সামগ্রিকভাবে আইনসভার পক্ষে কথা বলেন কিন্তু আইনসভায় বক্তৃতা করেন না। অতীতে স্টুয়ার্ট যুগে যখন প্রায়শঃই পার্লামেণ্ট ও রাজার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইত তখন স্পীকারকে কূটনৈতিক ব্যুৎপত্তির সহিত এই দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আপন কার্য পরিচালনা করিতে হইত।

স্পীকার নির্বাচন

পূর্বে রাজাই স্পীকার মনোনয়ন করিতেন কিন্তু বর্তমানে স্পীকার পদটি নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। বর্তমানে রাজার অনুমোদন সাপেক্ষে আইন সভার সদস্যগণই স্পীকার নির্বাচিত করেন। নূতন পার্লামেণ্টের শুরুতেই স্পীকার নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হয়। নির্বাচিত স্পীকার পার্লামেণ্টের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। দলীয় প্রথার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুতঃ প্রধানমন্ত্রীই মনোনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিরোধীদলের নেতা ও দলের সদস্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে

প্রধানমন্ত্রী স্পীকার পদে সুপারিশ করেন। রাজা প্রথামত এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ সাধারণতঃ করেন না। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্পীকার আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। স্পীকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হেতু পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে স্পীকারের এলাকায় অপর কোন প্রার্থী স্পীকারের সহিত আইন সভায় সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করেন না। পূর্ববর্তী স্পীকার যদি নিজ পদে আসীন থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে পুনরায় নির্বাচিত করা হয়। অবশ্য রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় যখন আসীন ছিল সেই সময় এই সকল প্রচলিত প্রথা ব্যাহত হয়।

শান্ত, ধীর, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, যোগ্য চৌখস ব্যক্তিকে সাধারণতঃ স্পীকার পদে মনোনীত করা হইয়া থাকে।

মনোনয়নের পর মুহূর্তে স্পীকার রাজনৈতিক দলের সহিত সকল সম্পর্ক শূন্য হন। স্পীকারকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিরূপে ধার্য করা হয়। সকল দলাদলি দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে থাকিয়া স্পীকার কমন্স সভার কার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। এই জন্যই বিরোধীদল ক্ষমতা লাভ করিলেও পূর্ববর্তী স্পীকার তাঁহার কার্য চালাইয়া যান। তিনি কোন রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগদান করেন না বা প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক দলীয় মতামত প্রকাশ করেন না।

স্পাকারের নিরপেক্ষতা

স্পীকার তাঁর পদের মান অনুসারে উপযুক্ত বেতন লাভ করেন এবং ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদে এক সরকারী গৃহে অবস্থান করেন। অবসর গ্রহণ কালে তিনি পেনসন লাভ করিবার অধিকারী। একটি উচ্চ সিংহাসনে আসীন হইয়া তিনি সভার কার্য পরিচালনা করেন। তাঁহার আসনের সম্মুখে ও পশ্চাতে ক্লার্কদিগের আসন সারিবদ্ধ থাকে। মার্শাল, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলের নেতাসহ এক শোভাযাত্রা করিয়া স্পীকার কক্ষে প্রবেশ করেন, এবং তাঁর অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে চ্যাপলেন প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করেন। টেবিলে ম্যাস (Mace)-টি রক্ষিত হইবার পর সভার কার্য পরিচালনার উপযোগী সদস্য উপস্থিত হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য স্পীকার উপস্থিত সদস্যদিগের গণনা করেন।

পদমর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা

স্পীকারের কার্যাবলী :

আইন সভার সভাপতিত্বকালে স্পীকার সভার নিয়ম শৃংখলা নির্ধারণ করেন। সভার আলোচনা ও বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করাও তাঁর প্রধান কর্তব্য। কে, কখন বা কাহার পূর্বে বক্তৃতা করিবেন তাহা স্পীকারই নির্ধারণ করিবেন। স্পীকারকে উদ্দেশ্য করিয়াই সদস্যগণ সভায় বক্তৃতা করেন।

সভার কার্যকালে অসদাচরণের জন্য স্পীকার সভা হইতে সদস্যগণকে বহিষ্কার পর্যন্ত করিতে পারেন। সভার মর্যাদারক্ষা ও সদস্যদিগের সদাচরণে বাধ্য করা স্পীকারের অন্যতম মহান কর্তব্য।

সভায় গোলযোগ বৃদ্ধি পাইলে অথবা নিয়ম শৃংখলা অচল হইলে স্পীকার সভার কার্য স্থগিত (adjourn) করিয়া দিতে পারেন।

স্পীকার সভার নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করেন। কোন সদস্য কোন বিষয়ে বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করিলে তাহার সমাধান করার দায়িত্ব স্পীকারের। নজীর, পূর্ব সিদ্ধান্ত অথবা ঐতিহ্য দ্বারা স্পীকার তাঁর নির্দেশগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেন।

আলোচনার মাধ্যমে যে সকল বিষয়ের সমাধান সম্ভব নহে সেই সকল প্রশ্ন ভোটে দেওয়ার নির্দেশ স্পীকার দেন এবং কোন সময় স্বপক্ষে ও বিপক্ষে ভোটসংখ্যা সমান হইলে স্পীকার তাহার নির্ণায়ক (casting) ভোট প্রয়োগ করেন। স্পীকার পার্লামেণ্টারী রীতিনীতি-বিশেষজ্ঞ হন, কারণ তাকে প্রায়ই বৈধতার প্রশ্নের সমাধান করিতে হয় (Points of order)।

যে সকল বিষয় কোন নজীর বা আইনের বিধি নাই সেই সকল বিষয় স্পীকার সদস্যদিগের পরামর্শ দান করিয়া থাকেন। আলোচনায় বিরতি প্রস্তাবে অনুমতি দেওয়া না দেওয়ার অধিকার স্পীকারের আছে।

১৯১১ সালের আইন অনুসারে কোন বিল অর্থ বিল কিনা তাহা স্পীকার নির্ধারণ করেন। অতীতের ন্যায় বর্তমানেও স্পীকার রাজা ও কমন্স সভার মধ্যে যোগাযোগের সেতু হিসাবে বিরাজ করেন। সদস্যদিগের বক্তব্য স্পীকার রাজসমীপে উপস্থিত করেন।

মূলতুবী প্রস্তাব পেশ করিতে অনুমতি দিবার অধিকার স্পীকারের (Adjournment Motion)। প্রশ্নোত্তরের জন্য সময় নির্দিষ্ট করার এবং অবান্তর প্রশ্ন নাকচ করিয়া দিবার দায়িত্ব স্পীকার গ্রহণ করেন।

দলীয় প্রথার সম্প্রসারণ হেতু পার্লামেন্টের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পাদনকল্পে স্পীকারের গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও তাৎপর্যপূর্ণ হইয়াছে। ব্রিটিশ স্পীকারের নিরপেক্ষতা এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। ১৯৪৫ সালে স্পীকার ব্রাউন (Brown) বলেন, "As speaker I am not the government's man, nor the opposition's man. I am the House of Common's man and I believe above all back benche's man.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কমিটি ব্যবস্থা

(Committee System)

[সমগ্র যুক্ত কমিটি, স্থায়ী কমিটি, সিলেক্ট কমিটি, অধিবেশনকালীন কমিটি, প্রাইভেট বিল কমিটি]

ব্রিটেনের আইন জগতে গণতন্ত্র এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংগঠিত করিয়াছে। অগণতান্ত্রিক দেশসমূহে আইন, শাসকবর্গের আদেশ হিসাবে বলবৎ হয়। জনগণের মতের সহিত, অগণতান্ত্রিক দেশসমূহে, আইনের যোগাযোগ অনেক কম। গণতান্ত্রিক দেশসমূহে জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত আইনসভার কার্য জটিল ও ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। কারণ গণতন্ত্রে জনমত গ্রহণ ও জাগরণের সহিত সংযোগ স্থাপন এক প্রকার অপরিহার্য। কার্যের ব্যাপকতা ও জটিলতা হেতু আইন সভার পক্ষে সকল কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। এইজন্য প্রাথমিক কার্যাদি সম্পাদনের দায়িত্ব সভার কমিটিগুলির উপর অর্পণ করা হইয়াছে। ব্রিটেনে কমন্স সভার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি আছে এবং ইহারা মূল্যবান কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। কমিটি ব্যবস্থার জন্য ব্রিটিশ আইন সভার উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ও সময়-সংক্ষেপ সম্ভব হইয়াছে।

ব্রিটিশ কমন্স সভার অধীনস্থ পাঁচটি উল্লেখযোগ্য কমিটি আছে, যথা—

(১) কমন্স সভার সকল সদস্য লইয়া গঠিত সমগ্র কক্ষ কমিটি (The Committee of the Whole House)

(২) স্থায়ী কমিটি (Grand or Standing Committee)

(৩) সিলেক্ট কমিটি (Select Committee)

(৪) অধিবেশনকালীন কমিটি (Sessional Committee)

(৫) প্রাইভেট বিল কমিটি (Private Bill Committee)

সমগ্র কক্ষ কমিটি—সমগ্র কক্ষ কমিটি কমন্স সভার সকল সদস্য লইয়া গঠিত। এই কমিটিতে স্পীকারের পরিবর্তে কমিটির সভাপতি সভাপতিত্ব করেন। টেবিলের নীচে স্পীকারের ম্যাস্ (Mace) স্থাপন করা হয়।

কমিটিতে প্রস্তাব উত্থাপন কালে কোন সমর্থনের প্রয়োজন হয় না। বিতর্ক বা আলোচনা স্থগিত রাখিবার জন্য কমন্স সভায় যে সকল পদ্ধতি গৃহীত হয় তাহা কমিটি সভার কার্যে প্রচলিত থাকে না। একই বিষয়ের উপর একই সদস্য বহুবার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। কমন্স সভায় আলোচনা কালে যে নিয়মের জটিলতার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা কমিটি-সভায় অনেকখানি শিথিল করা হয়। সমগ্র কক্ষ কমিটির সভাপতি, কমিটির আলোচনার ফলাফল কমন্স সভায় দাখিল করেন। পূর্বে সকল সরকারী বিল এই কমিটির নিকট পেশ করা হইত, বর্তমানে কেবলমাত্র অর্থসংক্রান্ত বিল বা কমন্স সভার মতে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিল সমগ্র কক্ষ কমিটির নিকট পেশ করা হয়। এই সমগ্র কক্ষ কমিটিকে আবার কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। নৌ, সৈন্য ও বিমান বাহিনীর জন্য ধার্য সরকারী ব্যয় পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিবার দায়িত্ব সরবরাহ কমিটির (The Committee of Supply)। এতদ্ব্যতীত উপায় নির্ধারণী কমিটি (The Committee of Ways and Means) ও সাধারণ সমগ্র কক্ষ কমিটি (The Ordinary Committee of the Whole House) বিদ্যমান।

সিলেক্ট কমিটি (Select Committee) ঃ

কোন বিশেষ ব্যাপার বা প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধান ব রিপোর্ট দাখিল করা এই কমিটির দায়িত্ব। কোন নূতন প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পূর্বে সাধারণতঃ কমন্স সভা উক্ত বিষয়ে সিলেক্ট কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ পনের জন সদস্য লইয়া সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। কমিটির প্রধান কর্তব্য হইল বিশেষজ্ঞদিগের পরামর্শ গ্রহণ করা, সাক্ষ্য সংগ্রহ ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা কমন্স সভায় পরিবেশন করা। কমিটিগুলি বিভিন্ন দলের সদস্য ও প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। প্রত্যেকটি কমিটি নিজ নিজ সভাপতি মনোনয়ন করে।

অধিবেশনকালীন কমিটি (Sessional Committee) :

বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এই কমিটিগুলি কমন্স সভার প্রত্যেক অধিবেশনের সময় নিযুক্ত হয়। মনোনয়ন কমিটি (Selection

Committee), সরকারী হিসাব নিকাশ কমিটি (The Committee of Public Accounts), স্থায়ী নির্দেশ কমিটি (The Standing Order Committee), অধিকার সংক্রান্ত কমিটি (The Committee of Privileges) প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের আপন আপন নির্দিষ্ট কার্য আছে।

বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল কমিটি (Private Bills Committee)

যে সকল বেসরকারী বিলের বিরোধিতা করা হয় তাহা প্রাইভেট বিল কমিটিতে প্রেরিত হয় এবং বিনা বিরোধিতায় যে সকল বিল গ্রহণ করা হয় তাহা বিরোধবিহীন বিল কমিটিতে পাস করা হয় (Committee on unopposed Bills)।

স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) :

বিশ হইতে পঞ্চাশজন সদস্য লইয়া এক একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত। কমন্স সভার সময় সংক্ষেপের নিমিত্ত ১৮৮২ সালে প্রথম কয়েকটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। অধিবেশনের শুরুতেই স্থায়ী কমিটিগুলিকে নিয়োগ করা হয় এবং পার্লামেণ্ট স্থগিত না থাকা পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। প্রথমে দুইটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। একটি আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে অন্যটি কৃষি, ব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ে গঠিত হয়। ১৯০৭ সালে প্রায় ৬০ হইতে ৮০ জন সদস্য সংযোগে চারিটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। ১৯১৯ সালে সংখ্যা হয় মোট ছয়টি। বর্তমানে পাঁচটি কমিটি আছে। বর্তমানে ২০ হইতে ৫০ জন সদস্য লইয়া কমিটিগুলি গঠিত এবং ২০ জন সদস্য উপস্থিত থাকিলে কমিটির কার্য পরিচালিত হইতে পারে। নির্দিষ্ট কমিটির জন্য নির্দিষ্ট কোন কার্যপদ্ধতি বা নির্দিষ্ট বিলের পর্যালোচনার ব্যবস্থা নাই। কমন্স সভায় বিলগুলি দ্বিতীয় পাঠের পর সিলেক্ট কমিটিগুলির নিকট উপস্থাপিত হয়। কমিটি, বিলটির পর্যালোচনা করিয়া এক সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করিতে পারে এবং ক্যাবিনেট ঐ সংশোধনী প্রস্তাবে একমত না হইলে আলোচনার মাধ্যমে আপোষ রফা সম্ভব হইতে পারে।

স্ট্যাণ্ডিং কমিটি বা স্থায়ী কমিটিগুলির গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করে। কমিটিগুলির সদস্য সংখ্যা হ্রাস করিলে কমিটিগুলির আলোচনা ও কার্য-পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে।

বিশেষজ্ঞ হিসাবে মতামত প্রকাশের জন্য আলোচ্য বিষয়ের তথ্য অভিজ্ঞ হওয়া কমিটির সদস্যগণের পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

বেসরকারী স্থায়ী কর্মচারীদিগের সহিত যোগসূত্র স্থাপনপূর্বক কমিটির সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে ওয়াকিবহাল হইতে পারেন।

সারাংশ

শাসনতন্ত্র একটি আইনগত ধারণা, নীতি, আইন, প্রথা ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি উৎপাদনের সমন্বয়ে শাসন ব্যবস্থার রূপরেখা নির্ণয় করা হয়। "A constitution is the autobiography of a power relationship."

শাসনতন্ত্রকে লিখিত ও অলিখিত এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। কোন কোন সংবিধানের কাঠামো এককেন্দ্রিক এবং কোন কোন সংবিধানের কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয়। সংবিধান সহজ পরিবর্তনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় হইতে পারে।

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উৎস

শাসনতান্ত্রিক আইন ও প্রথাগত বিধান এই উভয় উপাদান লইয়া ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র গঠিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র; যথা:— অধিকারের আবেদন পত্র, অধিকারের বিল, বন্দোবস্তের আইন, প্রভৃতি ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম উৎস। পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন ও বিধিবদ্ধ আইন ব্রিটেনের সংবিধানে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম উৎসরূপে পরিগণিত। প্রথাগত আইনসমূহ বিচারালয় কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া প্রকৃত আইনরূপে পরিণত হয় এবং সংবিধানের উৎসস্বরূপ হইয়া দেখা দেয়। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশে প্রথার অবদান অনস্বীকার্য। পারস্পরিক বুঝাপড়ার মধ্য দিয়া বহুদিনের প্রচলনের ফলে এমন কতকগুলি রীতিনীতি গঠিত হয় যাহা আইনের ন্যায় পবিত্র হইলেও আদালত কর্তৃক বলবৎ হইতে পারে না।

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে লিখিত শাসনতন্ত্র নহে। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র এককেন্দ্রিক শাসনতন্ত্র। সহজ পরিবর্তনশীলতা এই শাসনতন্ত্রের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আইন প্রণয়ন, সংশোধন সাধন প্রভৃতি সকল ব্যাপারে পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি গৃহীত হয় নাই। আইনের অনুশাসন ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে আইনের অনুশাসনের গুরুত্ব সর্বাধিক। ব্রিটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও দায়িত্বশীল সরকারের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

ব্রিটেনে রাজতন্ত্র

একদা ইংল্যাণ্ডে উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। বর্তমানে ইংলণ্ডের রাজা শুধু রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন। ব্যক্তি হিসাবে রাজার অস্তিত্ব সাময়িক কিন্তু রাজপদ চিরন্তন। রাজশক্তির নিজস্ব প্রাধিকার আছে, যথা:—রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না, রাজার মৃত্যু নাই, রাজা কোন অবস্থাতেই শিশু নয় ইত্যাদি। রাজার শাসন বিভাগীয়, আইন বিভাগীয় ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার সহিত রাজতন্ত্রের এক অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। এই দিক দিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিব যে রাজতন্ত্রের উপযোগিতা ইংলণ্ডে আজও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

প্রিভি কাউন্সিল ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতাসমূহের অন্যতম শাসনতান্ত্রিক যন্ত্ররূপে অভিহিত। ক্যাবিনেট সৃষ্টির পর প্রিভি কাউন্সিলের গুরুত্ব বিশেষ হ্রাস পায়। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনে ক্যাবিনেট সভার গুরুত্ব ও মন্ত্রিসভার দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে। দায়িত্বশীল সরকারের অর্থ হইল মন্ত্রিগণ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আইনসভার সদস্য অর্থাৎ জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের নিকট প্রত্যক্ষভাবে এবং নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট পরোক্ষভাবে বা চরমভাবে দায়ী থাকিবেন।

প্রধানমন্ত্রী

ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় ক্যাবিনেট সভার কেন্দ্রস্থল হিসাবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব সবিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। বলা হইয়াছে প্রধানমন্ত্রী হইলেন "the key-stone of the Cabinet arch." সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে ও পার্লামেন্টের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই ক্যাবিনেট সভা গঠিত হয়। বস্তুতঃ ইংল্যাণ্ড রাষ্ট্রের প্রধান অধিনায়ক হইলেন ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই রাজা রাজকার্য পরিচালনা করেন। প্রধানমন্ত্রী মূলতঃ ইংল্যাণ্ডের বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করেন।

ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে অর্পিত ক্ষমতাবলে আইনপ্রণয়নের ব্যবস্থা ও স্থায়ী বেসামরিক কর্মচারিবৃন্দ গ্রহণের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের বিচারালয়গুলিকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। কাউন্টি অথবা বারো (County, Borough) আদালতগুলিতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের মামলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উচ্চ বিচারালয়, অর্থাৎ The High Court of Justice, রাজার বিচার বিভাগ, ইচ্ছাপত্র, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও নৌবাহিনীর বিভাগ ইত্যাদিতে বিভক্ত হইতে পারে। আপীল আদালতে উচ্চ বিচারালয় হইতে আপীল আনয়ন করা যায়। লর্ড সভাই সর্বশেষ স্তরের আপীল আদালত। ফৌজদারী মামলার বিচার প্রাথমিকভাবে একতরফা আদালত বা Summary Court-এ অনুষ্ঠিত হয়। সামারী কোর্টের উর্ধ্বে ত্রৈমাসিক আদালত ও তদূর্ধ্বে ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত। ফৌজদারী আপীল আদালত (Court of Criminal Appeal) ফৌজদারী বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত।

রাজনৈতিক দল

বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে শ্রমিক দল (Labour Party) ও রক্ষণশীল দলের (Conservative Party) মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণভাবে শ্রমিক দল শিল্পের জাতীয়করণ ও শ্রমিকসমাজের মঙ্গল আনয়নে প্রয়াসী, রাজনৈতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে জমিদার,

শিল্পপতি. মহাজন, ধর্মযাজক, ব্যাঙ্কমালিক প্রভৃতির সমন্বয়ে রক্ষণশীল দল গঠিত হইয়াছে। রক্ষণশীল ও শ্রমিক দল ছাড়াও ইংল্যাণ্ডে উদারনৈতিক দল ও কম্যুনিস্ট দলের অস্তিত্ব আছে।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট দুইটি পরিষদের সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছে,—উচ্চ-পরিষদের নাম লর্ডস সভা, নিম্নপরিষদের নাম কমন্স সভা। লর্ড চ্যান্সেলর লর্ডস সভার সভাপতি এবং স্পীকার কমন্স সভার সভাপতি। কমন্স সভার সভাপতি হিসাবে ব্রিটিশ স্পীকার নিজেকে নির্দলীয় বলিয়া ঘোষণা করেন ও নিরপেক্ষতার সহিত সভার কার্য পরিচালনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

Exercise

1. Discuss the salient features of the British Constitution.

2. Explain the position and powers of the Crown in the English Constitution.

3. "The English Constitution does not exist."—Do you agree ?

4. State briefly the position of the Cabinet. Do you think Cabinet dictatorship exists in England ?

5. Examine the following maxims :—

(a) "The king never dies." (b) "The king can do no wrong."

6. Explain the position of the House of Lords with reference to the effect of the Parliament Act 1911 upon the position of House of Lords.

7. "The British legislature is anything but legislative in its main function."

8. The theory is that the House of Commons controls the Government. It is equally true to say that the Government controls the house.—Do you agree ?

9. The Prime Minister is the key-stone of the Cabinet Arch.

শাসনতন্ত্র

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

প্রথম অধ্যায়

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান

[মার্কিন রাজনীতির ইতিহাসে ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই দিবস স্মরণীয়—১৭৮৭ সালে সংবিধানের খসড়া রচিত হয়—১৭৮৯ সালে উহা কার্যকর হয়—প্রস্তাবনায় সার্বভৌমিকতা ও প্রজাতন্ত্রের আদর্শ দেখা যায়।]

আমেরিকায় তেরটি উপনিবেশ ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার অভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রায় হইয়া ইংরাজ উপনিবেশিকতার নাগপাশে বদ্ধ হয়। বেঞ্জামিন ফ্রাংক্লিন (Benjamin Franklin) ১৭৫৪ সালে ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে পেনসিলভিনিয়া গেজেটে এক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ নিবন্ধে তিনি একটি কাষ্ঠখণ্ডে আটটি ভাগে বিভক্ত এক সর্প চিত্রিত করিয়া মার্কিন উপনিবেশ সমূহের মধ্যে প্রকাশিত অনৈক্যের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করেন। ফ্রাংক্লিন সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন "হয় ঐক্য না হয় মৃত্যু"। বহুধা বিভক্ত উপনিবেশগুলির অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য, অসহযোগের মধ্যে সহযোগিতা আনয়নের জন্য প্যাট্রিক হেন্‌রী, টমাস জেফারসন, ও জর্জ ওয়াশিংটনের প্রয়াস অনস্বীকার্য। এই তিনজন মার্কিন নেতা "Toungue, Pen and Sword" রূপে পরিচিত ছিলেন। হেন্‌রী ছিলেন বাগ্মী, জেফারসন ওজস্বিনী লেখনীর মাধ্যমে স্বাধীনতা বিপ্লবের ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন এবং বীরত্বের প্রতিমূর্তি হিসাবে ওয়াশিংটনের আবির্ভাব হইয়াছিল।

১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই দিনটি আমেরিকার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিনরূপে পরিগণিত হইবে। ঐদিন আমেরিকা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৭৭৬ সালের এগারই জুন, জন্ এডামস্, টমাস জেফারসন, বেঞ্জামিন ফ্রাংক্লিন, রগার শেরম্যান ও রবার্ট লিভিংস্টোনকে স্বাধীনতা ঘোষণার খসড়া প্রস্তুত করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পরে এই খসড়ার উপর মূলতঃ ভিত্তি করিয়া জর্জ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে ১৭৮৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করা হয় ও ১৭৮৯ সালে ঐ সংবিধান কার্যকরী করা হয়। ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে উপস্থিত তেরটি নবজাত রাষ্ট্র বর্তমানে পঞ্চাশটি মার্কিন অংগরাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

প্রস্তাবনা (Preamble) ঃ

সার্বভৌমিকতা ও প্রজাতন্ত্রের আদর্শ

আমেরিকার সংবিধানের প্রস্তাবনায় জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব, প্রজাতন্ত্রের আদর্শ এবং সংবিধানের উদ্দেশ্য বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে "We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquillity, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America" অর্থাৎ ঐক্য, ন্যায়, আভ্যন্তরীণ শৃংখলা, যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য মার্কিন জনসাধারণ কর্তৃক সংবিধান বিধিবদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। "We the people of the United States of America" শব্দ কয়টি বিশেষ লক্ষণীয়। ইহা প্রজাতন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়াছে ও জনসাধারণের সার্বভৌমিকতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics) ঃ

লিখিত সংবিধান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত সংবিধান (written constitution)। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় লিখিত সংবিধানের উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

সংবিধানে প্রথা ও রীতিনীতি

দ্বিতীয়তঃ লিখিত সংবিধান বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সম্পূর্ণরূপে প্রথা (convention) ও চলিত রীতিনীতি বর্জিত নহে। প্রথা ও প্রচলিত রীতিনীতি মার্কিন সংবিধানকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে। সংবিধানে অলিখিত বহু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব মার্কিন কংগ্রেসকে অর্পণ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ব্যাপারেও প্রথা ও চলিত রীতির উপর নির্ভর করা হয়। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত হইবেন বলিয়া স্থির আছে কিন্তু বর্তমানে প্রায় সরাসরি নির্বাচনেই রাষ্ট্রপতিকে সাফল্য লাভ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত ওয়াশিংটন, পর পর দুই-

বারের পর তৃতীয় বার একই ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া এক নজীর স্থাপন করেন, অবশ্য রুজভেল্ট সেই নজীর ভঙ্গ করেন।

তৃতীয়তঃ সংবিধানটি দুষ্পরিবর্তনীয়। বিশেষ পদ্ধতি ও নিয়মের দ্বারা সংবিধানের অনুচ্ছেদের সংশোধন করা হয়। সাধারণ আইনের নিয়মে সংশোধন প্রস্তাব নিয়ন্ত্রিত হয় না। এই দুষ্পরিবর্তনীয়তার জন্য গত একশত পঞ্চাশ বৎসরে মাত্র ২২টি সংশোধন সংযোজিত হইয়াছে।

দুষ্পরিবর্তনীয়

চতুর্থতঃ মাকিন সংবিধানের প্রাধান্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রস্তাবনায় এই প্রাধান্য স্পষ্টভাবে দৃঢ়তার সহিত স্বীকার করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সংবিধানের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, "The constitution shall be the supreme law of the land, and judges in every state shall be bound thereby, anything in the constitution or laws of any state notwithstanding." মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অংগরাজ্য সম্বন্ধীয় বা স্থানীয় সকল প্রকার শাসন ব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

সংবিধানের প্রাধান্য

পঞ্চমতঃ প্রকৃতিগত ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয়। অনেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত-রূপে প্রচার করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। যুক্ত-রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সকল প্রয়োজন সংবিধান মিটাইতে সক্ষম হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুইপ্রকার সরকার, জাতীয় সরকার ও অংগরাজ্যের সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, সংবিধানের প্রাধান্য ও যুক্ত-রাষ্ট্রীয় আদালতের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অপরিহার্য সর্তগুলি সম্পূর্ণ বিরাজমান দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো

ষষ্ঠতঃ মার্কিন সংবিধানে সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হইয়াছে। লক্ ও মন্তেসকিউর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের মতবাদ মার্কিন অধিবাসীদিগের বিশেষভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করে। মার্কিন সংবিধান রচয়িতাগণ মনে করিতেন শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের কেন্দ্রীয়করণ স্বৈরাচারের নামান্তর। সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদেই বলা হইয়াছে,

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অনুসৃত

"All legislative powers shall be vested in a congress of the United States·· অর্থাৎ কংগ্রেসের উপর আইন প্রণয়নের সকল দায়িত্ব অর্পণ করা হইল। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির হস্তে সমস্ত শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে, "The executive powers shall be vested in a President of the United States of America." তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের উপর সমস্ত বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে, "The judicial power of the United States shall be vested in one Supreme Court"··· ।

নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি

সপ্তমতঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ব্যবস্থার ত্রুটিগুলির প্রতিষেধক হিসাবে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি (Theory of Checks and Balances) সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষমতা পৃথকীকরণের ফলে যাহাতে শাসনযন্ত্র বিকল না হইয়া পড়ে অথবা পৃথকীকরণের সুযোগে কোন বিভাগ অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া না পড়ে এই আশংকার জন্য ভারসাম্য নীতি গৃহীত হয়। এই নীতির ফলে যৌথভাবে ও সৌজন্য মূলক আচরণের দ্বারা একাধিক বিভাগ সরকারের বিভিন্ন কার্য পরিচালনা করে।

রাষ্ট্রপতির শাসন

অষ্টমতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পার্লামেণ্টারী প্রথার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতিই নামে ও প্রকৃত অর্থে শাসক।

অধিকারের বিল

নবমতঃ মার্কিন সংবিধানে অধিকারের বিল (Bill of Rights) প্রভৃতি দ্বারা নাগরিকদিগের মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। ১৭৯১ সালে যে প্রথম দশটি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা একত্রিত করিয়া অধিকারের বিল সৃষ্টি করা হয়। নাগরিকদিগের মিলিত হইবার, আবেদন করিবার, অস্ত্রধারণ করিবার, গতিবিধির স্বাধীনতা, ধর্মাচরণ ও বাক্ স্বাধীনতা, সম্পত্তি রক্ষার অধিকার ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণের অধিকার, জুরীর সাহায্যে ফৌজদারী মামলার বিচার, যথাবিহিত

আইনের পদ্ধতিতে বিচার পাইবার অধিকার (due process of law) প্রভৃতি অন্যতম মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এই অধিকারগুলির অধিকাংশই সংশোধন প্রস্তাবরূপে প্রবর্তিত হয়। অধিকারের বিলে উল্লিখিত অধিকারগুলিতেই সীমারেখা চিত্রিত করা হয় নাই। উল্লিখিত হয় নাই এমন অধিকার যদি নাগরিকগণকে সাধারণক্ষেত্রে ভোগ করিতে দেখা যায়, তবে তাহা সীমিত করিবার প্রয়াস না করিয়া রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি সংবিধানে দেওয়া হইয়াছে। নবম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, "Enumeration of certain rights in the constitution is not to be construed to deny or disparage others retained by the people."

দ্বৈত নাগরিকতা

দশমতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকতার প্রবর্তন করা হইয়াছে (Double Citizenship)। প্রত্যেক নাগরিক একাধিক্রমে নিজ অংগরাজ্যের ও সমগ্রভাবে আমেরিকার নাগরিকরূপে পরিগণিত।

চাকুরির ভাগ বাঁটোয়ারা পদ্ধতি

সরকারী চাকুরির ভাগ বাঁটোয়ারা পদ্ধতি (spoils system) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াই তাঁহার বিশ্বস্ত ব্যক্তি ও সমর্থকগণকে উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত করেন ও পূর্বতন সরকারী কর্মচারিগণ পদত্যাগে বাধ্য হন। বর্তমানে অবশ্য এই বিশেষ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি প্রয়োগ করেন না। সিভিল সার্ভিস বা বেসরকারী স্থায়ী কর্মচারিগণই এক্ষণে উচ্চ সরকারী পদগুলির অধিকাংশ অধিকার করিয়াছে।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা

পরিশেষে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এক অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কংগ্রেসের প্রতিটি আইনের বৈধতা সুপ্রীম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করে। আইনের সংবিধানগত উপযোগিতা ও বৈধতা বিচারের একমাত্র অধিকার সুপ্রীম কোর্টকে দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Federation)

[স্বাধীন সত্তা রক্ষা করিয়া অংগরাজ্যগুলি একত্রিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনে প্রয়াসী হয়—সংবিধানের প্রাধান্য—ক্ষমতা বণ্টনের প্রকৃতি—বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য—নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি]

মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সংযোজিত হইয়াছে। আমেরিকায় অংগরাজ্যগুলি একত্রিত হইয়া সাধারণ জাতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য সাধারণ কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইহার ফলেই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হইয়াছে। প্রতিটি অংগরাজ্য নিজ নিজ সত্তা রক্ষা করিয়া কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনস্থ হইতে সম্মত হয়। এইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে বলা হয় "An indestructible union of indestructible units.".

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাধারণতঃ কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য (supremacy of the constitution), ক্ষমতা বণ্টন (distribution of powers) ও বিচার বিভাগের প্রাধান্য (supremacy of the judiciary) বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

সংবিধানের প্রাধান্য—যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুকূল করিয়া লিখিত দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করিয়াছে। আমেরিকায় সংবিধানকে পূর্ণ প্রাধান্য অর্পণ করা হইয়াছে। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে সংবিধানই দেশের শ্রেষ্ঠ আইনের মর্যাদা লাভ করিবে এবং বিচারকগণ সংবিধানের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবেন। "The Constitution and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof, and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law of the land ; and the judges

in every State shall be bound thereby, anything in the Constitution or laws of any State to the contrary notwithstanding."

এই অনুচ্ছেদ হইতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রাধান্য সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। রাষ্ট্রের সকল শাসন যন্ত্র (জাতীয় অংগরাজ্য সম্বন্ধীয় বা স্থানীয়) সংবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। রাষ্ট্রের প্রধান কর্মসচিব হইতে নগণ্য নাগরিক সকল ব্যক্তিই এই সংবিধানের দ্বারা পরিচালিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন সহজ নহে। বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ক্ষমতা বণ্টনের প্রকৃতি

মার্কিন সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকার ও অংগরাজ্যগুলির সরকারের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষমতা বণ্টন করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দিষ্ট কতকগুলি ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া অবশিষ্টাংশ অংগরাজ্যগুলির জন্য সংরক্ষিত করা হইয়াছে। সংবিধান প্রদত্ত কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা ভিন্ন কেন্দ্রের অন্য কোন ক্ষমতা প্রয়োগের এক্তিয়ার নাই। এইভাবে আমেরিকায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে সীমিত করা হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় অংগরাজ্যগুলি আদিম (original), অনির্দিষ্ট কতকগুলি ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার উপভোগ করে। এতদ্ব্যতীত সংবিধানে দশম সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে সংবিধান যে ক্ষমতা কেন্দ্রকে সমর্পণ করে নাই অথচ অংগরাজ্যগুলিকে অর্পণ করিতে নিষেধ করে নাই অংগরাজ্য সমূহ সেই ক্ষমতাগুলিকে প্রয়োগের অধিকার লাভ করিবে। অর্থাৎ "The powers not delegated to the United States by the Constitution nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively or to the people." এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রের কার্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল ক্ষমতার উদ্ভব হইয়াছে তাহাদের প্রায় সকলই অবশিষ্টাংশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া (Residuary powers) অংগরাজ্যগুলির হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা অংগরাজ্যগুলির সরকার অধিকতর ক্ষমতাশালী বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া অস্বাভাবিক নহে।'

অবশ্য বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি বিস্তার ও জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিক কালে প্রায় সকল যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয়করণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে এবং এই দিক দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কোন ব্যতিক্রম নহে। সকল দেশের ন্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দ্রুত চিন্তার পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা ও জাতির প্রতি আনুগত্য দ্রুততালে বৃদ্ধি পাইতেছে। সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন, প্রথা ও রীতিনীতি এবং বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়করণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশ্বযুদ্ধ, ঠাণ্ডা লড়াই প্রভৃতির আশংকায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসিগণ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বিশেষ নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জীবন, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইয়াছে। বহুক্ষেত্রে সুস্থ অর্থনৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়, বহুক্ষেত্রে কেন্দ্রের উপর অর্থনৈতিক দিক দিয়া অংগরাজ্যগুলিকে নির্ভর করিতে হয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning) সংযোজিত করিবার ফলেও অংগরাজ্যগুলি কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হইতেছে।

সাম্প্রতিক কালে কল্যাণ রাষ্ট্র (Welfare State) গঠনের প্রবণতা দেখা দেওয়ায় ও সমাজ সেবা মূলক কাযের ব্যাপ্তির ফলে কেন্দ্রীয়করণ নীতি দৃঢ়তা লাভ করিতেছে।

যান্ত্রিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। বস্তুতঃ বেকার সমস্যা, মন্দাবাজার জনিত সমস্যা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যজনিত নানা সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও অংগরাজ্যগুলির সরকারকে পারস্পরিক বুঝাপড়ার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে। আমেরিকার সামাজিক নিরাপত্তা আইন (Social Security Legislation) ও রুজভেল্ট প্রবর্তিত নয়া ব্যবস্থা (New Deal) ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্র অথবা অংগরাজ্য কোন সরকারকেই সীমাহীন ক্ষমতা অর্পণ করা হয় নাই। দশম সংশোধনী প্রস্তাব অনুধাবন করিলে দেখা যায় অংগরাজ্যগুলির প্রতি কতকগুলি ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আছে। এতদ্ব্যতীত যে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রকে অর্পণ করা হয় নাই এবং রাজ্যসরকারগুলিকে প্রয়োগ করিতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হইয়াছে তাহা জনসাধারণকে সমর্পণ করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নাগরিকের কতকগুলি মৌলিক অধিকার কেন্দ্রীয় অথবা অংগরাজ্য সরকার কেহই সংকুচিত করিতে পারে না। কতকগুলি ব্যাপারে আবার কেন্দ্রীয় ও অংগরাজ্যগুলির সরকার উভয়ই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে (The American constitution also recognises a sphere of concurrent jurisdiction in which both National and State Governments can have a deal.)।

মার্কিন সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে (Article I sec. 8) কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্পিত ক্ষমতাগুলিকে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, "The congress shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts and provide for common defence and general welfare of the United States"……অর্থাৎ কর ধার্য ও আদায়, রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সাধারণ কল্যাণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা কেন্দ্রকে অর্পণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমেরিকার কংগ্রেস রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ঋণ গ্রহণ, বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রাযন্ত্রের পরিচালনা করিবার, জালিয়াতি ও দেউলিয়া প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, ডাকঘর, রাস্তা নির্মাণ, কলা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য ব্যবস্থা করিবার, ট্রাইবিউনাল গঠন, যুদ্ধ ঘোষণা করিবার প্রভৃতি ক্ষমতা উপভোগ করে। একমাত্র অংগরাজ্যগুলিই কাউন্টি অথবা চার্টার্ড নগর সৃষ্টি করিতে সক্ষম।

কতকগুলি ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার হেবিয়াস কর্পাসের কোন আবেদন স্থগিত করিতে পারেন না, ধর্মাচরণ নিষেধ করিয়া কোন আইন প্রয়োগ করিতে পারেন না অথবা বাক্ স্বাধীনতা ও মুদ্রণ যন্ত্রের ক্ষমতা

সংকুচিত করিয়া কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করা কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ার-বহির্ভূত।

অনুরূপভাবে কতকগুলি ক্ষমতা অংগরাজ্য সরকারগুলির এক্তিয়ার-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কোন অংগরাজ্য সরাসরি বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সংস্থাপন করিতে বা যুদ্ধ জাহাজ ও সৈন্য মোতায়েন করিতে সক্ষম নহে। বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা মৈত্রী স্থাপনাও অংগরাজ্যগুলির এক্তিয়ার বহির্ভূত। নাগরিকের পৌর অধিকার বা ভোট প্রদানের অধিকার সংকুচিত করিবার ক্ষমতা অংরাজ্যগুলির নাই।

বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে আমেরিকায় বিচার বিভাগের প্রাধান্য বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের অভিভাবক ও ব্যাখ্যা কর্তারূপে আমেরিকায় সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে (Guardian and interpreter of the constitution)। সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের সহিত যদি কংগ্রেস কর্তৃক প্রবর্তিত কোন আইনের বিরোধ প্রকট হইয়া প্রতিভাত হয় তবে সেই আইনকে অসিদ্ধ ও অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার সুপ্রীম কোর্টের আছে। নাগরিকের জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার অধিকার সুপ্রীম কোর্ট রক্ষা করে। এইজন্য জেমস্ বেক ও চার্লস বেড সুপ্রীম কোর্টকে যথাক্রমে "The balance wheel of the constitution" ও "Crowning feature of the federal system" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মার্কিন শাসনব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ব্যবস্থা (System of checks and balances):

মার্কিন সংবিধান রচয়িতা ও স্রষ্টাগণ সরকারের অবাধ ক্ষমতার বিরুদ্ধে সদা সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ব্যক্তি স্বাধীনতার উপাসক মার্কিন নেতৃবৃন্দ ও চিন্তাশীল সংবিধান রচয়িতাগণ ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণের বিরোধী ছিলেন। স্বৈরাচার ও ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ প্রতিরোধকল্পে মার্কিন শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি প্রবর্তিত হয়।

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসারে সরকারকে তিনটি বিভাগ, শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া নিজ নিজ কর্তব্যকার্য সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদ অনুসারে কংগ্রেসের হস্তে আইন প্রণয়নের যাবতীয় সকল ক্ষমতা অর্পণ করা হয় ("All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States")। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে স্থির হয় রাষ্ট্রপতির হস্তে সকল শাসন ক্ষমতা সমর্পিত হইবে ("The executive powers shall be vested in a President of the United States")। তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে বিচারসংক্রান্ত সকল ক্ষমতা বিচার বিভাগের হস্তে সমর্পণ করা হয় ("The judicial powers shall be vested in a Supreme Court and such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish")।

স্বতন্ত্রীকরণ নীতির কুফল

কিন্তু এই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রবর্তিত হইবার ফলে নূতন সমস্যারও উদ্ভব হয়। অতিরিক্ত স্বতন্ত্রীকরণের ফলে শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে বলিয়া আশংকা করা হয়। এতদ্ব্যতীত আপন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগ স্বৈরাচারী ও অবাধ ক্ষমতার অধিকারী হইয়া দেখা দিতে পারে বলিয়াও আশংকা প্রকাশ করা হয়। সহযোগিতা ও পারস্পরিক সৌজন্যমূলক আচরণ ভিন্ন সরকার উপযুক্তভাবে কখনই কার্য সম্পাদনে সক্ষম হইবে না।

নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের অবতারণা

অতএব ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হয়। এই নীতি অনুসৃত হইবার ফলে প্রত্যেক বিভাগ অপর দুই বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া শাসন ব্যবস্থায় ভারসাম্য প্রবর্তনের ফলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণজনিত কুফলগুলি প্রতিরোধ করা সম্ভব হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কংগ্রেসের আইনকে নাকচ করিবার (veto) ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে অন্যায় অপরাধের জন্য রাষ্ট্রপতির বিচারকার্য (impeachment) পরিচালনা করিবার ক্ষমতা আমেরিকার কংগ্রেস বা আইনসভাকে

সমর্পণ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ করেন, অপরদিকে শাসনকার্য নির্বাহের জন্য অর্থ মঞ্জুরের ব্যাপারে কংগ্রেসকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়োগ ব্যবস্থার উৎস, কিন্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ক্ষমতা সেনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ করা হইয়াছে। সেনেটের অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন, কিন্তু এই নিয়োগ ব্যবস্থাও সেনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপরদিকে কংগ্রেসের কোন আইন সংবিধানবিরোধী বা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা একমাত্র সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত। এইভাবে বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংশোধন পদ্ধতি
(Process of Amendment)

[গত একশত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মাত্র বাইশটি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।]

মার্কিন শাসনতন্ত্রের পঞ্চম অনুচ্ছেদে সংশোধন পদ্ধতির বিবরণ রহিয়াছে। পঞ্চম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, "The Congress, whenever, two-thirds of both the Houses shall deem it necessary shall propose amendments to this Constitution or, on the application of the legislatures of two-thirds of the several States, shall call a convention for proposing amendments which in either case shall be valid to all intents and purposes, as part of this Constitution when ratified by the Legislature of three-fourths of the several States or by convention in three-fourths thereof, as the due or the other method of ratification may be proposed by the Congress."

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংশোধন পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ। যুক্তরাষ্ট্রের উভয় পরিষদের প্রত্যেকটির দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের দ্বারা অথবা অংগরাজ্যগুলির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের আবেদনক্রমে কংগ্রেস সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। ইহার পর সংশোধন প্রস্তাব কার্যকর করিবার জন্য প্রত্যেক অংগরাজ্যে যে সভা আহ্বান করা হয়, উক্ত সভার তিন-চতুর্থাংশ সদস্য অথবা অংগরাজ্যের আইনসভা-সমূহের তিন-চতুর্থাংশ সমর্থন জানাইলে ঐ সংশোধন প্রস্তাব কার্যকর হয়।

অতএব দেখা যায় যে যদি এক-তৃতীয়াংশের কিঞ্চিৎ অধিক অংগরাজ্যগুলি কোন সংশোধন প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তাহা হইলে ৫০টি অংগরাজ্যের অধিকাংশ সমর্থন জানাইলেও প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবে। গত একশত পঞ্চাশ বৎসরের শাসন ব্যবস্থায় মাত্র ২২টি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

প্রথম সংশোধন প্রস্তাব– ধর্মাচরণ সম্পর্কিত বিধিনিষেধ, বাক্‌স্বাধীনতার সংকোচ, মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় নিষেধাজ্ঞা জারি করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ হইতে কংগ্রেসকে নিরত করা হয়।

দ্বিতীয় সংশোধন—জনসাধারণকে অস্ত্র রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

তৃতীয়—শান্তিকালে আইনসিদ্ধ উপায় ব্যতীত অন্য পদ্ধতিতে সৈন্যগণ মালিকের বিনা অনুমতিতে গৃহ দখল করিতে পারিবে না।

চতুর্থ—যথেচ্ছভাবে তল্লাসী নিষিদ্ধ করা হয়।

পঞ্চম—জুরীর উপস্থিতি ভিন্ন গুরুতর ফৌজদারী অপরাধের সওয়াল গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়। সামরিক বাহিনীর বিচারে এই নিয়ম অবশ্য প্রযোজিত হইবে না বলিয়া প্রস্তাবে বলা হয়।

ষষ্ঠ—সকল ফৌজদারী মামলার দ্রুত সওয়াল হইবে ও নিরপেক্ষ জুরীর সাহায্যে বিচার পরিচালিত হইবে।

সপ্তম—কুড়ি ডলারের উপর যে সকল মামলার মূল্য নির্ধারিত হইবে সেই সকল মামলায় জুরি প্রথা প্রবর্তিত হইবে।

অষ্টম—অতিরিক্ত জরিমানা বা জামিন নিষিদ্ধ হয়।

নবম—সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার জনসাধারণের সংরক্ষিত অধিকারকে অবমাননা করিবে না।

দশম—যে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্পণ করা হয় নাই এবং অংগরাজ্যগুলির প্রতি নিষিদ্ধ করা হয় নাই সেইগুলি অংগরাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত হইবে।

একাদশ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার প্রয়োগ সম্বন্ধীয়।

দ্বাদশ—রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্বন্ধীয়।

ত্রয়োদশ—দাসপ্রথা উচ্ছেদকল্পে এই প্রস্তাব আনয়ন করা হয়।

চতুর্দশ– যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত।

পঞ্চদশ– জাতি ও বর্ণবিচারের দ্বারা নাগরিক অধিকার সংকুচিত করা হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

ষোড়শ—কংগ্রেসের কর ধার্য ও কর আদায় সম্পর্কিত।

সপ্তদশ—সিনেটের সদস্য নির্বাচন ও গুণাবলী সম্পর্কিত।

অষ্টাদশ—মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত।

উনবিংশ—স্ত্রীপুরুষ নির্বিচারে ভোটের অধিকার প্রদান করা স্থির হয়।

বিংশ—২০শে জানুয়ারী দ্বিপ্রহরে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির এবং ৩রা জানুয়ারী কংগ্রেসের সদস্যদিগের কার্যকাল সমাপ্তি দিবস হইবে বলিয়া স্থির করা হয়। আরো স্থির হয় বৎসরে অন্ততঃ একবার কংগ্রেসের অধিবেশন বসিবে।

একবিংশ—মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত প্রস্তাব।

দ্বাবিংশ—পর পর দুইবারের অধিক কোন একই ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হইবেন না।

সংশোধন পদ্ধতির কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনাও করা হইয়াছে। সমালোচনায় বলা হয় যে অংগরাজ্যগুলির সমর্থনের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় স্থির না থাকায় দীর্ঘসূত্রতা দেখা দিতে পারে ও সংশোধন প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইতে পারে।

ইহা ব্যতীত মাত্র এক-তৃতীয়াংশের কিছু অধিক অংগরাজ্যগুলি বিপক্ষে গেলে সংশোধন প্রস্তাব বানচাল হইয়া যায় বলিয়া এই পদ্ধতিতে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় বলিয়া অভিযোগ করা হয়।

সংশোধন পদ্ধতি অতীব জটিল, দুরূহ ও মন্থরগতিসম্পন্ন বলিয়া কেহ কেহ সমালোচনা করিয়াছেন। প্রয়োজন অনুসারে সংবিধানে পরিবর্তন সাধন সহজসাধ্য নহে ফলে প্রয়োজন ও কালের গতির সহিত সমান পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়া মার্কিন শাসনতন্ত্রের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

সংশোধনের ব্যাপারে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারেনা ফলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রবর্তনে বাধাসৃষ্টি হয়।

এতদ্ব্যতীত সুপ্রীমকোর্ট আইনের বৈধতা, সাংবিধানিক সংগতি বিচারের একমাত্র অধিকারী। অতএব আইনসভাসমূহের অধিকাংশের সমর্থন লাভ করা সত্বেও সুপ্রীমকোর্টের বিরোধিতার ফলে সংশোধন প্রস্তাব বাতিল হইয়া যাইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রপতি

[রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি—গুরুত্ব, ক্ষমতা ও কার্য]

রাষ্ট্রপতিই হইলেন মার্কিন শাসন-ব্যবস্থার মধ্যমণি। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতির শাসন চালু আছে। সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, "All executive powers shall be vested in a President of the United States"। অতএব আইনগত ভাবে শাসকপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতির হস্তে সকল শাসন সংক্রান্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত।

রাষ্ট্রপতির গুরুত্ব

চারি বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থীকে অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক, জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিক হইতে হইবে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার পূর্বে চৌদ্দ বৎসরের জন্য আমেরিকায় বসবাস করিতে হইবে। ১৭৮৮ সালের ৪ঠা মার্চ রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করিবার জন্য কংগ্রেস ওয়াসিংটনকে নির্দেশ দান করেন। বর্তমানে বিংশতম সংশোধন প্রস্তাবক্রমে প্রতি চারিবৎসর পরে ২০শে জানুয়ারী দ্বিপ্রহরকাল হইতে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শুরু হয়।

নির্বাচনের নিয়মাবলী

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনঃ- মার্কিন সংবিধান রচয়িতাগণের ইচ্ছা ছিল রাষ্ট্রপতির সহিত দলীয় প্রথার যোগ না রাখা। দলীয় প্রথার কুফলগুলি হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলীয় প্রভাব-মুক্ত এক পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি ব্যবস্থার উদ্ভব করা হয়। আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হইলে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের ক্রীড়নকরূপে অবস্থান করিবে এই আশংকা প্রকাশ করা হয়। প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে দলীয় ব্যবস্থার জটিলতা উগ্রভাবে প্রকাশ পাইবে আশংকা করায় ঐ ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয় এবং পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানান হয়।

রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রত্যেক অংগরাজ্যে, কংগ্রেসে ঐ রাজ্যের প্রতিনিধির সমসংখ্যক নির্বাচক মিলিত হইয়া রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য নির্বাচক সংস্থা সৃষ্টি করেন এবং উক্ত সংস্থা হইতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। প্রত্যেক অংগরাজ্যের রাজধানীতে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় বুধবারের পর প্রথম সোমবারে নির্বাচকগণ মিলিত হন এবং গোপন ব্যালটে ভোট প্রদান করেন। ইহার পর নির্বাচনের ফল সংক্রান্ত তিনটি প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হইলে একটি জিলা কোর্টে ও অপর দুইটি ওয়াশিংটনে সিনেটের সভাপতির নিকট প্রেরণ করা হয়। জানুয়ারী মাসের ছয় তারিখে কংগ্রেসের উভয় পরিষদ মিলিত হইয়া ভোট গণনার কাষ শুরু করে এবং যদি কোন প্রার্থী নির্বাচক সংস্থার (electoral college) অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভে সমর্থ হন তাহা হইলে ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যসংখ্যা সমর্থিত প্রার্থীকে রাষ্ট্রপতি পদে অলংকৃত করা হয়। কিন্তু কেহ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে অসমর্থ হইলে নিম্নতম কক্ষ (House of Representatives) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে। ৪ঠা মার্চের মধ্যে নিম্নকক্ষ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সমর্থ না হইলে উপরাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতি পদে আহ্বান জানান হয়।

পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা

সংবিধান প্রণেতাগণের ইচ্ছা যাহাই থাকুক না কেন সাম্প্রতিককালে এই পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায়ও দলীয় প্রভাব সবিশেষ অনুভব করা যায়। বস্তুতঃ বর্তমানকালে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকালে সমগ্র আমেরিকায়, শুধু আমেরিকায় কেন সমগ্র বিশ্বে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নির্বাচক সংস্থার সদস্যগণ দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হন এবং দলীয় প্রার্থীকে রাষ্ট্রপতি পদে সমর্থন জানান। মার্কিন শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এক মহা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহা প্রতি নাগরিক, শ্রেণী ও সমগ্র জাতির জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। যথার্থই বলা হইয়াছে, "It is an operation of the first magnitude putting at stake the ambitions of individuals, the interests of classes and the fortunes of the entire country"। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকালে হোয়াইট হাউসে বসবাসী রাষ্ট্রপতি হইতে রাজ্যের নগণ্যতম নাগরিককে

নির্বাচনে দলীয় প্রভাব

অনুপ্রাণিত হইতে, অংশগ্রহণ করিতে দেখা যায়। নির্বাচনকে উপলক্ষ করিয়া এক আলোড়ন সৃষ্টি হইয়া যায়। সংবাদপত্রের বিরামহীন সংবাদ বিতরণ, ক্যামেরার সংখ্যাহীন ফটো প্রকাশ, টেলিভিসনের বিরামহীন প্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে নির্বাচন চলিতে থাকে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্তমানে আমেরিকার পারস্পরিক বিরোধী আদর্শের দল দুইটির সংঘাত মাত্র নহে, মার্কিন রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের উপর পৃথিবীব্যাপী আদর্শগত প্রভেদের জয় পরাজয় নির্ভর করে। পৃথিবীর বহুসংখ্যক রাষ্ট্র মার্কিন শিবিরের অন্তর্ভুক্ত, ফলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাহাদেরও যথেষ্ট উৎকণ্ঠা থাকে।

অতীতে একই ব্যক্তির পক্ষে দুই বা ততোধিক বার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইবার পথে কোন সংবিধানগত বাধা ছিল না, বর্তমানে দ্বাবিংশতিতম সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইবার ফলে একই ব্যক্তির দুইবারের অধিক রাষ্ট্রপতিপদে আসীন হওয়া অসম্ভব হইয়াছে। জর্জ ওয়াশিংটন প্রথম এই প্রথার নজীর স্থাপন করেন। অবশ্য রুজভেল্ট এই নজীরের ব্যতিক্রম ছিলেন।

দ্বাবিংশতিতম সংশোধন প্রস্তাবের ফল

নির্বাচিত হইবার পর রাষ্ট্রপতিকে শপথ গ্রহণ করিতে হয়। রাষ্ট্রপতির কার্য বিশ্বস্তভাবে পালন করিবেন ও মার্কিন সংবিধানের যথাযোগ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন: "I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States." সাধারণতঃ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতিকে শপথ গ্রহণ করান।

শপথ গ্রহণ

রাষ্ট্রপতির সম্মানহেতু রাষ্ট্রপতির স্ত্রীকে সামাজিক মর্যাদাদানপূর্বক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মহিলা (First Lady) বলিয়া অভিহিত করা হয়। রাষ্ট্রপতি বাহিরে গমন করিলে হোয়াইট হাউসের পতাকা অবনমিত করা হয়। ট্রেজারী বিভাগের গুপ্তদল সাদা পরিচ্ছদে রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষীর কার্য করেন। রাষ্ট্রপতির সম্মানের উদ্দেশ্যে একুশবার তোপধ্বনি করা হয়। রাষ্ট্রপতি বৎসরে একলক্ষ ডলার

রাষ্ট্রপতির সম্মমর্যাদা

বেতন পান এবং সরকারীভাবে হোয়াইট হাউসে অবস্থান করেন। ভ্রমণ, আমোদ প্রমোদের জন্য রাষ্ট্রপতি অতিরিক্ত ৫০ হাজার ডলার বৎসরে পান। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রপতির খরচের নিমিত্ত বিশেষ আপৎকালীন অর্থ-ভাণ্ডার সঞ্চিত আছে।

রাষ্ট্রপতির অপসারণ ব্যবস্থা

পদত্যাগকালে, সেক্রেটারী অব দি স্টেটকে উদ্দেশ্য করিয়া রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। দেশদ্রোহিতা, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি দুর্নীতিমূলক অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য রাষ্ট্রপতিকে ইম্‌পিচমেণ্ট পদ্ধতি দ্বারা পদচ্যুত করা সম্ভব। এই বিচারকার্য একমাত্র সিনেট পরিচালনা করে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্য

মার্কিন সংবিধান রাষ্ট্রপতির হস্তে শাসন সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, "The Executive power shall be vested in a President of the United States."। কংগ্রেস প্রণীত আইন ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি দ্বারা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। আপন মহিমায় মহিমান্বিত আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট এক অপরূপ ক্ষমতাসম্পন্নরূপে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে মার্কিন রাষ্ট্রপতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। Strongএর মতে, "In no other constitutional state in the world today does there exist an officer with such vast powers as those of the President of the American Union."

শাসক-প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি

কংগ্রেস প্রণীত আইনগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ ও কার্যকর করা রাষ্ট্রপতির অন্যতম দায়িত্ব। কোন আইনকে রাষ্ট্রপতি স্থগিত বা দীর্ঘদিন অকার্যকর করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে পারেন না। এ্যাটর্নী জেনারেলের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি আইন কার্যকর করিবার প্রয়াস পান। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধান অবমাননাকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি এ্যাটর্নী

জেনারেলকে নির্দেশ দান করিতে পারেন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিপ্লব ঘটিলে রাষ্ট্রপতি সৈন্যদল আহ্বান করিতে সমর্থ। ডাক ও তার ব্যবস্থা প্রতিহত হইলেও তিনি সৈন্য তলব করিতে পারেন এবং বস্তুতঃ সন্ত্রাসবাদী কার্য প্রতিরোধ কল্পে রাষ্ট্রপতি ক্লিভল্যাণ্ড ও উইলসন এবং হার্ডিং সৈন্যবাহিনী তলব করিয়াছিলেন।

নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগের সকল কর্মচারী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সংবিধানে বলা হইয়াছে সুপ্রীমকোর্টের বিচারক, রাষ্ট্রদূত, মন্ত্রী প্রভৃতি সকল গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কর্মচারিবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবে। এই সকল নিয়োগের ব্যাপারে অবশ্য রাষ্ট্রপতি সিনেটের পরামর্শ ও সম্মতি গ্রহণ করেন। শাসন সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধি পাইবার ফলে বর্তমানে রাষ্ট্রপতির পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে সকল নিয়োগের ব্যবস্থার তদারক করা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের উপর তিনি কতকাংশে নিয়োগের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। দলীয় প্রথার ফলে, নিয়োগের ব্যাপারে দলের সদস্যদিগের প্রাধান্য দেওয়া স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হয়। সংবিধান অনুসারে উর্ধ্বতন (superior) কর্মচারিগণকে নিয়োগ করিবার সময় রাষ্ট্রপতিকে অবশ্য সিনেটের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু বর্তমানে সিনেটের সৌজন্যমূলক আচরণ ব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে সাধারণতঃ সিনেট আপত্তি জানান না। অংগরাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারী নিয়োগকালে রাষ্ট্রপতি উক্ত অংগরাজ্যের সিনেট প্রতিনিধির মতামত গ্রহণ করিয়া সৌজন্যের পরিচয় প্রদান করেন।

সিনেটের অধিবেশন স্থগিত থাকা কালে অস্থায়ীভাবে সিনেটের অধিবেশন পুনরায় শুরু না হওয়া পর্যন্ত কর্মচারী নিজ ক্ষমতাবলে নিয়োগ করিতে পারেন (recess appointment)। সিনেটের অধিবেশন শুরু হইলে পর ঐ নিয়োগগুলি সিনেটের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়।

রাষ্ট্রপতির সরকারী কর্মচারীকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা

সিনেটের বিনা অনুমোদনে রাষ্ট্রপতি যে কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত করিতে পারেন। অবশ্য সুপ্রীমকোর্টের বিচারক, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত

বিভিন্ন বোর্ডের সদস্য ও বেসামরিক স্থায়ী সরকারী কর্মচারিগণকে তিনি সরাসরি পদচ্যুত করিতে অসমর্থ।

সর্বাধিনায়ক হিসাবে রাষ্ট্রপতি

সমগ্র রক্ষিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে রাষ্ট্রপতি অধিষ্ঠিত। সংবিধানে বলা হইয়াছে, "The President shall be Commander-in-chief of the Army and Navy of the United States and the militia of the several States"। প্রয়োজন অনুসারে তিনি সৈন্যবাহিনীকে নানা কার্যে নিয়োগ করিতে পারেন। সিনেটের অনুমোদনক্রমে তিনি নৌ-বাহিনী ও স্থলবাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করিতে সক্ষম এবং যুদ্ধের পর তিনি তাঁহাদের পদচ্যুতও করিতে পারেন। যুদ্ধের সময় বিজিত অঞ্চলে রাষ্ট্রপতি একনায়কের ন্যায় শাসন করিতে সক্ষম। ১৯১৭ সাল ও ১৯৪২ সালের যুদ্ধ জনিত ক্ষমতা আইনের বলে (War Powers Act) রাষ্ট্রপতি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছেন। বলা হইয়াছে, "Both these Acts combined give the President the greatest power ever granted to any chief executive of the world."

বৈদেশিক ও কূটনীতি সংক্রান্ত ব্যাপার

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিই একমাত্র সরকারী মুখপাত্র। বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি পরিচালনা ও তদারক করিবার মহান দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হস্তে সমর্পিত। তিনি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ও গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত আলাপ আলোচনা চালান।

কোন বিদেশী রাষ্ট্রদূত বা মন্ত্রীকে বহিষ্কার অথবা অপমান করিয়া তিনি এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারেন যাহাতে যুদ্ধ বা সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদনে সমর্থ। অবশ্য ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলে তিনি অপর রাষ্ট্রের সহিত শাসনবিভাগীয় বুঝাপড়ার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি গোপন কূটনৈতিক সম্পর্ক গঠন করিতে সক্ষম। বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। ১৯০৫ সালে

রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট জাপানের সহিত প্রাচ্যের কতক ব্যাপারে গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির বিষয় আমেরিকাবাসী রুজভেল্টের মৃত্যুর পর অবহিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে সন্ধি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রপতি বিদেশী অঞ্চল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এইভাবে টেক্সাস অন্তর্ভুক্ত হয়।

আইন বিষয়ক ক্ষমতা

পূর্বেই বলা হইয়াছে মার্কিন শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসৃত হইয়াছে ও ফলে রাষ্ট্রপতির আইন বিষয়ক ক্ষমতা স্বাভাবিক অবস্থায় (normal circumstances) কিয়ৎ পরিমাণে সীমিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের সদস্য নহেন, কংগ্রেস দ্বারা নির্বাচিতও নহেন। তিনি পরিষদ সভায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করেন না বা স্বীয় উদ্যোগে কোন সরকারী বিল উত্থাপন করিতে পারেন না। তিনি পরিষদ আহ্বান বা স্থগিত করিতে বা ভাঙ্গিয়া দিতে অসমর্থ। অবশ্য দলীয় প্রথার উদ্ভব ঘটায় যদি উভয় পরিষদে রাষ্ট্রপতির দলের সদস্য সংখ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তবে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী যে কোন বিল কংগ্রেসে পাস করান সম্ভব হয়। এতদ্ব্যতীত সময় সময় রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ এবং তদ্ সাহায্যে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করেন। রাষ্ট্রপতি যে কোন বিলকে নাকচ (veto) করিতে পারেন। অবশ্য রাষ্ট্রপতি কতৃক পরিত্যক্ত হইয়া ঐ বিল যদি পুনরায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা কংগ্রেসে সমর্থিত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদানে বাধ্য হইবেন। এইভাবে রাষ্ট্রপতি তাড়াহুড়া করিয়া কোন বিল প্রণয়ন প্রতিরোধ করেন। রাষ্ট্রপতি পকেট ভেটোর (Pocket Veto) সাহায্যে বিল নাকচ করিতে পারেন। দশদিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যদি কোন বিলে সম্মতি না দেন এবং ঐ দশদিনের মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত হইয়া যায় তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবে বিলটি পরিত্যক্ত হয়। শাসনবিভাগ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নানা বিধি নির্ণয়ে রাষ্ট্রপতি প্রয়াস পান।

বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি দণ্ড মার্জনা বা দণ্ডাদেশ হ্রাস করিবার ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম। এই ক্ষমতা সাধারণতঃ প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানের থাকে।

বলিষ্ঠ চরিত্র ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হইলে একনায়কের ন্যায় শাসনে সক্ষম হইবেন বলিয়া আশা করা অন্যায় হইবে না।

রাষ্ট্রপতি ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী (The President of America and the Prime Minister of England)

বর্তমান পৃথিবীর শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়করূপে পরিচিত। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উভয়ই পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি এক নির্বাচক সংস্থার মাধ্যমে ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আইনসভার মাধ্যমে নির্বাচিত হন। কিন্তু উভয়ই একই শাসনতান্ত্রিক কাঠামোয় নির্বাচিত হন না। ব্রিটেনে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় প্রধানমন্ত্রীকে পার্লামেন্টের সদস্যপদ গ্রহণ ভিন্ন সকল কার্যের জন্য পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থার জন্য মাকিন রাষ্ট্রপতিকে আইনসভার নিকট দায়ী থাকিতে হয় না। এতদ্ব্যতীত ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির জন্য আইনসভার সহিত শাসনবিভাগের কোন যোগসূত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পরিলক্ষিত হয় না।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি সম্বন্ধে লাস্কি বলিয়াছেন, "The President of U. S. A. is both more or less than a king, he is also both more or less than a Prime Minister". লাস্কির এই উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পদমর্যাদার দিক দিয়া মাকিন রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা উন্নত বলিয়া বিবেচিত হইবেন। কারণ রাষ্ট্রপতি কেবল শাসকই নহেন তিনি রাষ্ট্রপ্রধান। ক্যাবিনেটের সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী এবং প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট সভার অন্যান্য সদস্যদিগের সহিত যৌথভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকেন। কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের নিকট দায়ী থাকেন না এবং ক্যাবিনেট সভার সদস্যগণ তাঁহারই অধীনস্থ কর্মচারী।

বস্তুতঃ শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে মাকিন রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা অনেক অধিক। Ogg বলিয়াছেন, "He is the foremost ruler of the world"। তিনিই যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শাসক এবং তিনিই সামরিকবাহিনীর অধিকর্তা। রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন, মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীদিগকে মনোনয়ন করেন। তিনি স্বেচ্ছায় সরকারী কর্মচারিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন এবং যুদ্ধের সময় তিনি প্রভূত

ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন। সমগ্র শাসন বিভাগের জন্য একমাত্র রাষ্ট্রপতিই দায়ী থাকেন।

পার্লামেণ্টারী প্রথা ও দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থায় দলীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য। প্রধানমন্ত্রী নিজের দলের মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে সক্ষম নহেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে দলের প্রভাবমুক্ত না হইলেও প্রয়োজনে দলকে উপেক্ষা করিয়া জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করিতে পারেন। কিন্তু দলকে উপেক্ষা করা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে অসম্ভব। কারণ কমন্স সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবেই তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন। বস্তুতঃ আবার এই দলীয় প্রথার জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী প্রভূত ক্ষমতার অধিকার লাভ করেন। কমন্স সভায় অধিকাংশের সমর্থন যতদিন প্রধানমন্ত্রী লাভ করিতে সক্ষম হন ততদিন শাসনতান্ত্রিক শাসক্ হিসাবে এমন অনেক কাজ করিতে পারেন যাহা মার্কিন রাষ্ট্রপতির পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব। Ramsay Muir বলেন, "He can give a pledge beforehand that such a treaty will be signed and ratified, and that such a law shall be passed or that such and such money shall be voted by the Parliament"। বস্তুতঃ দলীয় প্রথার জন্য ইংলণ্ডে ক্যাবিনেট একনায়কতন্ত্রের বীজ বপন করা সম্ভব হইয়াছে এবং ক্যাবিনেট সভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন।

অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বাজেট প্রণয়ন করিয়া কংগ্রেসে দাখিল করিবার অধিকার ভোগ করেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে ব্রিটেনে রাজস্ববিভাগের চ্যান্সেলর এই কার্য সম্পাদন করেন। কংগ্রেস ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্রপতির খসড়ার আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে পারে কিন্তু ক্যাবিনেট প্রথায় শাসিত ইংলণ্ডে, প্রধানমন্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্ট সাধারণতঃ যায় না।

আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে মার্কিন রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বিশেষ অধিক। বলা হইয়াছে, "Under all normal circumstances an American President must envy the legislative position of the British Prime Minister." ক্যাবিনেট

সভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী সহকর্মীদের সহিত একসাথে আইনের খসড়া প্রণয়ন করেন, আইনসভায় উহা উপস্থাপিত করেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে কমন্স সভায় উহা পাস করান। আইনের ভাল মন্দের জন্য ইংলণ্ডবাসী প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী করিবেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতির এইরূপ আইনসংক্রান্ত কোন ক্ষমতাই নাই। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসরণের ফলে আইনসংক্রান্ত সকল ক্ষমতা হইতে রাষ্ট্রপতি বঞ্চিত।

উপরাষ্ট্রপতি (Vice-President)

রাষ্ট্রপতি যে নিয়ম ও পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপরাষ্ট্রপতিও সেই নিয়মে নির্বাচিত হন। তিনিও রাষ্ট্রপতির ন্যায় চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। উপরাষ্ট্রপতিই মার্কিন সেনেট সভার সভাপতি এবং রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে ঐ পদাধিকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্যাবিনেট

(Cabinet)

[রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুসারে ক্যাবিনেট সভা গঠিত হয় ও কার্য সম্পাদন করে]

আমেরিকার ক্যাবিনেটকে "রাষ্ট্রপতির পরিবার" বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে ("The Cabinet in America has been called the President's family")। পার্লামেণ্টারী প্রথায় সাধারণতঃ যে শক্তিশালী ক্যাবিনেট সভার সহিত আমরা পরিচিত, মার্কিন ক্যাবিনেট সভায় সে পরিচয় আমরা পাই না। বস্তুতঃ মার্কিন ক্যাবিনেট আইনসভার সৃষ্ট না হইয়া রাষ্ট্রপতি দ্বারা সৃষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট হইল রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেট সভার সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতির সহিত সমমর্যাদার অধিকারী নহে, তাহারা রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ কর্মচারী।

"রাষ্ট্রপতির পরিবার"

ক্যাবিনেট সভার সদস্যবৃন্দকে আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন এবং সর্বদা নিজ দলের সদস্যদিগের মধ্য হইতে সদস্য মনোনয়ন নাও করিতে পারেন। বিভিন্ন বিভাগীয় সচিবদিগের সমন্বয়ে ক্যাবিনেট সভা গঠিত হয়। ক্যাবিনেট সভার সদস্যগণ কংগ্রেসের সভা অথবা কংগ্রেসের নিকট দায়ী নহেন। শাসনব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রপতি নিজেই দায়ী থাকেন এবং ঐ দায়িত্ব ক্যাবিনেট সভার সদস্যদিগের মধ্যে বণ্টন করিতে অসমর্থ। বস্তুতঃ ক্যাবিনেট সভা রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদ হিসাবে বিরাজমান। যথার্থই বলা হইয়াছে, "The cabinet is a mere creation of the President's will. It is an extra-statutory and extra-constitutional body. It exists only by custom. If the President desired to dispense with it he could do so." ক্যাবিনেট সভার অধিবেশনসমূহের

ক্যাবিনেট সভার সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত

আলোচনা হইলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্বয়ং রাষ্ট্রপতিই করেন। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে ক্যাবিনেট সভার পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন আবার নাও পারেন।

১৭৮৯ সালে যখন ক্যাবিনেট সভার প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সেই সময় কংগ্রেস এইরূপ একটি সভার অস্তিত্বের কথা গুরুত্ব দিয়া চিন্তাও করে নাই। পূর্বে সিনেট সভাই রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদ হিসাবে কার্য করিতেছিল। ওয়াশিংটন তাঁহার চারিজন বিভাগীয় সচিবকে বিশ্বস্ত উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করিবার পর ধীরে ধীরে ১৭৯৩ সালে ক্যাবিনেট শব্দের সহিত মার্কিনবাসী পরিচিত হয়।

ক্যাবিনেট সভার অধিবেশনে কদাচিৎ ভোট গৃহীত হয়

ক্যাবিনেট সভার আলোচনায় কদাচিৎ ভোট গ্রহণ করা হয়। এই ভোট গ্রহণের ফলে যদি দেখা যায় রাষ্ট্রপতির মতের বিরুদ্ধে অধিকাংশ সদস্য মত প্রকাশ করিয়াছে তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে অধিকাংশের মতকে উপেক্ষা করিয়া রাষ্ট্রপতির মতকে কায়েম করা হয়। এক সময়ে এব্রাহাম লিঙ্কন আনীত কোন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ক্যাবিনেটের অধিকাংশ সদস্য ভোট প্রদান করে। লিঙ্কন বলেন, "এইস্থলে দেখা যাইতেছে সাতজনের মত নেতিবাচক একজনই কেবল পক্ষে, আমি পক্ষে মত দিয়া এই বিতর্কের অবসান ঘটাইতেছি"।

পরিবারে গৃহকর্তাই যেমন প্রকৃত অধিকর্তা এবং পরিবারের অন্যান্য সভ্য গৃহকর্তার আজ্ঞাবহ মাত্র সেই প্রকারে রাষ্ট্রপতিই মার্কিন শাসন-ব্যবস্থায় শ্রেষ্ঠ নেতা, ক্যাবিনেট সদস্যগণ তাঁহারই সৃষ্টি ও আজ্ঞাবহ সদস্য।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ও মার্কিন ক্যাবিনেট

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সভা ও মার্কিন ক্যাবিনেট সভা উভয়েরই কোন আইনগত অস্তিত্ব নাই। প্রথা ও রীতিনীতির মধ্য দিয়া উভয়ের জন্ম। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "The Cabinet lives and acts simply by understanding."...। মার্কিন ক্যাবিনেট সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। "In the written Constitution there is no mention of a Cabinet"...।

কিন্তু উৎপত্তির দিক হইতে একমাত্র মিল ভিন্ন ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ও মার্কিন ক্যাবিনেটের মধ্যে অপর কোন বিষয়ে কোন মিল লক্ষ্য করা যায় না। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থায় ক্যাবিনেট সভা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার সহিত মার্কিন ক্যাবিনেটের কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না। ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার মধ্যমণি হইল ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেট ভিন্ন ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িবে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটের উপস্থিতি বা অভাব কোনটাই প্রভাব বিস্তার করিবে না। আমেরিকার ক্যাবিনেট রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্য-সংখ্যা প্রায় ২০ হইতে ২৫ জন। কিন্তু সেই তুলনায় মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্য-সংখ্যা নিতান্তই কম। ব্রিটেনে ক্যাবিনেট সভার সকল সদস্য পার্লামেণ্টের সভ্য কিন্তু আমেরিকায় ক্যাবিনেট সদস্য কংগ্রেসের সদস্য হইতে অসমর্থ। ইংল্যাণ্ডে ক্যাবিনেট সদস্যগণ পার্লামেণ্টে উপস্থিত থাকেন, বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন, ভোট প্রদান করেন কিন্তু মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যদিগের এইরূপ কোন অধিকার নাই।

একই দলের সদস্যদিগের মধ্য হইতে ব্রিটেনে ক্যাবিনেট সভার সদস্য গ্রহণ করা হয় কিন্তু আমেরিকায় বিভিন্ন দলের সদস্যদিগের লইয়া ক্যাবিনেট গঠিত হইতে পারে।

ব্রিটেনে প্রধান মন্ত্রী ক্যাবিনেট সভার সদস্য ও নেতা এবং অন্যান্য সদস্যগণ তাঁহার সহকর্মী, কিন্তু আমেরিকায় প্রকৃত শাসক রাষ্ট্রপতি স্বয়ং এবং ক্যাবিনেট সভার সদস্যবৃন্দ তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট কমন্স সভার নিকট যৌথভাবে সকল কার্যের জন্য দায়ী কিন্তু আমেরিকায় শাসন সংক্রান্ত সকল কাজের জন্য একমাত্র রাষ্ট্রপতিই দায়ী। মার্কিন ক্যাবিনেটকে কোন কার্যের জন্য জবাবদিহি করিতে হয় না এবং আইনগত দিক দিয়া কোন গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। এক সময় রাষ্ট্রপতি জ্যাকসন ক্যাবিনেট সভায় কোন বিষয় বক্তৃতা করেন। সিনেট সভা রাষ্ট্রপতির উক্ত বিবৃতির সারমর্ম জানিতে চাহিলে, রাষ্ট্রপতি জ্যাকসন সিনেট সভার এই অনধিকার চর্চাতে বিস্মিত হইয়া বলেন, "I have yet to learn under what constitutional authority that branch of the legislature has a right to require of me an account of

any communication, either verbally or in writing made to the heads of the departments acting as Cabinet Council." । ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট অনাস্থা জ্ঞাপন করিলে ক্যাবিনেটের পতন ঘটে কিন্তু আমেরিকায় রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুসারে ক্যাবিনেটের অস্তিত্ব ও পতন নির্ভর করে।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট তাত্ত্বিক দিক দিয়া না হইলেও কার্যক্ষেত্রে প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। রাজার নামে যে সকল কার্য পরিচালিত হয় ও আদেশ প্রদান করা হয় তাহার প্রতিটিতে কোন না কোন ক্যাবিনেট সভার সদস্যের সহি থাকে এবং বস্তুতঃ উক্ত মন্ত্রীই ঐ কার্য বা আদেশের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন, ক্যাবিনেট সভার বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হন।

এতদ্ব্যতীত কমন্স সভার সহিত মতবিরোধ উপস্থিত হইলে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট জনগণের নিকট চরম আপীল দাখিল করিতে পারেন ও পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমন্স সভার সৃষ্টি করিতে সক্ষম। মার্কিন ক্যাবিনেট ইংলণ্ডের ক্যাবিনেটের সহিত তুলনীয় নহে। রাশিয়ার জারের (Czar) মন্ত্রিপরিষদের সহিত উপযুক্ত ভাবে মার্কিন ক্যাবিনেটের তুলনা সম্ভব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কংগ্রেস
(Congress)

[দ্বিপরিষদীয় আইন সভা, সিনেট ও জনপ্রতিনিধি সভার গঠন ও কার্য—পৃথিবীর অন্যতম উচ্চকক্ষ—জনপ্রতিনিধি সভার দুর্বলতার কারণ]

আমেরিকার আইনসভা কংগ্রেস নামে অভিহিত। দুইটি পরিষদের সমন্বয়ে কংগ্রেস গঠিত হইয়াছে। উর্ধ্বতন কক্ষের নাম Senate বা সিনেট ও নিম্নতন কক্ষ জনপ্রতিনিধি সভা বা House of Representatives নামে অভিহিত। সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদ অনুসারে আইন সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা কংগ্রেসকে সমর্পণ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, "All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives"।

দুইটি পরিষদের সমন্বয়ে কংগ্রেস গঠিত

সিনেট ও জনপ্রতিনিধি সভার সদস্যবৃন্দ জনসাধারণের ভোটের দ্বারা নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পর প্রথম মঙ্গলবার নির্বাচিত হয়। ৩রা জানুয়ারী দুই বৎসরের জন্য জনপ্রতিনিধি সভার অধিবেশন শুরু হয়। প্রতিবৎসর অন্ততঃ একবার অধিবেশন আহূত হয়। সাধারণতঃ কংগ্রেসের অধিবেশন দ্বিপ্রহর ১২টায় শুরু হয়।

সিনেট ও জনপ্রতিনিধি সভার গঠন

কংগ্রেসের সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন। সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা ব্যাপারে ও আপন কার্য বিশ্বস্তভাবে পরিচালনার জন্য সদস্যগণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। শপথ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা বলেন, "I do solemnly swear (or affirm) that I will support and defend the Constitution of the United States against

সদস্যবৃন্দের শপথ গ্রহণ

all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion and that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. So help me God."

সদস্যগণের অধিকার

বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি জঘন্য অপরাধ ভিন্ন অপর কোন কার্য অনুষ্ঠানের জন্য কংগ্রেসের সদস্যদিগের পরিষদের অধিবেশনকালে গ্রেপ্তার করা সম্ভব নহে। পরিষদে বক্তৃতার জন্য সদস্যদিগের কোনরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় না বা জবাবদিহি করিতে হয় না। কংগ্রেসের উভয় পরিষদেই দর্শকদিগের জন্য গ্যালারীর ব্যবস্থা আছে। দর্শকদের সভার কার্য অনুশীলন পূর্বক উচ্ছ্বাস প্রকাশের সুযোগ আছে কিন্তু কোনরূপ ফটো গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বৈদেশিক রাষ্ট্রনায়কগণ সৌজন্যমূলক ভাবে কংগ্রেসের অধিবেশনে বক্তৃতা করিবার সুযোগ লাভ করেন। ১৮২৭ সালে ফরাসী জেনারেল লাফায়তে (Lafayte) কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রথম বক্তৃতা করেন।

নির্দিষ্টক্ষমতা

ক্ষমতার দিক দিয়া কংগ্রেস সীমিত অধিকার লাভ করে। সংবিধান নির্দিষ্ট ক্ষমতা কংগ্রেসের হস্তে অর্পণ করিয়াছে। আইনসংক্রান্ত ব্যাপারেও কংগ্রেসের সকল ক্ষমতা দেখা যায় না। কারখানা ও শ্রমিক সম্পর্কিত সমস্যা, বৃদ্ধদিগের পেনসন প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের এক্তিয়ার বহির্ভূত।

কর আদায়

কংগ্রেস কর ধার্য ও আদায় করিতে সক্ষম। সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ও সাধারণ কল্যাণের জন্য ব্যয় মিটাইতে কংগ্রেস কর আদায় করিতে সক্ষম। অবশ্য অংগরাজ্যগুলির রপ্তানি ও স্থানীয় কর্মচারীদিগের বেতনের উপর কোন কর ধার্য করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নহে। আর্থিক ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা কংগ্রেসের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। মুদ্রার প্রস্তুতি ও প্রচলন ব্যবস্থ নিয়ন্ত্রণ করা কংগ্রেসের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

জনপ্রতিনিধি সভা (The House of Representatives)

দুই বৎসরের জন্য জনপ্রতিনিধি সভার নির্বাচন হয়। 'প্রতি ত্রিশ হাজার জনসংখ্যার জন্য এক একজন প্রতিনিধি নির্ধারিত করা হয়।

জনপ্রতিনিধি সভার সংগঠন

ভোট গ্রহণের ব্যাপারে সকল অংগরাজ্যে একই প্রকার রীতিনীতি অনুসরণ করা হয় না। সংশোধনী প্রস্তাবগুলির মাধ্যমে জাতি বর্ণ ধর্ম ও স্ত্রীপুরুষ নির্বিচারে সকলের ভোটাধিকার স্বীকার করা হইয়াছে।

প্রার্থীর গুণাবলী

জনপ্রতিনিধি সভার সদস্যপদ গ্রহণের জন্য প্রার্থীকে অন্যূন ২৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে এবং নির্বাচনের পূর্বে অন্ততঃ সাত বৎসর আমেরিকায় বসবাস করিতে হইবে। সদস্যপদ গ্রহণকালে সরকারী পদে আসীন হওয়া কোন সদস্যের পক্ষে সম্ভব নহে।

আইন প্রণয়ন

সাধারণ আইন প্রণয়ন ব্যাপারে সিনেটের সমতুল ক্ষমতা প্রতিনিধি সভা উপভোগ করে কিন্তু অর্থসংক্রান্ত সকল বিল প্রতিনিধি সভায় উদ্ভূত হয়। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে বিচারকার্য পরিচালনা করিবার, আবেদন আনয়নের ক্ষমতাও এককভাবে প্রতিনিধি সভা উপভোগ করে।

কমিটি ব্যবস্থা

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোন প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে অক্ষম হইলে প্রতিনিধিসভা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জনপ্রতিনিধি সভা প্রধানতঃ বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

সভার কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সদস্যের সংখ্যা হইল ২১৮ জন। স্পীকারই সরকারী বিলসমূহ উত্থাপন করেন এবং সংশ্লিষ্ট সদস্য বেসরকারী বিল উত্থাপন করেন।

স্পীকার (The Speaker)

নিয়োগ ব্যবস্থা

জনপ্রতিনিধি সভার সভাপতি স্পীকাররূপে অভিহিত। দুই বৎসরের জন্য জনপ্রতিনিধি সভার সদস্যবৃন্দ দ্বারা স্পীকার নির্বাচিত হন। একই দল শাসন ব্যবস্থায় কায়েম থাকিলে একই ব্যক্তি পুনরায় স্পীকারপদে নির্বাচিত হন। প্রতিনিধি সভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই দলের সদস্যই স্পীকার পদে নির্বাচিত হন।

আমেরিকার স্পীকার দল-নিরপেক্ষ নহেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অন্যতম মুখপাত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির পরেই স্পীকারের অবস্থান। জাতীয় শাসন ব্যবস্থায় স্পীকার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থায় পার্লামেণ্টারী প্রথার ন্যায় মন্ত্রিগণ আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না এবং প্রধানমন্ত্রী পদসৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। স্পীকার এই সকল অসুবিধা দূর করেন ও অভাব পূরণ করেন।

দল-নিরপেক্ষ নহেন

আমেরিকায় স্পীকার স্পষ্টভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন ও স্পীকার পদে নির্বাচিত হইবার পর স্বীয় দলের পক্ষে কার্য করিয়া চলেন। পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্ব স্পীকার গ্রহণ করেন। নির্বাচিত হইবার পর স্পীকার শপথ গ্রহণ করেন। তীব্র করতালি, আনন্দধ্বনি, রুমাল আন্দোলন প্রভৃতির মধ্যে ক্লার্কের নিকট হইতে স্পীকার হাতুড়ি (gavel) গ্রহণ করেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার স্বরূপ

কার্যাবলী ঃ

আমেরিকার স্পীকার প্রতিনিধি সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং কোন সদস্য কখন বক্তৃতা করিবেন তাহা নির্ধারণ করেন। এইভাবে তিনি প্রথমে দলের সদস্যদিগের বক্তৃতা করিবার সুযোগ প্রদান করেন। সময় নির্দিষ্ট করিয়া তিনি স্বীয় দলের পক্ষে বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। স্পীকারের অনুমতি ভিন্ন কোন সদস্য বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না।

বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করেন

পরিষদের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করা স্পীকারের অবশ্য কর্তব্য। হাতুড়ি পিটাইয়া ও সদস্যদিগকে তিরস্কার করিয়া তিনি সভায় শৃংখলা প্রবর্তনে চেষ্টিত হন। সভার নিয়ম ভঙ্গ করিলে সদস্যকে তিরস্কার এবং প্রয়োজনে সার্জেণ্টকে শাস্তি স্থাপনের আদেশ স্পীকার প্রদান করিতে পারেন।

নিয়ম-শৃংখলা রক্ষা

পরিষদের নিয়মাবলী ও রীতিনীতি ব্যাখ্যা ও প্রয়োগেব ব্যাপারে স্পীকার বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। নূতন নজীর স্থাপন করিয়া পরিষদের কার্যের গতিকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন।

ব্যাখ্যাকর্তা

স্পীকার অধিকার ও বৈধতার প্রশ্ন বিচার করেন এবং বিতর্কমূলক বিষয় ভোটে দেন ও ফলাফল ঘোষণা করেন। উভয়পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইলে তিনি নিজস্ব ভোট যে কোন দিকে প্রয়োগ করিতে পারেন ও সমস্যার সমাধানে সক্ষম হন।

বৈধতার প্রশ্ন

এই প্রসঙ্গে বলা যায় ক্ষমতার ব্যাপারে ব্রিটিশ স্পীকার ও আমেরিকার স্পীকারের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকিলেও প্রকৃতিগতভাবে উভয়ের মধ্যে এক মৌলিক পার্থক্য দেখা দিয়াছে। আমেরিকার স্পীকার দলীয় হইলেও ব্রিটিশ স্পীকার দল-নিরপেক্ষ। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সম্মতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনয়নে স্পীকার ব্রিটেনে নির্বাচিত হন। সাধারণতঃ স্পীকার পদপ্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। স্পীকার পদে আসীন হইবার সংগে সংগে দল-নিরপেক্ষতার কথা স্পীকার ঘোষণা করেন। এই নিরপেক্ষতাকে মর্যাদা দিবার জন্য ব্রিটেনে স্পীকারের নির্বাচনী এলাকায় বিরোধীদল কোন প্রার্থী উপস্থাপিত করে না এবং দল নির্বিশেষে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন দলের মন্ত্রিসভার অধীনে স্পীকার পদে নিয়োগ করা হয়। ব্রিটেনে স্পীকারকে আইন সংক্রান্ত কার্যাদি নির্বাহ বা দলের মুখপাত্র হিসাবে কার্য করিতে হয় না।

স্পীকারের পদ-মর্যাদা

সিনেট (The Senate)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ কক্ষ সিনেট নামে অভিহিত। জনসাধারণের ভোটে সিনেটের সদস্যগণ বিভিন্ন অংগরাজ্যগুলি হইতে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক রাজ্য দুইজন করিয়া সদস্য প্রেরণে সক্ষম।

মার্কিন উচ্চ পরিষদ

১৭৮৭ সালে দ্বিপরিষদীয় আইন সভা গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ উচ্চ পরিষদকে শক্তিশালী করিবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। ক্ষুদ্র এই পরিষদটিকে কেবল আইন সভায় রূপান্তরিত না করিয়া রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদ হিসাবে নিযুক্ত করিবারও প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভব হওয়ায় এই পরিকল্পনা ব্যাহত হয়।

ঐতিহাসিক উৎপত্তি

সিনেটরদিগের কার্যকাল ৬ বৎসর এবং প্রতি দুই বৎসর অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ সদস্য পদত্যাগ করেন। সিনেটর পদে নির্বাচিত হইবার জন্য প্রার্থীকে অন্যূন ৩০ বৎসর বয়স্ক, ৯ বৎসর যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও যে রাজ্যে নির্বাচন প্রার্থী সেই রাজ্যের বাসিন্দা হইতে হইবে।

সিনেটের সভ্যগণের কার্যকাল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি সিনেট সভার সভাপতি। সিনেট সভাও কমিটিগুলির মাধ্যমে কার্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকে।

সিনেটের সভাপতি

সিনেট সভা আইন সংক্রান্ত, শাসন সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা উপভোগ করিয়া থাকে। সিনেটের ক্ষমতা ও কার্য অনুশীলন করিলে বেশ বুঝা যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন উচ্চ পরিষদগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ কক্ষ সিনেট সভার প্রতিপত্তি সর্বাধিক।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী

সাধারণ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সিনেট, প্রতিনিধি সভার সমতুল ক্ষমতা উপভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু অর্থসংক্রান্ত বিল কেবলমাত্র প্রতিনিধি সভায় উদ্ভূত হইতে পারে। অবশ্য অর্থসংক্রান্ত বিল পরিবর্তন ও বাতিল করিবার ক্ষমতা সিনেট সভার আছে। সংশোধনী ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সিনেট আপন খুসীমত অর্থবিল পরিবর্তিত করিতে পারে।

আইন প্রণয়ন

শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার ব্যাপারে সিনেট সভা এমন কতকগুলি ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী যাহা প্রতিনিধি সভার কল্পনার বাহিরে। রাষ্ট্রপতির সমস্ত নিয়োগ ব্যবস্থা সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ। অবশ্য সৌজন্যমূলক আচরণের জন্য সাধারণতঃ সিনেট রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে আপত্তি করে না।

শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা

একমাত্র সিনেটই সন্ধির চূড়ান্ত অনুমোদন করেন। সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদন না করিলে চুক্তি কার্যকর হইবে না। সিনেটের বিনা অনুমোদনে চুক্তি স্বাক্ষর করিলে রাষ্ট্রপতিকে ঐ চুক্তি কার্যকর করিতে ক্লেশ অনুভব করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি উইলসন সিনেটের বিনা

সিনেট সন্ধির চূড়ান্ত অনুমোদন করে

অনুমোদনে লীগ অব নেশনস্ চুক্তিতে স্বাক্ষর দেন, পরে সিনেট সভা ঐ চুক্তি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিতে নারাজ হয়।

বিচারকার্য পরিচালনা

বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির অপরাধের জন্য বিচারকার্য পরিচালনা করা সিনেটের দায়িত্ব। সিনেট এইরূপ ক্ষেত্রে কর্মচারীদিগকে অপসারিত করিবার ক্ষমতা লাভ করে।

তদন্ত

সরকারী কর্মচারীদিগের বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত অনুষ্ঠিত করা সিনেটের কর্তব্য।

এই সকল কারণে সিনেটকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উর্ধ্বতন কক্ষ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র-প্রণেতাদিগের ইচ্ছানুসারে সিনেট এইরূপ শক্তিশালী পরিষদে রূপান্তরিত হইয়াছে।

সিনেটের প্রতিপত্তির পশ্চাতে কতকগুলি কারণ ঃ

প্রথমতঃ, সিনেটসভা অপেক্ষাকৃত মর্যাদাসম্পন্ন। সিনেটরগণ কেবলমাত্র রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন না, সমগ্র জাতির প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহারা প্রকাশ লাভ করেন। স্থানীয় সমস্যার উর্ধ্বে অবস্থানপূর্বক সামগ্রিকভাবে জাতীয় সমস্যা বিচারের সুযোগ গ্রহণ করে বলিয়া সিনেটের মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, সিনেটের সদস্যপদে মান্যগণ্য ব্যক্তিদিগকে নির্বাচিত করা হয় এবং তাঁহাদের নেতৃত্বে স্বভাবতঃই আস্থা স্থাপন করা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, সিনেট সভার গঠন সিনেটের মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিষদ বলিয়া সিনেটের পক্ষে সকল বিষয়ে সম্যক আলোচনা করা সম্ভব হয়। প্রতিটি অংগরাজ্য হইতে দুইজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে মোট একশত জনের এক ক্ষুদ্র পরিষদে আলোচনা অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে পরিচালিত হয়।

চতুর্থতঃ, সিনেট একরূপ চিরস্থায়ী পরিষদ। একই সময় ইহার সকল সদস্য অবসর গ্রহণ করে না। দুই বৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ অবসর গ্রহণ করে, ফলে শাসনব্যবস্থার সহিত সিনেটের সর্বদা যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব হয়।

পঞ্চমতঃ, সিনেটরগণ প্রতিনিধি সভার সদস্যদিগের ন্যায় প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

ষষ্ঠতঃ, সিনেট সভার পরিচালনা ব্যবস্থা ও রীতিনীতি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল। বিতর্কের ব্যাপারে সদস্যগণ অবাধ স্বাধীনতা লাভ করে।

সপ্তমতঃ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা একমাত্র সিনেটই কতকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। চুক্তি চূড়ান্ত অনুমোদন ও নিয়োগ ব্যবস্থার অনুমোদনসাধন করিয়া সিনেট রাষ্ট্রপতির কার্য ও ক্ষমতা কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

অষ্টমতঃ, মার্কিন রাষ্ট্রনায়কগণ জনপ্রতিনিধির সদস্যপদ হইতে সিনেটের পদকে অধিকতর কাম্য ও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন।

নবমতঃ, সিনেটরগণ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বক্তৃতা প্রদান করেন ও অহেতুক উচ্ছাসবর্জিত ভাবাবেগ সীমিত বক্তৃতা মর্যাদা আরোপ করে। ডি. টক্‌ভিল বলিয়াছিলেন "On entering the House of Representatives ot Washington one is stuck with the vulgar demeanour of that great assembly…the Senate is composed of eloquent advocates, distinguished generals, wise magistrates and satesmen of note whose language would at all times do honour to the most remarkable parliamentary debates of England."

মার্কিন সিনেট ও ব্রিটিশ লর্ডস সভা :

ব্রিটিশ লর্ডস সভা ও আমেরিকার সিনেট উভয়ই উচ্চ পরিষদ। এই দুইটি উচ্চ পরিষদের মধ্যে গঠন ও কার্যাদির দিক হইতে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক পরিলক্ষিত হয়। সিনেট সভার সদস্যবৃন্দ জনসাধারণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত এবং নিম্ন পরিষদের সহিত সমতুল্য বা কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষমতা উপভোগ করে। অপর দিকে লর্ডস সভার সদস্যবৃন্দ জন্মসূত্রে পদাধিকার অর্জন করেন এবং কালের গতির সংগে সংগে তাঁহাদের ক্ষমতার পরিধি যথেষ্ট পরিমিত হইয়াছে। নির্বাচিত প্রতিনিধি সভা নহে বলিয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোয় লর্ডস সভার গুরুত্ব সবিশেষ হ্রাস পাইয়াছে।

সিনেট সভা নির্বাচিত পরিষদ কিন্তু লর্ডস সভা নির্বাচিত প্রতিনিধি সভা নহে

গঠনের দিক দিয়া সিনেট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। প্রতি অংগরাজ্য হইতে দুইজন করিয়া প্রতিনিধির সমন্বয়ে মাত্র ১০০ জনের এই পরিষদে এক ঘরোয়া পরিবেশ সর্বদা বিরাজ করে। লর্ডস সভার সদস্য সংখ্যা বিপুল, প্রায় ৮৬১ জন। লর্ডস সভার সদস্যগণকে কয়েকটি শ্রেণীতে পদ ও বংশ-মর্যাদার ভিত্তিতে ভাগ করা যায়।

সিনেটের সদস্য সংখ্যা লর্ডস সভার সদস্য সংখ্যা হইতে অপেক্ষাকৃত কম

মার্কিন সিনেট সভার সভাপতি স্বয়ং মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি এবং ব্রিটিশ লর্ডস সভার সভাপতি লর্ড চ্যান্সেলর। সভাপতিত্ব ও ভোট গ্রহণ ব্যতিরেকে লর্ড চ্যান্সেলরের অপর কোন ক্ষমতা নাই।

সিনেট সভার সভাপতি

ক্ষমতা ও কার্যের দিক দিয়া সিনেট সভার গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি লর্ডস সভা অপেক্ষা অধিক। সিনেট সভা কেবলমাত্র একটি আইন সংক্রান্ত পরিষদই নহে, উহা আংশিকভাবে শাসনবিভাগীয় পরিষদে পর্যবসিত হইয়াছে।

সংবিধানেই বলা হইয়াছে, "All legislative powers herein granted shall be vested in a congress of the United States which shall consist of a Senate and a House of Representatives"। অতএব আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে সিনেট ও জনপ্রতিনিধি সভার সমান অধিকার ও প্রতিপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। সংবিধান রচয়িতাগণের ইচ্ছা ছিল ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলের সমতুল্য ক্ষমতা ও মর্যাদা সিনেটে আরোপ করা। সিনেটকে রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদস্বরূপ গণ্য করা হইয়াছিল।

সিনেট সভার আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা

সিনেট সভা রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ব্যবস্থার চূড়ান্ত অনুমোদন (ratify) জ্ঞাপন করেন। রাষ্ট্রপতি যে সকল সন্ধি বা চুক্তি সম্পাদন করেন তাহা সিনেট সভার অনুমোদন সাপেক্ষ। পরিশেষে ইহাও বলা যায় যে রাষ্ট্রপতির বিচার কার্য (impeachment) একমাত্র সিনেটই পরিচালনা করিবার যোগ্য অধিকারী।

নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা

ব্রিটিশ লর্ডস সভা এই প্রকারের কোন শাসন বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করেন না। অবশ্য বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে লর্ডস সভা মোটামুটি সিনেট সভার সমতুল ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। লর্ডস সভাই ইংলণ্ডের প্রধান আপীল আদালত।

বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা

আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার ব্যাপারেও লর্ডস সভা সিনেট সভা অপেক্ষা ন্যূন অধিকার লাভ করিয়াছে। উভয় সভাতেই অর্থসংক্রান্ত বিল উত্থাপন করা যায় না। অর্থসংক্রান্ত বিলের ব্যাপারে লর্ড সভার কোন ক্ষমতা নাই, কিন্তু আমেরিকায় সিনেট অর্থসংক্রান্ত বিলে সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। সাধারণ আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে উভয় পরিষদই নিজ নিজ দেশের নিম্ন পরিষদের সহিত সমান ক্ষমতা উপভোগ করে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে লর্ডস সভায় সাধারণতঃ কোন গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ বিল উত্থাপিত হইতে দেখা যায় না। Finer ঠিকই বলিয়াছেন, "The powers of the Senate are very great. Probably no second chamber in the world to-day has an influence so real and direct, not only in the most obviously national concerns such as foreign affairs but down to the very minutest business of federal legislation, including finance."

লর্ডস সভার আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা

জনপ্রতিনিধি-সভার দুর্বলতার কারণ

জনপ্রতিনিধি সভা (House of Representatives) আমেরিকার আইন সভার নিম্ন পরিষদ। কিন্তু পৃথিবীতে অবস্থিত অন্যান্য নিম্ন পরিষদগুলির সহিত তুলনা করিলে মার্কিন জনপ্রতিনিধি সভাকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মনে হয়। ব্রিটেনে কমন্স সভার প্রতিপত্তির সহিত মার্কিন জন প্রতিনিধি সভার কোন তুলনাই চলে না।

বস্তুতঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি-অনুসরণের ফলে, আইন বিভাগের সহিত শাসন বিভাগের কোন যোগসূত্র স্থাপিত হয় নাই, ফলে জনপ্রতিনিধি সভার নিকট শাসন বিভাগকে দায়ী রাখা হয় নাই। এইজন্য জনপ্রতিনিধি সভার ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় আইন সভার নিকট, বিশেষ করিয়া নিম্নপরিষদের

জনপ্রতিনিধি সভার নিকট শাসন বিভাগ দায়ী নহে

নিকট, শাসন বিভাগ দায়ী থাকে বলিয়া নিম্নপরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

মার্কিন জনপ্রতিনিধি সভায় সর্বজনস্বীকৃত কোন নেতা বর্তমান নাই। পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় নিম্ন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই প্রধান মন্ত্রী ও সামগ্রিকভাবে পরিষদের নেতারূপে সম্মানিত। তিনিই নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

সর্বজনস্বীকৃত নেতা নাই

জনপ্রতিনিধি সভার কার্যকাল স্বল্পস্থায়ী হওয়ায় ঐ সভার গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

স্বল্পস্থায়ী কার্যকাল

দলীয় সংহতি ও ঐক্যের অভাবও মার্কিন জনপ্রতিনিধি সভায় পরিলক্ষিত হয়, ফলে ঐ সভা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

দলীয় সংহতির অভাব

ব্রিটেনে কমন্স সভা অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বেসর্বা। লর্ডস সভার অর্থের ব্যাপারে কোন এক্তিয়ার নাই, কিন্তু সিনেট সভা জনপ্রতিনিধি সভায় উদ্ভূত অর্থসংক্রান্ত বিলকে সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করিতে পারে।

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা সিনেট কর্তৃক সংকুচিত হওয়া সম্ভব

জনপ্রতিনিধি সভার সদস্যসংখ্যা এতই অধিক যে ঐ সভার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুস্থিরভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। জনপ্রতিনিধি সভার সদস্যসংখ্যার আধিক্য হেতু জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে।

সংখ্যাধিক্যজনিত সমস্যা

সিনেট সভার সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ায় জনপ্রতিনিধি সভার মর্যাদা ও গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

কমিটি ব্যবস্থা

(The Committee System)

[আইনসংক্রান্ত জটিল বিষয়ে সাহায্যের জন্য কমিটি ব্যবস্থার প্রবর্তন]

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রপতি বা ক্যাবিনেট সভার পক্ষে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ফলে বিভিন্ন কমিটিগুলির হস্তে এই দায়িত্ব মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় সমর্পিত হইয়াছে।

মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় বহু কমিটির উদ্ভব হইয়াছে। কংগ্রেস কর্তৃক এই কমিটিগুলির সৃষ্টি করা হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ উভয় দলের সদস্যগণের সমন্বয়ে কমিটিগুলি সংগঠিত হয়। অবশ্য সকল কমিটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে। বিনিয়োগ কমিটি ও উপায় নির্ধারণী কমিটি হইল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। স্থায়ী কমিটিগুলির সংখ্যা অনেক হইলেও, ঐ কমিটিগুলির সদস্য সংখ্যা অনেক পরিমিত। সাধারণতঃ দুইজন হইতে পঁয়ত্রিশ জনের মধ্যে কমিটির সদস্য সংখ্যা সীমিত থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রবীণতম সদস্য এই কমিটিগুলিতে সভাপতিত্ব করেন। কমিটিগুলির আলোচনা ও সিদ্ধান্তের বিবরণ কংগ্রেসে দাখিল করা হয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হয়

সিলেক্ট কমিটির সদস্যগণকে কোন নির্দিষ্ট ব্যাপার পর্যালোচনা করিয়া দেখিবার জন্য স্পীকার নিয়োগ করেন।

আইন সম্বন্ধীয় কমিটি (Committee of Rules) কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হইবার পূর্বে রীতিনীতি নির্ধারণ করে।

সমগ্র কক্ষ কমিটি, রাজস্ব, বিনিয়োগ, বেসরকারী বিল প্রভৃতির পর্যালোচনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিটি ব্যবস্থায় বিশেষ করিয়া দলীয় ও আঞ্চলিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কমিটিই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিল উত্থাপন করে।

ব্রিটিশ ও আমেরিকার কমিটি ব্যবস্থার তুলনা

আমেরিকায় আইন প্রণয়নের কমিটি ব্যবস্থার যে গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয় ব্রিটেনে তাহার নিদর্শন মিলিবে না। কংগ্রেসে আলোচনা শুরু হইবার পূর্বেই বিলগুলি সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট প্রেরিত হয়।

আমেরিকার তুলনায় ব্রিটেনে স্থায়ী কমিটির সংখ্যা অনেক কম। ব্রিটেনের প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটিই অত্যন্ত কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ।

আমেরিকার তুলনায় ব্রিটেনের কমিটিগুলির সদস্য সংখ্যা অনেক বেশী।

মার্কিন কমিটি ব্যবস্থায় প্রবীণ সদস্যদিগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করিবার এক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটেনে নির্বাচক কমিটির মাধ্যমে কমিটির সভাপতি প্রভৃতি নিযুক্ত হন। ব্রিটেনের তুলনায় মার্কিন কমিটি ব্যবস্থায় দলীয় প্রভাব অধিক লক্ষ্য করা যায়।

অষ্টম অধ্যায়

দলীয় ব্যবস্থা

(The Party System)

[দ্বিদলীয় ব্যবস্থা—অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তিতে বিশেষভাবে বিভক্ত নহে]

মার্কিন সংবিধানে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বা গুরুত্ব স্বীকার করা হয় নাই। মার্কিন সংবিধান প্রণেতাগণ দলীয় ব্যবস্থায় বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন না। কিন্তু সংবিধান রচয়িতাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। যথার্থই বলা হইয়াছে, "The stone which the builders rejected has to-day become the chief corner-stone." বর্তমানে দলীয় ব্যবস্থার ব্যাপকতা মার্কিন শাসন ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে।

দ্বিদলীয় প্রথা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিপাব্লিকান ও গণতান্ত্রিক এই দুই প্রধান দল বিরাজমান। এই দুই দলের নীতিগত পার্থক্য বিশেষ প্রকট নহে। প্রত্যেক দলের অভ্যন্তরে এক উদারনৈতিক ও এক রক্ষণশীল শাখা আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্যা বিশেষ প্রকট হইয়া না উঠায় অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি না হওয়ায় দলগুলির মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। অবশ্য গণতান্ত্রিক দল অধিকতর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণতন্ত্রী দল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী।

দলীয় কাঠামোর রূপরেখা

মার্কিন দেশের নির্বাচকদিগের এক বৃহৎ অংশ কোন রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। মোটামুটিভাবে দলগুলি আঞ্চলিক সংস্থাকে জাতীয় সংস্থা অপেক্ষা অধিকতর সুদৃঢ় করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

সভাসমিতির মাধ্যমে দলের কার্য

দলগুলি সভাসমিতি ও আলোচনা চক্রের মাধ্যমে সদস্যদিগকে সংগঠিত করে। প্রত্যেক জিলায় জিলায় কমিটি স্থাপন করা হয়। জিলা কমিটিগুলি স্থায়ী আঞ্চলিক কমিটি নিয়োগ করে ও জিলায় প্রার্থী মনোনয়ন করে।

জিলা কমিটির প্রতিনিধিগণ উর্ধ্বতন কমিটির আহূত সভায় উপস্থিত থাকেন ও ঐ সভায় রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। রাজ্য সম্মেলনে রাজ্য কমিটি, রাজ্যপাল প্রভৃতি নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এবং জাতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হয়।

দলীয় ব্যবস্থার রূপরেখা

জাতীয় সম্মেলনে দলীয় রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী মনোনয়ন করা হয়।

মাকিন দলীয় ব্যবস্থাকে ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার সহিত তুলনা করিলে কিছু সাদৃশ্য ও কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাইবে। ব্রিটেনের ন্যায় আমেরিকায় দ্বিদলীয় ব্যবস্থার প্রবণতা দেখা যায়। উভয় দেশের দলীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তর আঞ্চলিক, জাতীয় প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। উভয় দেশে দলগুলির সহিত বিভিন্ন কমিটি, সমিতি, ইউনিয়ন ও সংস্থা যুক্ত রহিয়াছে।

মাকিন ও ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচার

কিন্তু ব্রিটেনের ন্যায় আমেরিকার দলগুলি অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তিতে বিভক্ত বা পৃথক হয় নাই। ব্রিটেনের রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কে যে দ্বিমত আছে সেইরূপ উগ্র মতপার্থক্য মাকিন দলীয় ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায় না। বস্তুতঃ মাকিন দলগুলির মধ্যে আদর্শগত বা নীতিগত পার্থক্য বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না।

ব্রিটেনের দলগুলি অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিভক্ত নহে

ব্রিটেনে দলীয় ব্যবস্থা সরকারী ব্যবস্থার সহিত প্রায় ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। আমেরিকায় দলগুলি শাসন বিভাগ ও সরকারী অন্য বিভাগের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না রাখিয়া বাহির হইতে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়াস পায়। ইংলণ্ডে সরকারী নীতি ও কার্যের মধ্য দিয়া দল তাহার আদর্শ ও নীতি প্রকাশ করে।

ব্রিটেনে দলীয় ব্যবস্থা ও সরকারী ব্যবস্থা—ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত

নবম অধ্যায়

বিচার বিভাগ

(The Judiciary)

[যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়—পিরামিডের আকারে কাঠামো গঠিত—আপীল ও আদিম বিভাগ—সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা রূপে সুপ্রীম কোর্ট]

সংবিধান অনুসারে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল বিচার বিভাগীয় কার্য সুপ্রীম কোর্ট ও অধীনস্থ অন্যান্য আদালতের উপর সমর্পিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য অনস্বীকার্য।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, "The judicial power of the United States shall be vested in one Supreme Court and in such inferior courts as the congress may from time to time ordain and establish."

বিচার ব্যবস্থা পিরামিডের আকারে প্রবর্তিত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পিরামিডের আকারে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যে একটি জিলা আদালত স্থাপিত হইয়াছে। জিলা আদালতের উপর সার্কিট (circuit) আদালত স্থাপিত হইয়াছে এবং সর্বোপরি প্রধান যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সুপ্রীম কোর্টের অবস্থান।

জিলা আদালত

প্রত্যেক জিলায় অন্ততঃ একটি জিলা আদালতের সৃষ্টি হইয়াছে। জনসংখ্যা কোন রাজ্যে অত্যধিক হইলে, একাধিক জিলা আদালত স্থাপিত হয়। সাধারণতঃ একজন বিচারকের মাধ্যমে জিলা আদালত শাসিত হয়, অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তিনজন বিচারক নিয়োগ করা হয়। জিলা আদালতে আদিম বিভাগীয় মামলার উদ্ভব হয় (original)। সাধারণতঃ কয়েকটি ব্যতীত প্রায় সর্বপ্রকার মামলার সূত্রপাত জিলা আদালতগুলিতে দেখা যায়।

সার্কিট আদালতগুলি জিলা আদালতের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানী পরিচালনা করে। এই আদালতগুলির আদিম বিভাগীয় এক্তিয়ার নাই। সার্কিট আদালতের সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে চরম বলিয়া গৃহীত হয়। সার্কিট আদালতের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা সম্ভব।

সার্কিট (circuit) আদালত

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারকদিগের কোন বয়সসীমা নির্দিষ্ট করা হয় নাই। যোসেফ স্টোরী ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক। স্টোরী মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে বিচারকের আসন গ্রহণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে কুমারী লকউড প্রথম মহিলা আইনজীবিরূপে পরিচিতা।

বিচারকদিগের বয়ঃসীমা নাই

সংবিধানে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয় নাই। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি সহ নয়জন বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের কার্য পরিচালনা করে। বিচারকগণ সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োজিত হন। বিচারকগণের আদালত কক্ষে প্রবেশের সংগে সংগে ঘোষক তাঁদের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করে। ঘোষক তাঁর ঘোষণায় বলেন, "Oyez ! Oyez ! Oyez ! The Honourable the Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court of the United States···God Save this United States and this Honourable Court"। বিচারপতিগণকে বিচার কার্যের (impeachment) সাহায্যে পদচ্যুত করা সম্ভব।

বিচারপতির সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই

সুপ্রীম কোর্টের আপীল ও আদিম উভয় এলাকা বর্তমান। সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে যে সকল মামলায় রাষ্ট্রদূত, সরকারী মন্ত্রী, কন্সাল বা কোন অংগরাজ্য জড়িত থাকিবে সেই সকল মামলার বিচার সুপ্রীম কোর্টের আদিম এলাকায় হইবে ("In all cases affecting ambassadors, other public ministers and consuls and those in which a state shall be party the Supreme Court shall have original jurisdiction.")। অংগরাজ্যের সহিত অপর অংগরাজ্যের বা অংগরাজ্যের

আপীল ও আদিম বিভাগ

সহিত জাতীয় সরকারের বিরোধের নিষ্পত্তি সুপ্রীম কোর্টেই সম্ভব। সংবিধানের ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করা সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম দায়িত্ব। কংগ্রেস-প্রণীত আইনের সংবিধানগত বৈধতা সুপ্রীম কোর্ট পরীক্ষা করিয়া দেখে, অবশ্য সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের পরিবর্তন সাধন সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা বহির্ভূত।

সুপ্রীম কোর্টে আপীল

অন্য সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টেই আপীল করা সম্ভব। মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট ভারসাম্যের যন্ত্র বলিয়া পরিচিত। মার্কিন সংবিধানরূপ রথের চতুর্থতম চাকা হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট আখ্যায়িত। আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যাও মধ্যে মধ্যে সুপ্রীম কোর্টে করা হয়। সুপ্রীম কোর্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংবিধানে যে কোন অনুচ্ছেদের অর্থ সরল করিয়া দিতে পারে ও ফলে মার্কিন সংবিধানের অতিরিক্ত দুষ্পরিবর্তনীয়তা কিছুটা লাঘব হয়।

বিচারকদিগের দলগত মনোভাব

অবশ্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদিগের মধ্যে কিছুটা দলগত মনোভাব মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই বিচারকগণ একমত হইয়া রায় দান করিতে পারে না। ৯ জন বিচারকের মধ্যে ৫ জন একদিকে ও ৪ জন বিপক্ষে রায় দিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই দৃষ্টান্ত হইতে নিরপেক্ষ বিচারের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কখনও কখনও দলীয় মনোভাব ও রক্ষণশীল মনোবৃত্তি বিচারকগণের মধ্যে প্রকট হইয়া দেখা দেয়।

সারাংশ

মার্কিন শাসনতন্ত্রে প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে ঐক্য, ন্যায়, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য মার্কিন জনসাধারণ কর্তৃক সংবিধান বিধিবদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মার্কিন সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন মত একটি লিখিত সংবিধান। অবশ্য কিছু প্রথা ও রীতিনীতি স্বভাবতই সংযোজিত হইয়াছে, এই সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। সকল প্রকার শাসনব্যবস্থায় মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের

সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হইয়াছে। মার্কিন শাসনব্যবস্থায় গৃহীত নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি লক্ষণীয়। মৌলিক অধিকারের সংরক্ষণ ও দ্বৈত নাগরিকতার প্রবর্তন মার্কিন সংবিধানের বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ও "Spoils system" বিশেষ লক্ষণীয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থায় প্রতিটি অংগরাজ্য আপন সত্তা রক্ষা করিয়া কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনস্থ হইতে স্বীকৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রের সহিত অংগরাজ্যগুলির ক্ষমতা বণ্টন নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশ অংগরাজ্যগুলির জন্য সংরক্ষিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে আমেরিকায় বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য স্পষ্ট হইয়াছে।

আইনগত ভাবে রাষ্ট্রপতির হস্তে সকল শাসন সংক্রান্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ চারি বৎসর। একটি নির্বাচক সংস্থার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। অবশ্য দলীয় ব্যবস্থার ফলে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সমগ্র রাজ্যে রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কংগ্রেস-প্রণীত আইনগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ ও কার্যকর করা রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব। এতদ্ব্যতীত সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী তিনি নিয়োগ করেন এবং কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত প্রায় সকল সরকারী কর্মচারীকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। রাষ্ট্রপতি মার্কিন রক্ষী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং বৈদেশিক ও কূটনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি পরিচালক। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ করিতে পারেন ও যে কোন বিলকে নাকচ করিয়া দিতে পারেন। দণ্ড মার্জনা বা দণ্ডাদেশ হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে।

মার্কিন ক্যাবিনেট রাষ্ট্রপতির দ্বারা সৃষ্ট ও রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী। এইজন্য আমেরিকার ক্যাবিনেটকে রাষ্ট্রপতির পরিবার বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

আমেরিকার আইনসভা, কংগ্রেস নামে অভিহিত। সিনেট সভা ও জনপ্রতিনিধি সভার সমন্বয়ে কংগ্রেস গঠিত। উভয় সভার সদস্যগণ

জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত। উচ্চ কক্ষ হইলেও সিনেটের ক্ষমতা হ্রাস পায় নাই। জনপ্রতিনিধি সভার সভাপতি স্পীকার দল নিরপেক্ষ নহেন। সিনেট সভার আইন সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে।

মার্কিন সংবিধানে কোন রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। আমেরিকার দুইটি প্রধান দল হইল রিপাব্লিকান ও গণতান্ত্রিক দল। দুইটি প্রধান দলের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য বিশেষ পরিলক্ষিত হয় নাই।

সকল বিচার বিভাগীয় কার্য সুপ্রীম কোর্ট এবং অধীনস্থ অন্যান্য আদালতের উপর সমর্পিত হইয়াছে। প্রত্যেক জিলায় একটি জিলা আদালতের সৃষ্টি হইয়াছে। সার্কিট আদালতগুলি জিলা আদালতের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানী পরিচালনা করে। সার্কিট আদালতের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টকে আপীল ও আদিম উভয় এলাকায় বিভক্ত করা যায়। সুপ্রীম কোর্টই মার্কিন সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকর্তা।

Exercise

1. What are the main features of the American Constitution ?

2. In England the Legislature is supreme, in the United States the Constitution is supreme.—Explain.

3. Examine the characteristic features of the American Constitution as a federation.

4. "The American Government is a system of checks and balances." Explain and discuss.

5. Describe the procedure laid down and the practice actually followed in the election of the President of the U. S. A. and describe the position and powers of the President of the United States of America.

6. The Cabinet in America has been called the President's family.—Explain and discuss. Compare the Cabinet in the United States of America with the Cabinet in Britain.

7. The American Senate has been characterised to be the strongest upper chamber in the world. Examine the powers of the Senate and account for its strength and importance.

8. Account for the weakness of the House of Representatives in America.

9. Discuss the position of the Supreme Court in the Constitutional System of U. S. A.

শাসনতন্ত্র

সুইজারল্যাণ্ড

প্রথম অধ্যায়

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা

[ভৌগোলিক অবস্থান—নানা ভাষা নানা জাতির সমস্যা—সংহতি ও ঐক্য ও নিয়মানুবর্তিতা—লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান—যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা—গণ উদ্যোগে সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয়—যৌথ শাসনবিভাগ]

দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে পার্বত্য অঞ্চল হিসাবে সুইজারল্যাণ্ডের অবস্থান। সুইজারল্যাণ্ডের উত্তরে জার্মানী, পূর্বে অষ্ট্রিয়া, দক্ষিণে ইতালি ও পশ্চিমে ফরাসী দেশ। প্রায় ১৫৯৪৪ বর্গমাইল-ব্যাপী এই পার্বত্য অঞ্চলে ৫০ লক্ষের উপর লোকের বাস। ২২টি ক্যাণ্টনের সমন্বয়ে সুইস যুক্তরাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-সমবায় (confederation) গঠিত।

ভৌগোলিক অবস্থান

সুইজারল্যাণ্ডে ভাষাগত বা সংস্কৃতিগত ঐক্য বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয় বংশ-উদ্ভূত বহু লোক সুইজারল্যাণ্ডে বাস করে। সুইজারল্যাণ্ডে প্রধানতঃ ফরাসী, জার্মানী ও ইতালীয় ভাষার প্রচলন দেখা যায়। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৬৭ ভাগ প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী, প্রায় শতকরা ৪১ ভাগ ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। এতদ্ব্যতীত ইহুদি ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যার কিছু নিদর্শন সুইজারল্যাণ্ডে দেখা যায়।

সাংস্কৃতিক পরিচয়

দেশে ভৌগোলিক অনৈক্য, ভাষাগত ও ধর্মগত বিভেদ থাকা সত্ত্বেও সুইজারল্যাণ্ডে ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। অধিবাসীদিগের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও সংগঠন শক্তি পরিলক্ষিত হয়।

নিয়মানুবর্তিতা ও সংহতি

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Salient Features of the Constitution)

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে সুইজারল্যাণ্ডে লিখিত সংবিধান সংযোজিত হইয়াছে। সংবিধানে বিশদভাবে শাসনতান্ত্রিক বিষয় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। লিখিত অনুচ্ছেদ ভিন্ন প্রথা ও রীতিনীতির অবস্থানও লক্ষণীয়। বিভিন্ন ক্যাণ্টনে কিভাবে বিদেশীগণকে দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব আরোপ করা হইবে

লিখিত সংবিধান

তাহা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে নির্ধারণ করিতে দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য যুক্ত রাষ্ট্রীয় সরকার এই ক্ষমতা কখনও প্রয়োগ করে নাই এবং ঐ দায়িত্ব পরোক্ষ-ভাবে রাষ্ট্রগুলির উপর অর্পণ করা হইয়াছে।

সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় রাখা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার যে কোন সদস্য সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার উভয় পরিষদই যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহা হইলে উহা জনমত দ্বারা স্বীকৃত হইবার জন্য গণভোটে দেওয়া হয়। জনসাধারণের অধিকাংশ দ্বারা কেবল সমর্থিত হইলেই হইবে না, সংশোধন প্রস্তাব অধিকাংশ ক্যাণ্টনগুলির দ্বারা সমর্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্যাণ্টনের অধিকাংশ নাগরিক দ্বারা সমর্থিত হইলে তবেই সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হইবে।

জনসাধারণও সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন। পঞ্চাশ জন নির্বাচক যদি সংবিধানের কোন অংশের পরিবর্তন দাবি করে তাহা হইলে গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে বিলের আকারে ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় ঐ প্রস্তাব সমর্থিত হইলে উহা গণভোটের জন্য প্রেরিত হয়। আইনসভা সমর্থন না করিলে বিরোধিতার কারণসমূহ গঠনপূর্বক এক পরিবর্তন-সূচী গণভোটে দেওয়া হয়। নির্বাচকদিগের অধিকাংশ যদি গণ-উদ্যোগে প্রেরিত প্রস্তাবের সমর্থন জানায় তাহা হইলে আইনসভা ঐ প্রস্তাব বিলের আকারে পেশ করিতে বাধ্য হয়।

গণ-উদ্যোগে সংশোধন সম্ভব

সংবিধানে নাগরিকদিগের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত কোন পৃথক অধ্যায় সংযোজিত না হইলেও নাগরিকদিগের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বহু অনুচ্ছেদ সংবিধানে স্থান পাইয়াছে।

নাগরিকদিগের ব্যক্তি-স্বাধীনতা

১৯টি ক্যাণ্টন ও ৬টি অর্ধ-ক্যাণ্টনের সমন্বয়ে সুইজারল্যাণ্ডে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক ক্যাণ্টন ও অর্ধ-ক্যাণ্টনের নিজস্ব সরকার আছে। অর্ধ-ক্যাণ্টনের পক্ষে একজন ও ক্যাণ্টনের পক্ষে দুইজন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয় রাজ্যপরিষদে। ক্যাণ্টনগুলি পরস্পর চুক্তি সংস্থাপনে অপারগ। অবশ্য বিস্ময়করভাবে বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত ক্যাণ্টনগুলির সন্ধিস্থাপনের

যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র

অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এই চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের মাধ্যমে সংযোজিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যাণ্টনগুলির সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন নির্দিষ্টভাবে নিরূপিত হইয়াছে। বৈদেশিক সম্পর্ক, সামরিক ব্যবস্থা, যানবাহন, ব্যাংক ও মুদ্রণ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের এলাকার অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্টাংশ ক্ষমতা (residuary powers) ক্যাণ্টনে সমর্পিত হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে অবস্থিত।

যৌথ শাসন-ক্ষমতা

সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ক্ষমতা যৌথভাবে কয়েকজন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। পৃথিবীতে এইরূপ দৃষ্টান্ত আর নাই।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

সুইজারল্যাণ্ডে গণভোট, গণউদ্যোগ ও গণসমাবেশের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতীতে এথেন্স (Athens) ও সাম্প্রতিক কালে সুইজারল্যাণ্ড প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুইজারল্যাণ্ড সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "It is a real democracy in operation and the country presents a greater variety of institutions based on democratic principles than any other country."

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

সংবিধানগতভাবে সুইজারল্যাণ্ড একটি রাষ্ট্রসমবায় বলিয়া আখ্যায়িত হইলেও প্রকৃতিগত ভাবে ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় গঠিত। সুইজারল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় ও ক্যাণ্টনগুলির সরকারসমূহ সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রদেশগত ভিত্তিতে সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা গঠিত হইয়াছে। ক্যাণ্টনগুলি শাসন-ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক হিসাবে চিত্রিত করা হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় প্রণীত কোন আইনের বৈধতা বিচার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের এলাকা বহির্ভূত।

স্বতন্ত্রীকরণ নীতি নাই

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় আইনসভার গুরুত্ব অধিক হওয়ায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বিশেষ কার্যকর হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা

(The Federal System)

লিখিত সংবিধান—যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে সম্পর্ক—সাংবিধানিক প্রাধান্য]

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপাদানগুলির মধ্যে লিখিত দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র অন্যতম। সুইজারল্যাণ্ডে লিখিত সংবিধান বর্তমান। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইবার পদ্ধতি সুইজারল্যাণ্ডে দুরূহ ও জটিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সদস্যের উদ্যোগে অথবা গণউদ্যোগে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই গণভোটের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্যাণ্টনের অধিকাংশ সদস্যদিগের উহা অনুমোদিত হওয়া বিধেয়।

লিখিত সংবিধান

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অপর এক বৈশিষ্ট্য স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা নির্দিষ্টভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। লিখিত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে এই ক্ষমতা বণ্টন করা সম্ভব হয়। আপন আপন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলি আইনগত ভাবে নির্দিষ্ট ক্ষমতা উপভোগ করিবার অধিকার অর্জন করে। সুইজারল্যাণ্ডে সংবিধানগতভাবে কেন্দ্রীয় সরকার পররাষ্ট্র, সামরিক প্রভৃতি ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে সকল ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। অবশিষ্টাংশের ক্ষমতাগুলি ক্যাণ্টনগুলিতে সমর্পিত হইয়াছে। ক্যাণ্টনগুলির ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সুইজারল্যাণ্ডে বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং সংবিধানের অনির্দিষ্ট সকল ব্যাপারে ক্যাণ্টনগুলির সার্বভৌমিক ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগের হস্তে যে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা হয় নাই সেইগুলি ক্যাণ্টনগুলি প্রয়োগ করিবার অধিকার অর্জন করিয়াছে।

কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির সম্পর্ক

যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপনা, পররাষ্ট্র ব্যাপার, সন্ধি স্থাপন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ডাকবিভাগ, রেলপথ মুদ্রাব্যবস্থা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার অনন্য ক্ষমতা (exclusive powers) উপভোগ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই অনন্য ক্ষমতাগুলি ভিন্ন কিছু কিছু যুগ্ম ক্ষমতাও উপভোগ করেন (concurrent powers)। শিক্ষা, শিল্প নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ক্ষমতা প্রভৃতি যুগ্ম ক্ষমতাগুলির

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা

অন্যতম। ক্যান্টনগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সহিত একসংগে যুগ্ম ক্ষমতাগুলি উপভোগ করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সহিত আঞ্চলিক সরকারগুলির সংঘাত উপস্থিত হইলে যুগ্ম ক্ষমতার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অধিকার প্রাধান্য লাভ করে।

বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অপর এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুইজারল্যাণ্ডে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত থাকিলেও ঐ আদালতকে সংবিধানগত বৈধতা বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। আইনসভা প্রণীত কোন আইনকে অবৈধ ঘোষণা করিবার কোন ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনকে বলবৎ করিবার জন্য জনসাধারণের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। অতএব আইনসভার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জনগণের উপর সমর্পিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের বৈধতা বিচারে অক্ষম

সাম্প্রতিক কালে নানা শাসনতান্ত্রিক জটিলতা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক বা অর্থনৈতিক সংকটের জন্য বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিয়াছে তাহার প্রভাব হইতে অপরাপর সকল যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সুইস যুক্তরাষ্ট্রও মুক্ত নহে।

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার তুলনা

মার্কিন সংবিধান সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানের ন্যায় প্রকৃতিগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয়। দুইটি রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় কেন্দ্রের ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট ভাবে ক্ষমতার বণ্টন হইয়াছে। ৫০টি অংগরাজ্য লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ১৯টি ক্যান্টন ও ৬টি অর্ধ ক্যান্টন লইয়া সুইস যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। যতদূর পর্যন্ত সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধান ক্যান্টনগুলির সার্বভৌমিকতাকে সীমিত করে নাই ততদূর পর্যন্ত উহারা সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন।

তত্ত্বগতভাবে সুইজারল্যাণ্ডে সাংবিধানিক প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের সকল ক্ষমতার উৎস সংবিধান। কিন্তু সংবিধানের প্রাধান্য কার্যক্ষেত্রে ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কিন ব্যবস্থার ন্যায় সুইজারল্যাণ্ডে সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত

সাংবিধানিক প্রাধান্য

হয় নাই। আমেরিকায় সুপ্রীম কোর্ট আইনসভা-প্রণীত আইনগুলি সংবিধান-সম্মত কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখে এবং বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার মাধ্যমে সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করে। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের এই ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে সীমাবদ্ধ। সুইজারল্যাণ্ডে আইনসভার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং এই ব্যাপারে সুইস সংবিধানের সহিত ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সুইজারল্যাণ্ডের আইনসভা জনসাধারণ নিয়ন্ত্রিত।

আঞ্চলিক সরকার অবশিষ্টাংশ ক্ষমতা লাভ করিয়াছে

সুইজারল্যাণ্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমতুল ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে। উভয় যুক্তরাষ্ট্রেই অবশিষ্টাংশ (residuary) ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলির উপর সমার্পিত হইয়াছে। শাসন ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায় অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের অধিকার ক্যাণ্টনগুলির উপর অর্পণ করা হইয়া থাকে। আমেরিকায় এই ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। আমেরিকার ন্যায় সুইজারল্যাণ্ডেও কেন্দ্রীয় সরকার সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে যে, "It really erects the Confederation in some measure into a tutor and inspector of the Cantons"। অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে সুইস গণতন্ত্রের বনিয়াদ ক্যাণ্টনগুলিকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, "the Cantons and the half Cantons are all so many small nations animated by a ceaseless desire to perfect their political organisation and to develop their democratic institutions."

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট আইনের বৈধতা বিচার করিয়া ও বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার দ্বারা সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার যে প্রয়াস পায় তাহা সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের এলাকা বহির্ভূত।

তৃতীয় অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ
(Federal Council)

[যৌথ শাসন বিভাগের প্রবর্তনে সুইজারল্যাণ্ডের বৈশিষ্ট্য—যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রাধান্য—যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যবর্গ আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগে বাধ্য—স্থায়িত্ব ও দায়িত্বের অপূর্ব মিলন]

সুইজারল্যাণ্ডে রাষ্ট্রের শাসনবিভাগীয় সকল ক্ষমতা একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের উপর সমর্পণ করা হইয়াছে। কোন একজনের হস্তে শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্র পরিষদের সদস্যগণ চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হইবার অধিকারী এমন যে কোন ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্র পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করা যায়। যে সাতজন সদস্য যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে নির্বাচিত হন তাহাদিগকে আইনসভার সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতে হয়। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদের পুনর্গঠনের সংগে সংগে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের পুনর্গঠন সাধিত হয়। সদস্যগণ পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। নির্বাচিত সদস্যগণ আইনসভায় উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার লাভ করিলেও ভোট প্রদানে সক্ষম নহেন। এইজন্য বলা হয়, "The Ministers are not the leaders of the Houses but their servants." অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সকল সদস্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার অধীনস্থ। সাধারণতঃ একই ক্যাণ্টনের সদস্যগণের মধ্য হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে একাধিক সদস্য নিয়োগ করা হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সকল সদস্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার অধীনস্থ

প্রতি বৎসর আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচন করে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি সমগ্র সুইজারল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিরূপে অভিহিত হন।

যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে জার্মান ভাষাভাষী ক্যাণ্টনের দুইজন প্রতিনিধি এবং ফরাসী ও ইতালীয় ভাষাভাষী ক্যাণ্টনগুলির একজন করিয়া প্রতিনিধি সর্বদা থাকে।

জার্মান ও ইতালীয় ভাষাভাষী সদস্য

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ শাসন বিভাগীয়, আইন বিভাগীয় এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

শাসনবিভাগের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনগুলির যথার্থ প্রয়োগ ব্যবস্থার তদারক করেন ও আইনগুলি বলবৎ করেন। শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বহিরাক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা, ক্যাণ্টনগুলির সংবিধান সংরক্ষণ করা, ক্যাণ্টনের বিভিন্ন চুক্তি পর্যবেক্ষণ করা, দেশের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা, সশস্ত্র বাহিনী নিয়ন্ত্রণ, আইনসভার নিকট আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র ব্যবস্থার রিপোর্ট প্রদান করা যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারী নিয়োগ করা প্রভৃতি কার্য যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের অন্তর্ভুক্ত।

বিবিধ ক্ষমতা

যুক্তরাষ্ট্র পরিষদ আইন সংক্রান্ত অনেক ক্ষমতা উপভোগ করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হইবার পর ঐ সকল সদস্যকে আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হয়। এই ব্যবস্থায় কতক পরিমাণে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির স্বাক্ষর মিলিবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ আইনসভায় উপস্থিত থাকিলেও ভোট প্রদানের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত। অবশ্য সকল গুরুত্বপূর্ণ বিলের খসড়া পরিষদ প্রণয়ন করে এবং পরিষদের সদস্যগণের উদ্যোগে উত্থাপিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের আইন বলবৎকালে পরিষদ বহু নিয়মকানুন প্রবর্তন করে। পরিষদের সদস্যগণ আইন সভায় বিভাগীয় শাসনসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। পরিষদ বাজেট প্রণয়ন করিয়া আইনসভায় পেশ করে এবং আইনসভার নিকট কার্যের বিবরণ দাখিল করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী। শাসনতান্ত্রিক আইনের বিচার ব্যবস্থা পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হইত। ক্যাণ্টনগুলির নির্বাচন প্রভৃতির বিষয়ের অভিযোগের আপীল বিচার পরিষদে অনুষ্ঠিত হয়।

আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা

বৈশিষ্ট্য

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের মাধ্যমে যে যৌথ শাসনব্যবস্থা (Collegiate executive) পরিচালিত হয় তাহা পৃথিবীর সাংবিধানিক ইতিহাসে অনন্য। প্রায় প্রত্যেক দেশেই একজন ব্যক্তির হস্তে শাসন-ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে সাতজন সদস্যের হস্তে এই ক্ষমতা সমর্পিত। সাধারণতঃ শাসন

যৌথ শাসন-ব্যবস্থা

ক্ষমতায় নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন প্রাধান্য লাভ করে কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে সাতজন সদস্য সমান ক্ষমতা বিশিষ্ট। ডাইসী যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদকে এক যৌথ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের (Joint Stock Company) সহিত তুলনা করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত সভাপতির ক্ষমতা নিতান্তই সীমিত। পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগে বাধ্য হওয়ায় এবং আইনসভায় ভোট প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার সহিত এক প্রভেদ প্রতীয়মান হয়।

পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগে বাধ্য

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে স্থায়িত্ব ও দায়িত্বের এক অপরূপ সমাবেশ দেখা যায়। প্রশ্নের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা পরিষদকে নিয়ন্ত্রিত করিবার সুযোগ লাভ করে। আইনসভা প্রণীত সকল আইন পরিষদকে মান্য করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু আইনসভা অনাস্থা জ্ঞাপন করিলে বা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের কোন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে ইংলণ্ডের ক্যাবিনেট সভার ন্যায় সুইস পরিষদ পদত্যাগ করেন না। এই ব্যাপারে বিনা দ্বিধায় খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব লইয়া পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার নির্দেশ মানিয়া লয়। পরিষদের সদস্যগণ চারি বৎসর অপ্রতিহতভাবে ক্ষমতায় আসীন থাকেন। ব্রিটেনের দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা ও মার্কিন শাসন বিভাগীয় স্থায়িত্বের সংমিশ্রণে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্ট হইয়াছে।

স্থায়িত্ব ও দায়িত্বের অপূর্ব মিলন

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা পার্লামেণ্টীয় এবং অপার্লামেণ্টীয় (Parliamentary and non-Parliamentary) উভয় ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। পার্লামেণ্টারী রীতিনীতি অনুসারে আইনসভার মধ্য হইতে পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। পরিষদের সদস্যগণ আইনসভায় উপস্থিত থাকিবার ও প্রয়োজনে বিল উত্থাপন করিবার ক্ষমতার অধিকারী। আইনসভার নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সকল সদস্য মান্য করে। কিন্তু পরিষদের সদস্যগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে নির্বাচিত হইবার পর আইনসভার

পার্লামেণ্টারী ও অপার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার সংমিশ্রণ

সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে পার্লামেণ্টারী রীতি বিরুদ্ধ ব্যবস্থা সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার হেতু রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সকল সদস্য নির্দিষ্ট কালের জন্য ক্ষমতায় আসীন থাকেন এবং আইনসভার অপসারণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই।

দলীয় প্রথার প্রভাব সুইজারল্যাণ্ডে বিশেষ অনুভব করা যায় না। সরকারী শাসন ব্যবস্থার অভ্যন্তরে দলীয় প্রভাব বিশেষ বিস্তৃত হয় নাই। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ সমগ্র জাতির ভৃত্য ও অধিকাংশের অনুগত হিসাবে কার্য সম্পাদন করে।

দলীয় প্রভাবের অভাব

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে ক্যাবিনেট সভার ন্যায় ঐক্যবদ্ধ সংহতি বা অভিন্নতা সদস্যদিগের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। দলীয় ব্যবস্থার গুরুত্বের অভাবে সদস্যগণ আপন মত গঠনে সক্ষম। বহু গুরুত্বপূর্ণ শাসন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদের সদস্যগণ পৃথকভাবে ও পারস্পরিক বিরোধিতার মাধ্যমে সংগঠিত করেন। প্রকাশ্যভাবে আইনসভায় একজন সদস্য অপর সদস্যের কার্যের সমালোচনা করিতে পারে। এইজন্য ব্রাইস বলিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ বিশেষ আলোচনার বস্তু। বলা হইয়াছে, "It is a body which is able not only to influence and advise the ruling assembly without lessening its responsibility to the citizen but which, because it is non-partisan, can mediate should need arise between contending parties adjusting difficulties and arranging compromises in a spirit of consolation."

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণের সংহতি ও ঐক্য নাই

চতুর্থ অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা

(Federal Legislature)

[দ্বিপরিষদীয় আইনসভা—আইন বিভাগীয় প্রাধান্য স্বীকৃত—পার্লামেণ্টারী ও অপার্লামেণ্টারী রীতিনীতির সমন্বয়]

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় সভারূপে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার উচ্চতন ও নিম্নতন কক্ষ যথাক্রমে রাজ্যপরিষদ ও জাতীয় পরিষদরূপে অভিহিত। মোট ৪৪ জন সদস্যের সমন্বয়ে কক্ষ গঠিত। প্রত্যেক ক্যাণ্টন হইতে দুইজন ও অর্ধ ক্যাণ্টন হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি রাজ্যপরিষদে প্রেরিত হয়। প্রতিনিধি মনোনয়ন পদ্ধতি বা তাহাদের কার্যকালের মেয়াদ সংবিধান নির্ধারণ করে নাই। এই সকল ব্যাপারে ক্যাণ্টনগুলির ক্ষমতা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপরিষদের সদস্যগণ জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আইনসভা দ্বারা প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হয়। ক্যাণ্টনগুলি প্রতিনিধিগণকে সদস্যপদ হইতে ইস্তফা দিতে বাধ্য করিতে পারে।

আইনসভার গঠন বা কাঠামো

রাজ্যপরিষদ আপন সদস্যদিগের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি নির্বাচন করে। অবশ্য একই ক্যাণ্টন হইতে সভাপতি ও সহসভাপতি মনোনয়ন সম্ভব নহে। প্রথানুসারে সহসভাপতি পরবর্তী বৎসরে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। ক্যাণ্টনের প্রতিনিধিগণের কার্যকালের মেয়াদ কোন ক্যাণ্টনে ৪ বৎসর, কোন ক্যাণ্টনে ৩ বৎসর আবার কোন ক্যাণ্টনে মাত্র ১ বৎসর।

সভাপতি ও সহসভাপতি

সুইজারল্যাণ্ডের নিম্নতন পরিষদ অর্থাৎ জাতীয় পরিষদ প্রায় দুইশত সদস্য লইয়া গঠিত। জনসমষ্টির প্রতিনিধিমূলক সংস্থা হিসাবে জাতীয় পরিষদ বিরাজ করে। পরিষদের সদস্যগণ সমানুপাতিক ভোটের সাহায্যে ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। প্রতি ২২০০০ হইতে ২৪০০০ জনসংখ্যার জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ভোটারগণ দ্বারা প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হয়। প্রতি চারি বৎসর অন্তর অক্টোবর মাসের শেষ রবিবারে সাধারণ নির্বাচন

জাতীয় পরিষদ

অনুষ্ঠিত হয়। যাজক সম্প্রদায় ভিন্ন ভোটদানে সমর্থ প্রত্যেক নাগরিকই জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইতে পারে। "Every citizen of the Republic who has entered on his twenty first year is entitled to vote, and. any voter, not a clergyman, may be entitled to vote, and may be elected a deputy."

একই ব্যক্তি উভয় পরিষদের সদস্য হইতে পারে না

একই ব্যক্তি কোন সময় যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার উভয় পরিষদের সদস্য হইতে পারেন না। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এই চারিবার নিয়মিত ভাবে আহূত হয়। রাজ্যপরিষদের অনুরূপ জাতীয় পরিষদেও প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ভোট গ্রহণের ফলাফলে প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যদি সমান সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হয় তাহা হইলে সভাপতি তাঁহার নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে সক্ষম হন। মার্কিন আইনসভার স্পীকারের তুলনায় সুইজারল্যাণ্ডের জাতীয় পরিষদের সভাপতির ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিশেষ সীমিত। বলা হইয়াছে, "The President of the National Council is far from being as powerful as the speaker of the American House of Representatives, the former office is considered a great prize by ambitious parliamentary leaders, and those men who have been so fortunate as to attain it enjoy a special prestige among their party associates." বৎসরে নির্দিষ্ট সাধারণ অধিবেশন ভিন্ন কোন ক্যাণ্টনের অনুরোধক্রমে অতিরিক্ত অধিবেশন আহ্বান করা সম্ভব।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসৃত না হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার হস্তে আইন সংক্রান্ত ব্যতীত শাসন ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে। রাজ্য পরিষদের ও জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা সমান বলিয়া

রাজ্যপরিষদের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত দুর্বল

স্বীকৃত হইলেও রাজ্যপরিষদের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও গুরুত্ব কিছু কম। তত্ত্বগতভাবে আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে উভয় পরিষদের সমান ক্ষমতা নির্দিষ্ট থাকিলেও প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে উচ্চতর কক্ষের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সীমিত রাখা

হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীদিগের নিয়মানুবর্তিতার জন্য দুইটি পরিষদের মধ্যে বিশেষ সংঘাত উপস্থিত হইতে পারে নাই।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত আইনসভার ক্ষমতা সংকুচিত করিতে সক্ষম নহে

জনসাধারণের আস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সভা না হারায় ততক্ষণ পর্যন্ত আইনসভা সর্বশক্তিমান থাকে। আইনসভার কার্যক্ষমতা নাকচ করিবার অধিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে সমর্পণ করা হয় নাই।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সভা সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়ে আইন প্রণয়নে সক্ষম।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

বাজেট প্রণয়ন. সংবিধানসম্মত ভাবে কর ধার্য করা, যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার অন্যতম কর্তব্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার তদারক, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের তত্ত্বাবধান, যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষগুলির নির্বাচন, বিদেশীয় রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি ও মৈত্রী স্থাপন, ক্যাণ্টনগুলির অথবা বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তির অনুমোদন প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার অন্যতম কর্তব্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইবুনালের সদস্যগণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনার অধ্যক্ষ প্রভৃতি আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপনার বিষয়ে আইনসভার সম্মতির প্রয়োজন হয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ ও দেশের নিরপেক্ষতা রক্ষা করা আইনসভার দায়িত্ব। গণভোটের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক ক্যাণ্টনের অধিক সংখ্যক নির্বাচকদিগের সমর্থনের ভিত্তিতে আইনসভা সংশোধনী প্রস্তাব গঠনে সমর্থ। জাতীয় পরিষদের শাসন বিভাগীয়, আইন বিভাগীয় এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা থাকায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি লাঞ্ছিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। সাধারণতঃ রাজ্যপরিষদ এবং জাতীয় পরিষদ পৃথক পৃথক অধিবেশন আহ্বান করে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারকগণকে বা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যদিগের নিয়োগের সময় যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করা হয়। সুইজারল্যাণ্ডের আইনসভা সম্পর্কে ব্রাইসের বিশেষ উচ্চ ধারণা ছিল। সুইজারল্যাণ্ডের আইনসভার সদস্যগণ সম্বন্ধে ব্রাইস বলেন, "He is solid, shrewd, unemotional or at any rate indisposed to reveal his emotions·········as a result of these qualities of the Swiss legislators the National Assembly has been

the most business like legislative body in the world ·· there are few set debates and still fewer set speeches."

শাসন বিভাগের সহিত আইন বিভাগের সম্পর্ক

(Relation between the Executive and the Legislature)

সুইজারল্যাণ্ডে আইনসভার সহিত শাসনবিভাগের সম্পর্ক এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছে। পার্লামেণ্টায় বা রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগের সহিত আইনসভার যে সম্পর্কের সহিত আমরা পরিচিত সুইজারল্যাণ্ডে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ব্রাইস বলেন, "The Council is not a Cabinet, like that of Britain···Neither is it independent of legislature, like the executive of U. S. A.···it has some of the features of both these schemes." পার্লামেণ্টারী ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত ব্যবস্থার কিছু কিছু উপাদান সুইজারল্যাণ্ডের আইনসভায় বর্তমান।

পার্লামেণ্টারী ও অপার্লামেণ্টারী রীতি-নীতির সমন্বয়

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনবিভাগ আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রত্যেক সদস্য কোন না কোন বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত। আইনসভার উভয় পরিষদেই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ উপস্থিত থাকিতে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন। সরকারী কার্যের জন্য পরিষদের সদস্যগণকে জবাবদিহি করিতে হইতে পারে এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর আইনসভায় সদস্যগণ প্রদান করেন। সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিলের খসড়া ও বাজেট প্রণয়ন করা আইনসভার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। এই সকল কার্য ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার সমতুল। কিন্তু এই সকল ব্যাপারে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও সুইজারল্যাণ্ডের শাসন বিভাগের সহিত ক্যাবিনেট প্রথার বৈসাদৃশ্য বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচিত করা হয় কিন্তু নির্বাচনের পরে পরিষদের সদস্যগণকে আইনসভা হইতে পদত্যাগ করিতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা

ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের ন্যায় সুইজারল্যাণ্ডে পরিষদের সদস্যগণ আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না অথবা জনগণের নিকট আবেদন জানাইতে সক্ষম হন না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না

লক্ষ্য করিতে হইবে যে আইনসভায় উপস্থিত থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ ভোট প্রদান করিতে অপারগ। আইনসভা পরিষদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেও পরিষদের সদস্যগণ পদত্যাগ করেন না। অনাস্থাজ্ঞাপক কোন প্রস্তাব পরিষদকে স্পর্শ করে না। এককথায় সুইজারল্যাণ্ডে শাসন বিভাগকে আইনসভার অধীনস্থ হিসাবে স্থান দেওয়া হইয়াছে। দলীয় প্রথার প্রভাবে ব্রিটেনে ক্যাবিনেট সভাই কমন্স সভাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার ইচ্ছাকেই বাস্তবে রূপ দেন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকেন। সুইজারল্যাণ্ডের পরিষদের সদস্যগণ পরস্পরবিরোধী মত প্রকাশ্যে পেশ করিতে পারেন।

শাসন বিভাগ আইন বিভাগের অধীনস্থ

পঞ্চম অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

(Federal Court)

[জাতীয় পরিষদের সদস্যপদে প্রার্থী নির্বাচিত হইবার যোগ্য যে কোন ব্যক্তিকে বিচারক হিসাবে নিয়োগ করা যায়—সংবিধান সংক্রান্ত প্রশ্নের বৈধতা বিচারে অপারগ]

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয় সম্পর্কে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য যে আদালত আছে তাহা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বা ট্রাইবুনাল নামে অভিহিত। যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সুইজারল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রে স্বভাবতঃই তাই পৃথক বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা সংযোজিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক ৬ বৎসরের জন্য ২৪ জন হইতে ২৬ জন বিচারক নিযুক্ত করা হয়। অবশ্য সাধারণতঃ বিচারকগণের কার্যকাল দীর্ঘ মেয়াদী হইতে কোন বাধা নাই। জাতীয় পরিষদের সদস্যপদে নির্বাচিত হইবার উপযোগিতা আছে এমন যে কোন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হইতে পারেন। আদালতের বিচারক থাকাকালীন সময়ে আইনসভার সদস্যপদ গ্রহণ অসম্ভব। ট্রাইবুনালের একজন সদস্য সভাপতি ও অন্যজন সহসভাপতি পদে দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। ঐ পদে পুনর্নির্বাচন সম্পর্কিত কোন বাধা নিষেধ নাই।

বিচারক নিয়োগ

ক্ষমতা ঃ— যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ক্যান্টনগুলির সকল দেওয়ানী মামলা ব্যক্তির সহিত যুক্তরাষ্ট্রের মামলা, এক ক্যান্টনের সহিত অন্য ক্যান্টনের বিরোধ সংক্রান্ত মামলার বিচার করা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের এলাকার অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধী বা দেশদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী আসামীদিগের বিচার এই আদালতে অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত কিছু কিছু শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ভোগ করে। ক্ষেত্রাধিকার লইয়া ক্যান্টন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ, সরকারী আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে ক্যান্টনগুলির বিরোধ, সংবিধান ভংগকারীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ ইত্যাদির নিষ্পত্তি ও বিচার করিবার ক্ষমতাকে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতারূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার আইনের বৈধতা বা সংবিধানগত সংহতি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন, পরীক্ষা বা সমীক্ষা করিতে সক্ষম নহে।

সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের বৈধতা বচা রে অক্ষম

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইবুনাল ও মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট

মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট যে কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনকে সংবিধানগত ভাবে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইবুনাল এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ।

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের কিছু কিছু শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা আছে, কিন্তু মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার কোন এলাকা নাই।

মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচিত হন। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইবুনাল সদস্যগণ কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হন।

মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিয়া অধিক সম্মান ও প্রতিপত্তি উপভোগ করিতে পারেন। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত আইন বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য প্রতিহত ও সীমিত হইয়াছে।

বিচার বিভাগীয় বৈশিষ্ট্য (Features of the Judicial System)

সুইজারল্যাণ্ডে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। প্রাথমিক আদালত (Court at First Instance)-গুলি জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত ও গঠিত।

ক্যাণ্টনগুলির আদালত সমূহও জনসাধারণ কর্তৃক নিযুক্ত।

সাধারণ ব্যক্তির সমন্বয়ে অধিকাংশ নিম্নতন আদালত গঠিত। বিচারক পদ প্রার্থীর জন্য বিশেষ ধরণের গুণাবলী নির্দিষ্ট না হওয়ায় যে কোন ব্যক্তির পক্ষে বিচারক হওয়া সম্ভবপর হয়। ক্যাণ্টনগুলির আদালতেও ইহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না।

সাধারণতঃ ফৌজদারী মামলায় জুরী প্রথার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। অবশ্য কোন প্রকার দেওয়ানী মামলায় এই ব্যবস্থার প্রচলন হয় নাই।

সুইজারল্যাণ্ডের বিচার বিভাগে নিরপেক্ষতা ও স্বতন্ত্র নীতি বিশেষ ভাবে প্রকট। বিচার সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে যাহাতে কষ্টকর না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্যয়ভার নির্দিষ্ট হইয়াছে।

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র নীতি হিসাবে একের অপেক্ষা বহুর বিবেচনা ও বিচক্ষণতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ফলে আদালতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাধিক বিচারপতি নিয়োগ করা হয়।

সুইজারল্যাণ্ডের বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য অপরাপর যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের তুলনায় নিতান্ত কম। যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইবুনাল যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার কোন আইন অবৈধ বা সংবিধান বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিতে অপারগ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

(Direct Democracy)

[গণউদ্যোগ—গণসমাবেশ—গণভোট]

সুইজারল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ব্যবস্থা পৃথিবীর শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এক কৌতূহল মিশ্রিত বিস্ময়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। ব্রাইসের মতে গণতন্ত্রের ছাত্রের নিকট সুইজারল্যাণ্ডের এই অভূতপূর্ব ব্যবস্থার ন্যায় বিস্ময়কর বস্তু আর কিছুই নাই। ব্রাইস বলেন, "Nothing in the Swiss arrangement is more instructive to the student of democracy for it opens a window into the soul of the multitude."

গণসমাবেশ (Popular Assembly), গণভোট (Referendum) ও গণউদ্যোগের (Initiative) মাধ্যমে সুইজারল্যাণ্ডে এই প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে।

যে সকল ক্যাণ্টনে গণউদ্যোগের ব্যবস্থা বিশেষ প্রকট নহে সেই ক্যাণ্টনগুলিতে জনসাধারণের মত প্রকাশের জন্য গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়। ক্যাণ্টনের প্রত্যেক নাগরিক এই সমাবেশে যোগদান করিতে পারে এবং সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক ভোটদানের অধিকারী। জনসাধারণের রাজনৈতিক সম্মেলন মুক্ত অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় একজন নির্বাচিত সভাপতির সভাপতিত্বে। গণসমাবেশে নানাবিধ প্রস্তাব পেশ ও আইন প্রণয়ন করা হয়। অর্থ সংক্রান্ত বা সরকারী নীতি সংক্রান্ত প্রশ্নের আলোচনাও গণসমাবেশে করা হয়। গণসমাবেশ সম্পর্কে ব্রুকস্ (Brooks) বলেন, "It is the most picturesque and fascinating of all political institutions in Switzerland and perhaps in the world."

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার একটি বিশিষ্ট দিক হইল গণভোট (referendum) ও গণউদ্যোগ (initiative)। আইনসভা প্রণীত কোন আইনকে কার্যকর বা বাতিল করিবার জন্য আইনকে গণভোটে দেওয়ার প্রচলনে সুইজারল্যাণ্ড এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। গণভোট দুই প্রকারের হইতে পারে, বাধ্যতামূলক বা ঐচ্ছিক। আইনসভায় সমর্থিত হইয়া সকল আইনকে বাধ্যতামূলক ভাবে গণভোটে দেওয়া হয়। ত্রিশ হাজার বা ততোধিক নাগরিকের উদ্যোগে যখন কোন আইনকে গণভোটে দেওয়ার দাবী করা হয় তখন উহা ঐচ্ছিক গণভোটরূপে পরিচিত হয়।

সংবিধানের সকল সংশোধনী প্রস্তাব বাধ্যতামূলকভাবে গণভোটে প্রদান করা হয়। সকল সাধারণ আইন ঐচ্ছিক গণভোটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। ত্রিশ সহস্র নাগরিক অথবা আটটি ক্যাণ্টন আইন সভায় বিল পাস হইবার ৯০ দিনের মধ্যে গণউদ্যোগের মাধ্যমে বিলটি গণভোটে প্রদান করিবার দাবি জানাইতে পারেন। সাধারণতঃ বাজেট, চুক্তি প্রভৃতি খুঁটিনাটি ব্যাপার গণভোটে প্রদান করা হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন বিষয়ে গণউদ্যোগ প্রযুক্ত হয়। গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে জনসাধারণ সরাসরিভাবে আইন প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব পেশ করিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচকগণ একটি বিলের সম্পূর্ণ খসড়া পেশ করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিলের খসড়া পেশ করা হয়। আইনসভা এই ধরণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে গণউদ্যোগে উদ্ভূত প্রস্তাব গণভোটে প্রদান করা হয়।

সুইজারল্যাণ্ডে প্রচলিত গণভোট ও গণউদ্যোগ বা গণসমাবেশের রীতি-নীতি বহু রাষ্ট্রনীতিবিদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হইলেও গণভোটের মাধ্যমে পরিবর্তনসাধন সরলীকৃত করা সম্ভব হইয়াছে। ১৮৪৮ সাল ও ১৯৪৭ সালের মধ্যে উপস্থাপিত মোট ৯৬টি সংশোধন প্রস্তাবের মধ্যে ৪৮টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আইন সভার ত্রুটি, স্বৈরাচার ও জনস্বার্থবিরোধী আইন প্রতিহত করা সম্ভব হইয়াছে। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে প্রতিনিধিবৃন্দের যে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় তাহা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিহত করা সম্ভব।

গণউদ্যোগ বা গণসমাবেশের মাধ্যমে আইনসভার নিষ্ক্রিয়তা অপসারণ বিশেষভাবে সম্ভব। গণভোট, গণউদ্যোগ ও গণসমাবেশ ব্যবস্থার শিক্ষামূলক ও নৈতিক উপযোগিতা অনস্বীকার্য। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের মাধ্যমেই প্রকৃতভাবে জনসাধারণের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। জনসাধারণের মঙ্গল যদি শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য হয় তাহা হইলে জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিশেষভাবেই কাম্য। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্রসমাজ ও রাজনৈতিক সচেতন হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যয়ভার যথেষ্ট লাঘব করা সম্ভব। প্রত্যক্ষ আইন প্রণয়ন ব্রাইসের মতে, "helps the legislature to keep in touch with the people……for it gives the voters an opportunity of declaring their views on serious issues."

অবশ্য অধ্যাপক লাস্কি, ফাইনার প্রমুখ শাসনতন্ত্রবিদগণ এই ব্যবস্থার বিপক্ষেও মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ত্রুটির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন আইন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে জনসাধারণের জ্ঞান থাকা সম্ভব নহে ফলে জনসাধারণের বিচার বহুক্ষেত্রে সুবিবেচনাপ্রসূত নাও হইতে পারে।

এই প্রত্যক্ষ ব্যবস্থায় আইন সভাগুলির দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। গণভোট ব্যবস্থার ফলে আইন সভার আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক যে আইন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হইবে। ইহার ফলে দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যপরায়ণতা হ্রাস পাওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। আইন সভার সম্মান ও প্রতিপত্তি এই ব্যবস্থায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেকে মনে করেন প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক কাঠামোয় পেশাদার রাজনীতিবিদের সংখ্যা হ্রাস পায় ও দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি প্রতিহত হয়। কিন্তু বিপরীত দিকে দেখা যায় গণসমাবেশ বা গণভোট গ্রহণ কালে দলীয় ব্যবস্থার সকল ত্রুটি সবিশেষ আন্দোলিত হয়।

সুইজারল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সাফল্যের কারণ

সুইজারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা সুইস নাগরিক জীবন হইতে আন্তর্জাতিক সকল জটিলতা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। ফলে সুইজারল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাগরিকগণ ওয়াকিবহাল ও সজাগ থাকিবার বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ সুইজারল্যাণ্ড স্বল্পসংখ্যক অধিবাসী লইয়া গঠিত ক্ষুদ্র এক পার্বত্য অঞ্চল। ফলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রচলন বিশেষ আয়াস-সাধ্য হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, ধনিক সম্প্রদায় ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থ সংক্রান্ত প্রভেদ বিশেষ প্রকট হইয়া উঠে নাই। সাধারণতঃ সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীগণ সকলেই সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত। সকলেই রাষ্ট্রনৈতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আগ্রহশীল। সুইজারল্যাণ্ডে পেশাদারী রাজনৈতিক কর্মীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ও দলীয় ব্যবস্থা কিছুটা সীমিত।

এতদ্ব্যতীত স্মরণ রাখা বিধেয় গণতান্ত্রিক কাঠামোতে জনসাধারণের হস্তে শাসনভার সমর্পণ করা হয়। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সরাসরি জনগণ শাসন বিভাগ পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন। অতএব এই ব্যবস্থার সাফল্য জনগণের প্রস্তুতির উপর বিশেষ নির্ভর করে। জনগণ শিক্ষিত সচেতন বা সজাগ না হইলে গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব নহে। সুইজারল্যাণ্ডের জনগণ অতীব সজাগ ও সচেতন। তাই সুইজারল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হইল দেশের এক স্বাভাবিক সৃষ্টি। সুইজারল্যাণ্ডের গণতন্ত্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"a natural growth of the soil which like plants flowing only on their own hillside and under their own sunshine।"

সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা—সারাংশ

সুইজারল্যাণ্ড ভৌগোলিক দিক দিয়া একটি পার্বত্য অঞ্চল। বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা এই অঞ্চলে বাস করিলেও গণতান্ত্রিক পরিবেশ গঠনে অসুবিধার সৃষ্টি হয় নাই। রাষ্ট্র সমবায়রূপে পরিচায়িত হইলেও প্রকৃতক্ষেত্রে ইহা যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুসারে লিখিত দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সংযোজিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রবর্তন সুইস সংবিধানের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গণউদ্যোগ গণসমাবেশ প্রভৃতির সাহায্যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কায়েম রাখা হয়।

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় যৌথ শাসন বিভাগ প্রবর্তিত হইয়াছে। শাসন বিভাগ নানা দিক দিয়া আইন সভার অধীনস্থ। আইন বিভাগ ও

শাসন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করিলে পার্লামেণ্টারী ও অপার্লামেণ্টারী রীতিনীতির সংমিশ্রণ দেখা যাইবে। শাসন বিভাগ আইন বিভাগকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানের বৈধতা বিচারের অধিকারী নহে।

Exercise

(1) Explain the salient features of the Swiss constitution.

(2) Discuss the nature of Swiss Federation.

(3) State the composition and functions of Federal Council in Switzerland.

(4) Write a short note on Federal Tribunal in Switzerland.

(5) Explain the operation of direct democracy in Switzerland.

শাসনতন্ত্র

সোবিয়েৎ ইউনিয়ন

প্রথম অধ্যায়

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থা

[স্তালিন সংবিধান শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক সংবিধানরূপে অভিহিত—লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়—শ্রমিক ও কৃষকদিগের সমাজতন্ত্র—যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা—বিচ্ছিন্ন হইবার নীতি—সাম্যনীতি—প্রেসিডিয়াম—অধিকার ও কর্তব্যের দলিল—একদলীয় ব্যবস্থা]

ভূমিকা

বর্তমান রুশ শাসন ব্যবস্থা অত্যাচারী জারের শাসন ব্যবস্থার পতন হইতে উদ্ভূত। ১৯১৭ সালের পর বিপ্লবের ফলে জারের শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে। কুশাসন, স্বৈরাচার ও অত্যাচারের অবসান ঘটাইয়া এক বিকল্প অবস্থার সৃষ্টির জন্য জনগণ তৎপর হইয়া উঠে ও রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে নূতন সংবিধানের জন্মলাভ ঘটে। ১৯১৮ সালে প্রথম সোভিয়েৎ সংবিধান গৃহীত হয়, পরে প্রয়োজনের চাপে ১৯৩৬ সালে নূতন করিয়া "স্তালিন সংবিধান" রচিত ও গৃহীত হয়।

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য (Salient Features of the Constitution)

১৯৩৬ সালের "স্তালিন সংবিধানকে" সোভিয়েৎ ইউনিয়নের জনগণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক সংবিধানরূপে অভিনন্দিত করে। এই সংবিধান অনুযায়ী সার্বজনীন, প্রত্যক্ষ ও গোপনভাবে নির্বাচন পরিচালিত হয়।

সংবিধানের প্রথম অধ্যায়ে সোবিয়েৎ ইউনিয়নকে শ্রমিক ও কৃষকদিগের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে অভিহিত করা হইয়াছে (a Socialist State of Workers and Peasants)। মেহনতী মানুষের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত সোবিয়েৎ সমূহে সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এই জন্য বলা হইয়াছে, "All powers in the U. S. S. R. belong to the toilers of the city and village ."

শ্রমিক ও কৃষকদিগের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

দ্বিতীয়তঃ, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন একটি যুক্তরাষ্ট্র। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ১৫টি প্রজাতন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত এক যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সোবিয়েৎ-নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ রাশিয়া গঠনে এক অস্থায়ী ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করিতে প্রথমে প্রয়াস পান। লেনিন বলিয়াছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইল সোবিয়েৎ সরকারের বিভিন্ন জাতিপুঞ্জকে

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিবার মহতী প্রয়াস। লেনিনের ভাষায় সোবিয়েৎ রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হইল, "the most solid unification of the different nationalities into a single democratic centralised Soviet State."

সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র বা রিপাব্লিকগুলির প্রজাতন্ত্র আবার কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বায়ত্ত-শাসন-সম্পন্ন প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত হইয়াছে। ১৯৪৪ সাল হইতে ইউনিয়ন রিপাব্লিকগুলি নিজস্ব সৈন্য সংরক্ষণের ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ব্যাপারে ইউনিয়ন রিপাব্লিকগুলির স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। অবশ্য সমস্ত ইউনিয়ন রিপাব্লিকগুলি কমুনিষ্ট দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া কোন ভাঙ্গন সোবিয়েৎ ইউনিয়নে লক্ষ্য করা যায় না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জটিলতা

১৭নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাব্লিকের যুক্তরাষ্ট্র হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ইউনিয়ন রিপাব্লিকের সীমানা নির্ধারণ করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট রিপাব্লিকের মত গ্রহণ করিতে হয়। সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধান ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম নহে।

বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার নীতি গৃহীত

তৃতীয়তঃ, সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। সুপ্রীম-সোবিয়েতের উভয় পরিষদে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটাধিক্যে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হইলেই সংবিধানকে সংশোধন করা সম্ভব।

লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান

চতুর্থতঃ, সোবিয়েৎ কমুনিষ্ট পার্টির মতে সংবিধান সাম্য-নীতির ভিত্তিতে রচিত ও গঠিত। প্রভু ভৃত্য, মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক সোবিয়েৎ ইউনিয়নে স্বীকার করা হয় না। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে সকলেই অংশ গ্রহণে সক্ষম।

সাম্যনীতি

পঞ্চমতঃ, ১৯৩৬ সালের স্তালিন সংবিধানে পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আইনসভা অর্থাৎ সুপ্রীম-সোবিয়েৎ হইতেই শাসন বিভাগের সদস্যগণকে মনোনীত করা হয়।

পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা

ষষ্ঠতঃ, সোবিয়েৎ ইউনিয়নে একজন রাষ্ট্রপতির স্থলে রাষ্ট্রপতি মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। একাধিক রাষ্ট্রপতির সমন্বয়ে এক প্রেসিডিয়াম গঠিত হইয়াছে।

প্রেসিডিয়াম

সপ্তমতঃ. সংবিধানে নাগরিকদিগের অধিকার ও কর্তব্য উভয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে। একদিকে সংবিধানে নাগরিকদিগের নানাবিধ পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, অপরদিকে নাগরিকদিগের রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বের কথা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

অধিকার ও কর্তব্য

অষ্টমতঃ, সোবিয়েৎ ইউনিয়নে কমুনিষ্ট দলকে একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দল হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে। একদলীয় প্রথায় গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করিতে পারে না বলিয়া অনেকে মনে করেন। দলীয় আধিপত্য সোবিয়েৎ ইউনিয়নে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। দলই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে ও নির্দেশ দান করে। Ogg ও Zinc বলেন "In point of fact the party is the Government in all except form, and the Communist dictatorship is the dictatorship of the Communist Party"।

একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে কমুনিষ্ট দল

দ্বিতীয় অধ্যায়

সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Soviet Federal System)

[১৫টি ইউনিয়ন রিপাব্লিকের সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত—অবশিষ্টাংশ ক্ষমতা রিপাব্লিকগুলিতে সন্নিবেশিত।— বিচ্ছিন্ন হইবার নীতি—সংবিধানের বৈধতা বিচারে আদালত অপারগ]

১৫টি ইউনিয়ন রিপাব্লিক লইয়া সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। রিপাব্লিকসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও স্বেচ্ছায় সম্মিলিত হইয়া এই যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই রিপাব্লিকগুলি যথাক্রমে হইল রুশ যুক্তরাষ্ট্রীয় রিপাব্লিক (The Russian Soviet Federative Socialist Republic), ইউক্রেনের রিপাব্লিক, বাইলো-রাশিয়ার রিপাব্লিক, আজারবাইজান রিপাব্লিক, জর্জিয়ার রিপাব্লিক, আর্মেনিয়ান রিপাব্লিক, তুর্কমেন, এস্তোনিয়ায় উজবেক,

রিপাব্লিকসমূহ একত্রিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে

তাজিক, কাজাক, কিরঘিজ, মোল্ডেভিয়ার লিথুয়ানা ও, ল্যাটাভিয়ার রিপাব্লিক।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয়করণের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র

সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয়করণের ভিত্তিতে গঠিত। লেনিন বলেন, সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়করণের ভিত্তিস্বরূপ। তাঁহার ভাষায়, ইহা "the most solid unification of the different nationalities into a single democratic centralised Soviet State"।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের রিপাব্লিকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাব্লিকে বিভক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল ও জাতীয় এলাকা সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে সংযোজিত হইয়াছে।

অবশিষ্টাংশ ক্ষমতা

সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশ (residuary) ক্ষমতা ইউনিয়ন রিপাব্লিকগুলির হস্তে সমর্পিত হইয়াছে।

ইউনিয়ন রিপাব্লিকের কোন সীমানা নির্ধারণ বা পরিবর্তন করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট রিপাব্লিকের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়।

রিপাব্লিকগণের সৈন্য মোতায়েন সংক্রান্ত ক্ষমতা

সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ইউনিয়ন রিপাব্লিকগুলি নিজ নিজ সৈন্য সংরক্ষণের অধিকার লাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় ও নিয়ন্ত্রণে রিপাব্লিকগুলির স্বাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। রাষ্ট্রদূত বিনিময়, কূটনৈতিক সম্পর্ক গঠন ও নিয়ন্ত্রণ রিপাব্লিক সমূহের ক্ষমতার এলাকাভুক্ত। সোবিয়েৎ কমুনিষ্টপার্টি সকল ইউনিয়ন রিপাব্লিকের সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে ইউনিয়ন রিপাব্লিকের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব। অবশ্য কোন ইউনিয়ন রিপাব্লিকের পক্ষে বাস্তবে এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ প্রায় অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

দেশের নিরাপত্তা ও বিচ্ছিন্ন হইবার নীতি

রিপাব্লিকের জনগণের একাংশ কোন প্রকার বিচ্ছিন্ন হইবার দাবী জানাইলে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ রূপে আখ্যায়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এতদ্ব্যতীত লেনিন

ও স্তালিন উভয়ে বিশ্বাস করিতেন যে সমগ্র দেশের সংহতি ও নিরাপত্তা "বিচ্ছিন্ন হইবার নীতির" জন্য বিনষ্ট করা উচিত হইবে না। স্তালিন বলিয়াছিলেন, "the various demands of democracy and among others the right of self-determination have no absolute value.······In concrete instances the interest of the part may conflict with the interests of the whole. If that is so, we must repudiate the part."

কার্যক্ষেত্রে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন রিপাব্লিকগুলির ক্ষমতা বিশেষ সীমিত। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা দ্বারা সমগ্র সোবিয়েৎ ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিকল্পিত। স্থানীয় ব্যাপারেও এই সম্বন্ধে ইউনিয়ন রিপাব্লিকগুলির কোন ক্ষমতা স্বীকৃত হয় নাই। অর্থনৈতিক ব্যাপারে জাতীয় সরকারের এক-চেটিয়া অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। ১৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে কর ও রাজস্ব এবং বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে কেন্দ্রিকতার প্রবণতা স্বীকৃত হইয়াছে। "Approval of the single State budget of the U. S. S. R. as well as of the taxes and revenues which go to the All-Union, Republican and local budgets"—ইত্যাদি কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সমর্পিত হইয়াছে।

রিপাব্লিকগুলির ক্ষমতা সীমিত

সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করা সোবিয়েৎ আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত। সাধারণতঃ সংবিধানের ব্যাখ্যাকার ও অভিভাবক হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতগুলির অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সোবিয়েৎ ইউনিয়নে সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে প্রেসিডিয়ামের উপর, এবং এক্ষেত্রে আদালতের কোন ক্ষমতা স্বীকার করা হয় নাই। সুপ্রীম সোবিয়েতের নিকট দায়িত্বশীল প্রেসিডিয়ামের দায়িত্ব, সংবিধান ব্যাখ্যা করা।

অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করা সোবিয়েৎ আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত

তৃতীয় অধ্যায়

সুপ্রীম সোবিয়েৎ (Supreme Soviet)

[দ্বিপরিষদীয় সোবিয়েৎ আইনসভা, কমুনিষ্ট পার্টি আইনের খসড়া প্রণয়নে সক্ষম, মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়ী—রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে প্রেসিডিয়াম]

ইউনিয়নের সোবিয়েৎ (The Soviet of Union) ও জাতিপুঞ্জের সোবিয়েৎ (The Soviet of the Nationalities) এই দুইটি পরিষদ লইয়া সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েৎ গঠিত। প্রত্যক্ষ ভোটে দুই পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। সুপ্রীম সোবিয়েতের কার্যকালের মেয়াদ সাধারণতঃ চারি বৎসর। সুপ্রীম সোবিয়েতের উভয় পরিষদের ক্ষমতা একই প্রকার। উভয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভের পর বিল আইনে পরিণত হয়। সংশোধন প্রস্তাবের কার্যকারিতা উভয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। দুইটি পরিষদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে আপোষ কমিশনের সাহায্য পাওয়া যায় কিন্তু মীমাংসা সম্ভব না হইলে প্রেসিডিয়াম উভয় পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

দুইটি পরিষদ লইয়া সুপ্রীম সোবিয়েৎ গঠিত

প্রায় প্রতি তিন লক্ষ লোকের জন্য সুপ্রীম সোবিয়েতে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। নির্বাচকমণ্ডলী পদচ্যুতি পদ্ধতির (recall) সহায়তায় প্রতিনিধিগণের সদস্যপদ বাতিল করিয়া দিতে পারেন। প্রত্যেক পরিষদে একজন সভাপতি ও চারিজন সহসভাপতি নির্বাচিত হয়।

সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রতিনিধি নিয়োগ পদ্ধতি

সুপ্রীম সোবিয়েৎ সমগ্র সোবিয়েৎ ইউনিয়নের জন্য আইন প্রণয়নে সক্ষম। কমিউনিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটি সুপ্রীম সোবিয়েতের নিকট আইনের প্রস্তাব পেশ করিতে পারে।

কমুনিষ্ট পার্টি আইনের খসড়া পেশ করিতে সক্ষম

সুপ্রীম সোবিয়েৎ, প্রেসিডিয়ামের সদস্যবৃন্দ, সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ ও প্রোকিউরেটর জেনারেলকে নিয়োগ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম সোবিয়েতের নিয়োগ ক্ষমতার ব্যাপকতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

নিয়োগ ক্ষমতা

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ
(Council of Ministers)

সরকারীভাবে মন্ত্রিপরিষদের হস্তে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত। সুপ্রীম সোবিয়েৎ কর্তৃক এই মন্ত্রিপরিষদ নিযুক্ত হয় এবং সুপ্রীম সোবিয়েতের নিকট মন্ত্রি-পরিষদ দায়ী থাকে।

মন্ত্রিপরিষদ সুপ্রীম সোবিয়েতের নিকট দায়ী

প্রায় ৫০ জন সদস্য সমন্বয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত। মন্ত্রিপরিষদের বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। এইরূপ বিশাল এক পরিষদের পক্ষে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের শাসন ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণ সম্ভব নহে, ফলে তেরজন সহকারী প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রীসহ এক পরিষদের উপর নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে। যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুকূল হিসাবে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে দুই শ্রেণীর মন্ত্রী নিয়োগ করা হইয়াছে, যথা—ইউনিয়ন মন্ত্রী ও রিপাব্লিকান মন্ত্রী।

মন্ত্রিপরিষদের গঠন

মন্ত্রি-পরিষদ যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা আদেশ জারি করে তাহাদের ভিত্তি হইল প্রচলিত আইন। মন্ত্রি-পরিষদই আইন কার্যকর হইতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য করে। মন্ত্রি-পরিষদ কেন্দ্রীয় ও রিপাব্লিকান মন্ত্রীদিগের কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে।

আইনের কার্যকারিতা ও মন্ত্রিপরিষদ

বাজেট কার্যকর করা বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া অথবা আর্থিক ব্যাপার সুদৃঢ় করা সুপ্রীম সোবিয়েতের কর্তব্য। সশস্ত্র বাহিনীর সাধারণ সংগঠন ও পররাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করা অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও দেশরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোবিয়েতের এক্তিয়ারভুক্ত কর্তব্য।

প্রেসিডিয়াম (Presidium)

কোন একজন ব্যক্তি সোবিয়েৎ ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি বা শাসক-প্রধান নহে। কয়েকজন ব্যক্তির সমন্বয়ে প্রেসিডিয়াম গঠিত হইয়াছে। সুপ্রীম সোবিয়েতের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে প্রেসি-ডিয়ামের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম

রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী

সোবিয়েতের নিকট দায়ী ও প্রত্যেক প্রেসিডিয়ামের সদস্যকে তাহার কার্যের জন্য সুপ্রীম সোবিয়েতের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। একজন সভাপতি, পনেরজন সহ-সভাপতি, একজন সেক্রেটারী এবং পনেরজন অপরাপর সদস্য সমন্বয়ে প্রেসিডিয়াম গঠিত।

স্থায়ী কমিটির স্থান গ্রহণ করিয়াছে

প্রেসিডিয়াম একটি স্থায়ী কমিটির অভাব পূরণ করিয়াছে। সুপ্রীম সোবিয়েতের অধিবেশন না থাকিলে প্রেসিডিয়ামই সুপ্রীম সোবিয়েতের সকল কার্য সম্পাদন করে।

আদেশ জারি করিবার ক্ষমতা

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের আইনসমূহ প্রেসিডিয়াম ব্যাখ্যা করে। আইন অনুযায়ী আদেশ (decree) জারি করিতে পারে। সুপ্রীম সোবিয়েতের দুইটি পরিষদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত উপস্থিত হইলে সুপ্রীম সোবিয়েতকে ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ জারি করিতে পারে। আইনানুগ না হইলে বা বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকিলে, প্রেসিডিয়াম, মন্ত্রি-পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ বাতিল করিয়া দিতে পারে।

অস্থায়ী মন্ত্রী নিয়োগ বদল ও যুদ্ধ ঘোষণা

সুপ্রীম সোবিয়েতের অধিবেশনের অন্তর্বর্তী সময় মন্ত্রি-পরিষদের সুপারিশ-ক্রমে অস্থায়ী মন্ত্রী নিয়োগ বা বদল করিবার ক্ষমতা প্রেসিডিয়ামের আছে। সৈন্যদলের যে কোন অধিনায়ক নিয়োগ বা অপসারণ করা, চুক্তি অনুমোদন বা পরিবর্তন বা নাকচ করা প্রভৃতি প্রেসিডিয়ামের কার্যের অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ব্যতীত বিদেশে নিযুক্ত সোবিয়েৎ কর্মচারীদিগের বিরুদ্ধে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব পেশ করিতে প্রেসিডিয়াম সক্ষম। সুপ্রীম সোবিয়েতের অধিবেশন না থাকা-কালীন অবস্থায় সোবিয়েৎ ইউনিয়নের কোন অংশে বৈদেশিক আক্রমণ হইলে যুদ্ধ ঘোষণা করা প্রেসিডিয়ামের কার্যের এলাকাভুক্ত। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করা বা সামরিক আইন জারি করা ও আংশিকভাবে সৈন্য সমাবেশ করাও প্রেসিডিয়ামের অন্যতম কার্য।

গণভোট

প্রেসিডিয়াম নিজ দায়িত্বে গণভোটের ব্যবস্থা করিতে পারে। ইউ-নিয়নের পক্ষ হইতে সম্মানসূচক খেতাব বিতরণ প্রেসি-ডিয়ামের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। অপরাধীর অপরাধ মার্জনা করিবার ক্ষমতা প্রেসিডিয়ামের আছে।

সুপ্রীম সোবিয়েতের অধিবেশনকালে প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ উপস্থিত থাকেন এবং প্রেসিডিয়ামের সভাপতি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতির কার্য সম্পাদন করেন। প্রেসিডিয়ামের কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নাই। কিন্তু আইনের ব্যাখ্যাকার হিসাবে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে প্রেসিডিয়াম বর্তমান।

সুপ্রীম সোবিয়েৎ ও প্রেসিডিয়াম

চতুর্থ অধ্যায়

রাশিয়ায় মৌলিক অধিকার ও নাগরিকের দায়িত্ব

(Rights and Duties of Soviet Citizens)

[সোবিয়েৎ নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য উভয়ের উল্লেখ সংবিধানে রহিয়াছে]

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সংবিধানে নাগরিকগণকে প্রদত্ত সকল অধিকার সার্বজনীনভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে এই অধিকারের জন্ম হইয়াছে, ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা অপেক্ষা সামগ্রিক সমাজের স্বাধীনতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সোবিয়েৎ সংবিধানে কেবলমাত্র অধিকারের উল্লেখ করা হয় নাই, সেই সাথে দায়িত্বের উল্লেখও করা হইয়াছে। এইজন্য সিডনী ওয়েব (Sidney Webb) সোবিয়েৎ সংবিধান সম্বন্ধে বলেন, "the most important innovation is the enshrinement in the constitution of a new set of the rights of man."

সোবিয়েৎ সংবিধানে অধিকার ও দায়িত্বের উল্লেখ হইয়াছে

সংবিধানে নানাবিধ অধিকারের মধ্যে নাগরিকের কর্মের অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। এই অধিকারের বিশ্লেষণে বলা হইয়াছে, সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল নাগরিকের কর্মসংস্থান করা হইবে।

কর্ম, সংস্থান

নাগরিকদিগের বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। অধিকাংশ শ্রমিকের দৈনিক কার্যকালের মেয়াদ সাত ঘণ্টা বলিয়া ধার্য হইয়াছে। বেতনসহ বাৎসরিক ছুটির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিশ্রাম ও অবসর বিনোদন

বৃদ্ধ বয়সে নাগরিকদিগের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত অসুস্থ হইলে বা কর্মক্ষমতা হ্রাস পাইলেও ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

বৃদ্ধ ভাতা

নাগরিকদিগের শিক্ষা পাইবার অধিকার আছে। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ফ্যাক্টরীর সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অবৈতনিক কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সংবিধানে নাগরিকদিগের বাক্‌স্বাধীনতা, মুদ্রণের স্বাধীনতা, সমবেত হইবার ও শোভাযাত্রা পরিচালনার স্বাধীনতা আছে।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

শ্রমিক সংস্থা বা সমবায় সমিতি গঠনের অধিকার সংবিধানে স্বীকার করা হইয়াছে।

শ্রমিক সংস্থা

অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নাগরিকগণকে প্রদান করা হইয়াছে। ধর্মের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচার কার্য চালাইবার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে।

সাম্য

সোবিয়েৎ নাগরিকবৃন্দের দায়িত্ব

সোবিয়েৎ ইউনিয়নে স্বীকার করা হইয়াছে, অধিকার ও দায়িত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে পরস্পর জড়িত। দায়িত্ব পালন ব্যতিরেকে অধিকার অর্জন করা অসম্ভব। সংবিধানকে শ্রদ্ধা করা ও সংবিধানের আইন মান্য করা নাগরিকবৃন্দের অন্যতম মহান দায়িত্ব। শ্রমিকদিগের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা, দায়িত্বের এলাকাভুক্ত। সামাজিক দায়িত্ব পূরণ এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর আইন মানিয়া চলা বা রাষ্ট্রের সম্পত্তি রক্ষা করাও নাগরিকের কর্তব্য। "যে কাজ করে না সে খাইবে না" (He who does not work cannot eat), যাহার যতটা ক্ষমতা সে ততটা সমাজকে দিবে এবং কার্যের পরিমাণ ও গুণ অনুসারে সে সামগ্রিক উৎপাদনের অংশ ভোগ করিবে ইত্যাদি কতকগুলি নীতির ভিত্তিতে মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব গঠিত। সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

কমুনিষ্ট দল

[একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে কমুনিষ্ট দল স্বীকৃত—কেন্দ্রীয়করণ নীতি—পিরামিডের আকারে গঠন—পলিট ব্যুরো সমতার উৎস—দলীয় নিয়মানুবর্তিতার প্রাধান্য—আঞ্চলিক ও শাখা সংস্থা]

সমগ্র সোবিয়েৎ ইউনিয়নে একটিমাত্র দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই একদলীয় ব্যবস্থা সোবিয়েৎ ইউনিয়নের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বলা হইয়াছে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সকল মেহনতী মানুষের মুখপাত্র হিসাবে কমুনিষ্ট দল বিদ্যমান অতএব অন্য দলের অবস্থান অপ্রয়োজনীয়। শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থায় একাধিক দলের অবস্থান বিসদৃশ। অবশ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে এই যুক্তি মানিয়া লওয়া অসম্ভব। স্তালিন বলিয়াছিলেন, "The leader of the State, the leader within the system of the dictatorship of the Proletariat is the party alone, the party of the proletariat, the party of the Communist, which does not and cannot share that leadership with other parties."

একদলীয় ব্যবস্থা

বিরোধীদলের কোন অস্তিত্ব সোবিয়েৎ ইউনিয়নে স্বীকৃত হয় নাই। দলের সদস্য সংখ্যা প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিতান্ত অল্প ছিল, বর্তমানেও সদস্য সংখ্যা কতকটা সীমিত রাখা হইয়াছে।

সীমিত সদস্য সংখ্যা

কমুনিষ্ট দলের নেতৃত্বে শ্রমিক সংস্থা, যুব সংস্থা ইত্যাদি আপন আপন ক্ষেত্রে কার্য পরিচালনা করে।

শাখা সংস্থা

কমুনিষ্ট দলের অধিকাংশ সদস্য যুবক-যুবতীদিগের মধ্য হইতে গৃহীত। সদস্যদিগের শিক্ষাগত মান বেশ উন্নত। বহু সদস্য সরকারী কার্যে বা নানা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ব্যাপারে জড়িত।

যুবশক্তি

দলীয় নিয়মানুবর্তিতা অতীব প্রকটরূপে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে প্রতিফলিত। দলীয় নীতি হিসাবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়করণ (democratic centralisation) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল দলীয় ছোট বড় সংস্থার সদস্যবৃন্দ নির্বাচনের সম্মুখীন হইবেন, সংস্থাগুলি দলকে বিবরণ প্রদানের মাধ্যমে ওয়াকিবহাল রাখিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কঠোর দলীয় নিয়মানুবর্তিতা প্রযুক্ত হইয়াছে। উচ্চতন সংস্থার নির্দেশ নিম্নতন সংস্থাগুলি সকল অবস্থায় বিনা প্রশ্নে মানিতে বাধ্য থাকে।

দলীয় নিয়মানুবর্তিতার কাঠিন্স

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের কমুনিষ্ট দল আত্ম-সমালোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। দলীয় সমাবেশে আলোচনা ও সমালোচনার পূর্ণ সুযোগ প্রদান করা হয় এবং দলীয় দুর্বলতা ও ত্রুটি অনুসন্ধানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

আত্ম-সমালোচনা

দলের গঠন (Organisation)

কমুনিষ্ট দলের গঠন পিরামিডের আকৃতিতে গঠিত। সর্বোচ্চ দলীয় কংগ্রেসের অবস্থান এবং সর্বনিম্নে অসংখ্য প্রাথমিক দলীয় সংস্থা। ১৯৪৬ সালের প্রাভদা সংবাদপত্রের হিসাব অনুসারে ২০০,০০০টি প্রাথমিক সংস্থা সোবিয়েৎ ইউনিয়নে বিদ্যমান ছিল। কারখানা, খামার, গ্রাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে যদি তিনজন দলীয় সদস্য থাকে তাহা হইলেই প্রাথমিক সংস্থা গঠিত হওয়া সম্ভব। সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে দলীয় সংস্থার গুরুত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যে ক্ষেত্রে ১৫ জন সদস্য লইয়া প্রাথমিক সংস্থা গঠন করা সম্ভব হয় সে ক্ষেত্রে বুরো (bureau) নির্বাচন করা হয়, কার্যকরী সমিতি হিসাবে কার্য পরিচালনার জন্য। সেক্রেটারী বা সচিবই হইলেন প্রাথমিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সদস্যগণের অধিকাংশই বেতনভোগী।

প্রাথমিক সংস্থাগুলির ঠিক উপরে সহর বা জিলা কমিটি (City or District Committees)। প্রত্যেক জিলা ও সহর কমিটিতে একটি বুরো ও তিনজন সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হয়। দলীয় কমিটি কনফারেন্স ইত্যাদির ব্যবস্থাও আছে। রিপাব্লিকান কংগ্রেসে যে সকল সহর ও

জিলার প্রতিনিধি প্রেরিত হন তাঁহাদের সহর ও জিলার কনফারেন্স নির্বাচন করে।

জিলা ও সহর কমিটির উর্দ্ধে আঞ্চলিক দলীয় সংস্থার অবস্থান (area party organisation)। এই সংস্থাগুলিতে একটি বুরো ও চারিজন সেক্রেটারী নির্বাচন করা হয়।

দলীয় গঠনের শীর্ষস্থানে দলীয় কংগ্রেসের অবস্থান। সামগ্রিকভাবে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের কমুনিষ্ট দলের নিয়ন্ত্রণ দলীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। একটি কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন করা হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ রাজনৈতিক বুরোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে। এতদ্ব্যতীত সাংগঠনিক বুরো ও কয়েকজন সেক্রেটারীর সমন্বয়ে এক সেক্রেটারিয়েট নির্বাচনও করা হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে প্রতি চারি বৎসর অন্তর এই দলীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আহূত হয়। দলের কর্মসূচী ও নির্দেশ কংগ্রেসের মাধ্যমে সংশোধিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটিকে ছয়মাস অন্তর অন্ততঃ একবার সভায় মিলিত হইতে হয়। দলের নিয়ম শৃংখলা রক্ষা করা কংগ্রেসের অন্যতম কার্য। দলীয় নিয়ম ভঙ্গকারীকে বিশেষ শাস্তি প্রদান করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসের আছে। এক কথায় সমগ্র দলের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও পরিচালনার মূলে দলীয় কংগ্রেস।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিচার ব্যবস্থা

[সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গঠনে সোবিয়েৎ আদালতের ভূমিকা—জনগণের আদালত—আদিম ও আপীল বিভাগ—ট্রাইবুন্যাল—সংবিধান সংক্রান্ত প্রশ্নের বৈধতা বিচারে অপারগ]

সমাজতান্ত্রিক কাঠামো নির্মাণে সোবিয়েৎ আদালতগুলির গুরুত্ব

সোবিয়েৎ আদালতগুলির মাধ্যমে সোবিয়েৎ সমাজতান্ত্রিক কাঠামো ও আইন সার্থকতা লাভ করে। বিচারালয়ের মাধ্যমে সোবিয়েৎ সরকারের শত্রু দমন পূর্বক সোবিয়েৎ ব্যবস্থায় সুদৃঢ় মেহনতী জনগণের সোবিয়েৎ সমাজতান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

সোবিয়েৎ বিচার ব্যবস্থায় জনগণের অংশ গ্রহণের অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। বিচারের কার্যের সহিত জনগণের যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। প্রকাশ্যভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য এবং জনগণের এ্যাসেসরদিগের সহযোগিতায় বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হইবার ফলে বিচার ব্যবস্থায় জনগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জনগণের আদালতের মাধ্যমে জনগণকে বিচারকার্যে উৎসাহী করা সম্ভব হইয়াছে। জনগণই জুরীর কর্তব্য সম্পাদন করেন। সহর ও গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীগণ সক্রিয়ভাবে সোবিয়েৎ বিচার ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করেন।

জনগণের অংশ গ্রহণ

মূল এলাকা সংক্রান্ত মামলায় একজন বিচারক ও দুইজন এ্যাসেসরের সাহায্যে বিচারকার্য পরিচালিত হয়। নিম্ন আদালত সমূহের বিচারকগণ সার্বজনীন প্রত্যক্ষ গোপন ব্যালটের ভিত্তিতে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। উচ্চতম আদালত সমূহের বিচারকগণকে, সংশ্লিষ্ট সোবিয়েৎ দলীয় সংস্থার সহিত পরামর্শক্রমে নির্বাচিত করে। নিম্নতন আদালতের বিচারকগণ ও উচ্চতম আদালতের বিচারকগণ যথাক্রমে তিন বৎসর ও পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।

মূল এলাকার বিচার

সোবিয়েৎ ইউনিয়নে একই প্রকার আদালতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও অংগরাজ্য বা রিপাব্লিকের আদালতগুলির মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করা হয় নাই। ১৯৩৬ সালের স্তালিন সংবিধান অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের গুরুত্ব ও ক্ষমতা সবিশেষ বৃদ্ধি লাভ করে। সুপ্রীম কোর্টই সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত। সোবিয়েৎ বিচার ব্যবস্থায় যতদূর সম্ভব জটিলতা পরিহার করা হইয়াছে। সহজ সরল সাধারণের বোধ্য বিচার পদ্ধতি অনুসৃত হওয়ায় সাধারণ লোকের হয়রানি কম হয়।

সুপ্রীম কোর্টের গুরুত্ব

সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিশেষ আদালত (special courts), জনগণের আদালত (peoples' courts), ইউনিয়ন রিপাব্লিকগুলির সুপ্রীম কোর্ট, রাষ্ট্রক্ষেত্র অঞ্চল, স্বাতন্ত্র্য সম্পন্ন অঞ্চল ও এলাকাগুলির আদালত বিদ্যমান।

অন্যান্য আদালত

জনগণের আদালতের ভিত্তিতে সোবিয়েৎ বিচার ব্যবস্থা গঠিত হইয়াছে।

জনগণের আদালতে ছোটখাট ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার হয়।

জনগণের আদালত

নাগরিকদিগের নির্বাচন সংক্রান্ত অধিকার সংরক্ষণের ভার জনগণের আদালতের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। জনগণের আদালতগুলির মামলার আপীল করা হয় রাষ্ট্রক্ষেত্র অঞ্চল এলাকা স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল ও জাতীয় এলাকার আদালতগুলিতে।

সুপ্রীম আদালতের বিভিন্ন এলাকা

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের, ফৌজদারী, দেওয়ানী ও সামরিক প্রভৃতি এলাকা বিদ্যমান আছে। এতদ্ব্যতীত বিশেষ আদালত সমূহের আপীলের শুনানী এই সুপ্রীম কোর্টে অনুষ্ঠিত হয়।

নিম্নতন আদালতের শাখা বিভাগ

নিম্নতন আদালতগুলিকে পুনরায় জনগণের আদালত ও কমরেড কোর্ট এই দুইভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। উচ্চতন আদালত সমূহের সংশোধনী কার্যই অধিক। নিম্ন আদালতের বিবরণের ভিত্তিতে উচ্চতন আদালত সংশোধন ও পরিশোধনের প্রয়াস পায়। সাধারণতঃ সাক্ষী পরীক্ষা বা অন্যান্য জটিলতার সৃষ্টি উচ্চতন আদালতে করা হয় না। সুপ্রীম কোর্ট প্রায়শঃই নীতি নির্ধারণ-পূর্বক নিম্নতন আদালতসমূহে নির্দেশ প্রেরণ করে।

ট্রাইব্যুনাল

সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সমগ্র সোবিয়েৎ ইউনিয়নের জন্য সামরিক, রেলওয়ে ও জলযান সংক্রান্ত তিনটি ট্রাইব্যুনাল আছে।

সংবিধানের বৈধতা প্রশ্ন উত্থাপনে অক্ষম

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের আইনের বৈধতা ও সংবিধান-গত যৌক্তিকতার কোন প্রশ্ন সুপ্রীম কোর্ট উত্থাপন করিতে পারে না। এই সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রেসিডিয়ামের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। অতএব সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাকার হিসাবে কার্য করিতে অপারগ। সুপ্রীম কোর্টের কার্য হইল সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের বিচারালয়গুলির পর্যবেক্ষণ করা, অর্থাৎ "to watch over the judicial action of the organs of justice of the U. S. S. R. and the Union Republics."

সারাংশ

সোবিয়েৎ শাসন ব্যবস্থায় লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সংযোজিত হইয়াছে। শ্রমিক ও কৃষকদিগের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রবর্তনে সংবিধান এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা। যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইউনিয়ন রিপাব্লিকগুলির বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সোবিয়েৎ শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডিয়ামের হস্তে সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। সংবিধানে নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব উভয়েরই উল্লেখ আছে। সংবিধানে কমুনিষ্ট দলকেই একমাত্র দল হিসাবে স্বীকৃতি দান করা হইয়াছে।

প্রায় ৬০ জন সদস্যের সমন্বয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হইয়াছে। মন্ত্রিপরিষদ সুপ্রীম সোবিয়েতের নিকট দায়ী। জাতিপুঞ্জ সোবিয়েৎ ও যুক্তরাষ্ট্রের সোবিয়েৎ—এই দুইটি পরিষদ লইয়া সুপ্রীম সোবিয়েৎ গঠিত।

৩২ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত প্রেসিডিয়াম রাষ্ট্রপ্রধানের কার্য সম্পাদন করে। শাসন ব্যবস্থার সকল ক্ষমতা প্রেসিডিয়ামের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।

পিরামিডের আকারে কমুনিষ্ট দলের কাঠামো গঠিত। দলীয় সংগঠনে কেন্দ্রীয়করণের প্রভাব দেখা যায়। পলিটব্যুরো হইল দলীয় ক্ষমতার উৎস। সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয় হইল সুপ্রীম কোর্ট। আদিম ও আপীল উভয় বিভাগই বিচার ব্যবস্থায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিচারপদ্ধতি সহজ ও সরল। সংবিধান সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের বৈধতা নির্ণয়ের ক্ষমতা সোবিয়েৎ আদালতের নাই।

Exercise

1. Discuss the salient features of the Soviet Constitution.

2. Describe the fundamental rights and duties of a Soviet citizen.

3. Write a short note on the Communist Party of the U. S. S. R.

4. Discuss the judicial system of the U. S. S. R.

5. Discuss the composition and functions of the Soviet Presidium.

শাসনতন্ত্র

ভারতের সংবিধান

প্রথম অধ্যায়

ভারতের সংবিধান

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

[১৯১৯ সালের মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার—সাইমন কমিশন—১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন—১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা আইন—১৯৫০ সালের প্রজাতন্ত্র]

১৯১৯ সালের মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার হইতে ভারতে পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার প্রথম বীজ বপন করা হয়। এই শাসন সংস্কারের মাধ্যমেই ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়। মণ্টেগু ও চেমস্‌ফোর্ড উভয়েই স্থির করেন আঞ্চলিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হইবে। বিভিন্ন প্রদেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কার্যকর হয়। শাসন সংক্রান্ত বিভাগগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। রাজ্যপালের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত বিষয় (Reserved subjects)গুলি পরিচালিত হইত এবং জনপ্রতিনিধিমূলক শাসনের নিদর্শন স্বরূপ হস্তান্তরিত বিষয় সমূহ (Transferred subjects) আইন সভার সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত মন্ত্রিসভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। কিন্তু বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিতে হয় যে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কোনরূপ দায়িত্বশীল ব্যবস্থা স্বীকৃত হয় নাই। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট সকল ব্যাপারে ভারত সরকার দায়ী ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে কতকগুলি ব্যাপারে ক্ষমতার বণ্টনের মাধ্যমে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ইঙ্গিত সূচিত হয়। কেন্দ্রে এক দ্বিপরিষদীয় আইন সভা গঠন করা হয়। নয়টি প্রধান ও আটটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রদেশ লইয়া ভারতের শাসন ব্যবস্থা গঠিত হয়।

একথা বলাই বাহুল্য মাত্র যে ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা সম্ভব ছিল না। দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কার্যে যুক্ত প্রত্যেক কর্মচারী নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট এবং চরমভাবে মন্ত্রীর নিকট দায়ী থাকেন। অপর পক্ষে মন্ত্রিগণ জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যগণ লইয়া সংগঠিত

আইন সভার নিকট দায়ী থাকেন। সামগ্রিকভাবে দায়িত্বশীল ব্যবস্থায় আইন সভা নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকেন। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কারে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সংবিধানগতভাবে আইন সভার নিকট শাসন বিভাগ একেবারেই দায়ী ছিলেন না, প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় গভর্নর বা রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের ফলে এবং আইন সভার মন্ত্রিগণকে অপসারিত করিবার ক্ষমতা না থাকায় দায়িত্বশীল সরকার গঠন সম্ভব হয় নাই।

১৯২৭ সালে, সাইমন কমিশনের সদস্যগণ ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার দ্বারা প্রবর্তিত সরকারের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করিতে আসেন। ইহার পর ১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর ভাইসরয় লর্ড আরউইন (Irwin) ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সহিত গোল টেবিল বৈঠকে মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে বৈঠকের প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়। কংগ্রেস দল ঐ বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে যোগদানের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন, পরে গান্ধীজীর সহিত লর্ড আরউইনের এক আপোষ মীমাংসা হয় এবং কংগ্রেস পরবর্তী অধিবেশন-গুলিতে যোগদান করেন। গোল টেবিল বৈঠকের (Round Table Confeŕence) সকল প্রস্তাব ও দৃষ্টান্তের সমন্বয়ে এক হোয়াইট পেপার (white paper) প্রকাশ করা হয়। হোয়াইট পেপারে নিবদ্ধ বক্তব্যগুলি লর্ড লিনলিথগোর (Linlithgow) সভাপতিত্বে গঠিত এক যুক্ত সিলেক্ট কমিটির নিকট পেশ করা হয়। ঐ যুক্ত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার বিল (Government of India Bill, 1935) প্রণয়ন করা হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন অনুসারে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটে এবং বহুলাংশে দায়িত্বশীল সরকারের বৈশিষ্ট্য প্রাদেশিক সরকারগুলিতে সংযোজিত হয়। কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়। বস্তুতঃ ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তন, প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল সরকার গঠন সম্ভব হয়। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত, উপজাতীয় ও খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত সকল ব্যাপার গভর্নর-জেনারেলের জন্য সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এতদ্ব্যতীত

স্ববিবেচনায় (Discretion) ও ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি (Individual Judgement) দ্বারা সকল ব্যাপার পরিচালনা করিবার ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেলের হস্তে সমর্পিত হয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

যাহা হউক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হইতে ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন স্থগিত রাখা হয় এবং ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার ব্যবস্থায়, শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act—1947) দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব হয়। এই আইন দ্বারা ভারত ও পাকিস্তান দুইটি ডোমিনিয়নের সৃষ্টি হয় এবং এই ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে এক অন্তর্বর্তী সরকার (Interim Government) গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের আইন বলে ভারতীয় ডোমিনিয়নের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্রী ভারত ঘোষিত হয়, ১৯৪৯ সালের গণপরিষদে গৃহীত সংবিধানের কাঠামোর ভিত্তিতে গঠিত ১৯৫০ সালের ভারতীয় সংবিধানের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রস্তাবনা

[প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য—সার্বভৌমিকতা—গণতন্ত্র—প্রজাতন্ত্র—ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ও কমনওয়েলথ]

প্রস্তাবনা

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে ভারত এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic)। ভারতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়া

হইয়াছে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে অধ্যাপক বার্কার তাঁহার "Principles of Social and Political Theory" নামক পুস্তকে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যায় যে ১৯৪৬ সালে ১৩ই ডিসেম্বর গণপরিষদে (Constituent Assembly) শ্রীনেহেরু যে প্রস্তাব পেশ করেন মূলত তাহার ভিত্তিতে প্রস্তাবনা গৃহীত হয়।

সাধারণভাবে প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য, সংবিধানের নীতি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা। যদিও প্রস্তাবনার কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই, তথাপি প্রস্তাবনার গুরুত্ব কম নহে। ভারতীয় সংবিধানের আদর্শ উদ্দেশ্য ও নীতি এই প্রস্তাবনার মাধ্যমে প্রতিভাত হইয়াছে। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায় বিচার ও গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের আশ্বাস প্রস্তাবনার প্রতি শব্দে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। চরম সার্বভৌম ক্ষমতা ভারতীয় জনগণের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। অর্থাৎ জনসাধারণই সংবিধানের আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি স্বরূপ।

প্রস্তাবনার গুরুত্ব

প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে "আমরা ভারতবর্ষের জনসাধারণ ভারতবর্ষে এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার মহান মানসে এবং জনগণের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও নৈতিক ন্যায়বিচার, স্বাধীন চিন্তাধারা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্মমত ও উপাসনার ক্ষমতা, সমান সুযোগ-সুবিধা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতির ঐক্য রক্ষা ও বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর তারিখে এই সংবিধান আইনবদ্ধ, অনুমোদিত ও গ্রহণ করিতেছি।"

সার্বভৌম শব্দের সাহায্যে ভারতীয় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও চরম ক্ষমতার কথা বুঝান হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ দিক দিয়া ভারতীয় রাষ্ট্র কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট জবাবদিহি করিতে বা নতিস্বীকার করিতে বাধ্য নহে। কোন বিদেশী রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে বা নিয়ন্ত্রণে ভারত পরিচালিত হইবে না।

সার্বভৌমিকতা

কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কেহ কেহ মনে করেন ভারতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ব্যাহত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ ধারণার কোন

যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নাই। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয় যে, যে অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের আখ্যায় আখ্যায়িত সেই অর্থেই ভারতীয় রাষ্ট্র সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র রূপে পরিচিত হইবার যোগ্য।

ভারত কোন অবস্থাতেই আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ব্যাপারে তাহার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করিতে স্বীকৃত নহে. ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদিগের যে সম্মেলন হয় তাহাতে স্থির করা হয় যে কমনওয়েলথ পরিবারের অধিকর্তার (Head of the Commonwealth) কোন সংবিধানগত বা আইনগত ক্ষমতা নাই। এই কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে সৌজন্যের ভিত্তিতে গঠিত ···"only a courtesy agreement devoid of any constitutional significance"······। ভারত যে কোন সময় স্ব-ইচ্ছায় কমনওয়েলথের সহিত তাহার সংস্রব ত্যাগ করিতে পারে। কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক যুক্ত হওয়ায় ভারতের জাতীয় স্বার্থ বা আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ১৯৪৯ সালে শ্রীনেহেরু গণপরিষদে ভারতের কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে বলেন, "There is no law behind the Commonwealth···It is an agreement by free will to be terminated by free will···The Republic of India has nothing to do with England constitutionally or legally" স্বাধীন ভারত কোন ক্রমেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ করিবে না। এই নিরপেক্ষ নীতি রক্ষা হেতু ভারত পররাজ্য আক্রমণের জন্য বিদেশী সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র ভারতের মধ্য দিয়া প্রেরণে অনুমতি দেয় না। ১৯৫৪ সালে ইন্দোচীন অভিমুখে ধাবিত মার্কিন প্লেনকে ভারতের মধ্য দিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। সুয়েজ খাল জাতীয়করণের ব্যাপারে ভারত, প্রেসিডেন্ট নাসেরকে সমর্থন জানাইতে দ্বিধা করে নাই।

গণতন্ত্র

গণতান্ত্রিক শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে জনসাধারণের নির্দেশে রাষ্ট্রশক্তি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। পূর্ণবয়স্ক নাগরিক মাত্রের ভোটাধিকার সংবিধানে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। প্রস্তাবনায় সেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল

গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কারণ ভারতের মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট যুক্তভাবে দায়ী থাকেন, এবং সর্বসাধারণের ভোটে এই আইনসভা গঠিত হয়।

সাধারণতন্ত্র শব্দের সহায়তায় রাজতন্ত্রের অবসান সূচিত হইয়াছে এবং জনসাধারণের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নির্দিষ্ট হইয়াছে।

রাজতন্ত্রের অবসান ও সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

ভারতীয় সংবিধানে রাজা রাণীর কোন স্থান নাই। সাধারণতন্ত্রী ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের সদস্য এবং কমনওয়েলথের নিয়মানুসারে রাজার প্রতি আনুগত্য কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত সকল রাষ্ট্রগণের কর্তব্য। এই জটিল অবস্থার সমাধান কল্পে ১৯৪৯ সালে লণ্ডনে কমনওয়েলথের সদস্যগুলির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, এবং ইহা ঠিক হয় যে ভারতবর্ষ রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিবে না বটে তবে ব্রিটিশ রাজাকে কমনওয়েলথের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

(Salient features of the Constitution)

[লিখিত শাসনতন্ত্র—প্রধানতঃ সুপরিবর্তনীয় ও আংশিকভাবে দুষ্পরিবর্তনীয়—যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি—পার্লামেণ্টারী প্রথা ও রাষ্ট্রপতির শাসন—ধর্মনিরপেক্ষতা—মৌলিক অধিকার—নির্দেশমূলক নীতি—প্রাপ্তবয়স্কদিগের ভোটাধিকার]

পৃথিবীর শাসনতন্ত্রসমূহের মধ্যে ভারতীয় সংবিধানের এক গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য স্থান রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল সংবিধানের কোন না কোন বিশেষত্ব ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সংবিধানের খসড়া রচনাকালে ভারতীয় সংবিধান

প্রণেতৃগণ পৃথিবীর বিভিন্ন সংবিধানের কার্যকারিতা, ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ করিয়া ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় অংশ প্রয়োগ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ফলে সংবিধানের দৈর্ঘ্য, বিষয়বাহুল্য ও ব্যাপকতা সবিশেষ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারার মিলনে এবং বহু বিপরীত শাসনবর্জিত মতবাদের সমন্বয়ে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র গঠিত হইয়াছে।

৩৯৫ অনুচ্ছেদসহ সর্ববৃহৎ ও ব্যাপক-লিখিত সংবিধান

(১) পৃথিবীর লিখিত শাসনতন্ত্রসমূহের মধ্যে ভারতীয় সংবিধান সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ব্যাপক। ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ ও ৯টি তালিকা (Schedules) এবং ১১টি সংশোধন প্রস্তাবের সমন্বয়ে ভারতীয় সংবিধান গঠিত। ভারতীয় সংবিধানে প্রশাসনিক খুঁটিনাটি ও নির্দেশসমূহ বিস্তারিতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও অংগরাজ্যগুলির সরকার সমূহের প্রশাসনিক ব্যবস্থার নির্দেশ সংবিধানে স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেশের বিশাল আয়তন, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জটিলতা প্রভৃতির জন্য সংবিধানের ব্যাপকতা ও বিশালতা বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। লিখিত হইলেও, ভারতীয় শাসনতন্ত্রে অলিখিত বিধি নিয়ম ও প্রথার প্রভাব বহুলাংশে অনুভব করা হয়। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্রের কাঠামো এই সকল গণতান্ত্রিক প্রথানিয়মের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

প্রধানতঃ সুপরিবর্তনীয় ও আংশিক দুষ্পরিবর্তনীয়

(২) ভারতীয় সংবিধান প্রধানতঃ সুপরিবর্তনীয় ও আংশিক-ভাবে দুষ্পরিবর্তনীয়। কেন্দ্রীয় ও অংগরাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাপারে সংবিধানের পরিবর্তন সাধনে অন্ততঃ অর্ধসংখ্যক রাজ্যগুলির সম্মতি প্রয়োজন হয়। এই দিক দিয়া ভারতীয় সংবিধান বিশেষভাবে দুষ্পরিবর্তনীয়। অপরাপর ব্যাপারে বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে আইন সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদিগের সমর্থনে সংবিধানের যে কোন অনুচ্ছেদের সংশোধন সম্ভব। ৩৬৮ অনুচ্ছেদ, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলির পরিবর্তন সাধনে রাজ্যগুলির সম্মতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু সংবিধানের বহু বিষয় সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমেই পরিবর্তিত করা সম্ভব। নূতন রাজ্য সৃষ্টি অথবা রাজ্যগুলির এলাকা পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে শুধু পার্লামেন্টে

সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতারই প্রয়োজন হয়। এই সকল বিষয় অনুধাবন করিলে সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার এক সংমিশ্রণ দেখা যায়। শ্রীনেহেরু বলিয়াছিলেন, "There should be a certain flexibility. If you make anything rigid and permanent, you stop the nation's growth"·· অর্থাৎ সুপরিবর্তনীয়তার প্রয়োজন আছে। কোন বিষয়কে বিশেষ দুষ্পরিবর্তনীয় করিলে জাতির অগ্রগতি রুদ্ধ হয়।

(৩) ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয়করণ ও বিকেন্দ্রীয়করণের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রীতিনীতি অনুসারে কেন্দ্র ও অংগরাজ্য সমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে, একটি লিখিত ও আংশিক-ভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, এবং বিচারালয়ের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু দ্বৈত নাগরিকত্বের পরিবর্তে এক নাগরিকত্ব, এক বিচারব্যবস্থা ও দায়িত্ব কর্তব্য পালনের একটি কাঠামো প্রণয়ন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শিথিল করা হইয়াছে। বিশেষ আপৎকালীন সময় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলে ·ক্ষমতার পূর্ণ কেন্দ্রীয়করণ সম্ভব। আপৎকালীন সময় রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকার সমূহ বিচারালয়ে বলবৎ করা বা কার্যকর করা স্থগিত রাখিতে সক্ষম। ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের ব্যাপারে আইন প্রণয়ণের পূর্ণ ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। অপরদিকে যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে সমূহের ব্যাপারে কেন্দ্র বা রাজ্য উভয় সরকারই আইন প্রণয়নে সক্ষম। অবশ্য পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন ও রাজ্যবিধান সভা প্রণীত আইনের মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হইলে পার্লামেণ্টের আইন বলবৎ হইবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এমন কি রাষ্ট্রতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় সমূহেও পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়নে সক্ষম হয়। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্টাংশ ক্ষমতাগুলি (residuary powers) কেন্দ্রের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। বৈদেশিক আক্রমণজনিত সংকট বা অর্থনৈতিক সংকট বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগ উপস্থিত হইলে রাষ্ট্রপতি সামগ্রিকভাবে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়

(৪) ভারতীয় সংবিধানে, পার্লামেণ্টারী ও রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই শাসন ব্যবস্থার প্রধান অধিকর্তা কিন্তু মন্ত্রি পরিষদের উপদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। অবশ্য রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া কার্য করিতেছেন কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা আদালতের নাই এবং বিচার কার্য (impeachment) ভিন্ন রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করা সম্ভব নহে। অপরদিকে মন্ত্রিপরিষদের একক ও যৌথ দায়িত্বের কথা সংবিধানে উল্লেখ করা হইয়াছে। আপৎকালীন সময়, রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করা সম্ভব।

পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থার সমন্বয়।

ভারতীয় সংবিধানে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারী প্রথায় বহু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা হইলেও আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে পার্লামেণ্টের সম্পূর্ণ প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত পার্লামেণ্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত কোনও বিষয় আইন প্রণয়ন করিতে অক্ষম। ভারতীয় সংবিধানে আইনসভা প্রণীত কোন আইনকে সংবিধানগত ভাবে অবৈধ ঘোষণা করা সম্ভব। মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করিয়া বা ক্ষমতা বণ্টনের নীতিকে অবমাননা করিয়া আইনসভা কোন আইন প্রণয়ন করিলে সুপ্রীম কোর্ট আইনকে সংবিধান বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার অর্জন করিলেও, আইনের উপযোগিতা বা যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার বা বিচারবিভাগীয় পর্যবেক্ষণের অধিকার সুপ্রীম কোর্টের নাই। অপরদিকে সংবিধানের যে কোন অনুচ্ছেদ সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এইভাবে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রে পার্লামেণ্টের শাসন ব্যবস্থা ও বিচারবিভাগীয় প্রাধান্যের সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে।

দেশীয় নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলি ভারতের সহিত সংযুক্ত হইয়া সংবিধানের নিয়ন্ত্রনাধীন হইয়াছে। প্রায় ৫৬৫টি নৃপতি শাসিত রাজ্য পার্শ্ববর্তী অংগরাজ্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া গিয়া অথবা পরস্পরের সংমিশ্রণে বৃহদাকার লাভ করিয়া পৃথক রাজ্যের সৃষ্টি করিয়া বা কেন্দ্রীয় শাসনাধীন হইয়া অবস্থান করিতেছে। এইভাবে ভারতের ঐক্য, সংহতি ও দৃঢ়তা সংবিধানের মাধ্যমে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

(৫) ধর্মনিরপেক্ষতা (secular State) ভারতের সংবিধানের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসরণ করিয়া ভারতীয় সংবিধান এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, ইসলাম সকল ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতীয় নাগরিককে অভিন্ন নাগরিক অধিকারের ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। ধর্মের ভিত্তিতে কোন পক্ষপাতিত্ব বা অবিচার করা সম্ভব নহে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে অভিহিত

(৬) ভারতীয় সংবিধানে কতকগুলি মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলি রাজনৈতিক, আইনগত ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইয়াছে। ধনি দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের রাষ্ট্রের প্রধান অধিনায়ক হইবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার ক্ষমতা স্বীকারের জন্য, জাতি, ধর্ম, শ্রেণী বা জন্মের ভিত্তিতে পক্ষপাতিত্ব না করিবার জন্য সামাজিক বৈষম্য বহুলাংশে বিদূরিত হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলিকে ক্ষুণ্ণ বা প্রতিহত করিয়া আইন প্রণয়ন করা হইলে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টগুলি তাহাদিগকে অবৈধ ঘোষণা করিতে পারিবেন।

মৌলিক অধিকার

(৭) ভারতের শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ পরিচালনার আদর্শ হিসাবে সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায় কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতির (Directive Principles of State Policy) উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য মৌলিক অধিকারগুলির ন্যায় নির্দেশমূলক নীতি আদালত কর্তৃক বলবৎ করা সম্ভব হইবে না।

নির্দেশমূলক নীতি

(৮) ৩২৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধানে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিরোধ করা সম্ভব হইয়াছে।

প্রাপ্তবয়স্কদিগের ভোটাধিকার

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি

[এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মিশ্রণ—ক্ষমতা বণ্টন—একই প্রকার নাগরিকত্ব ও সর্বভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় কেন্দ্রিকতার প্রবণতা ।]

সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে ভারতকে রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (Union of States)। কিন্তু ভারতকে পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতে অনেকে দ্বিধা প্রকাশ করিবেন। ভারত আংশিক বা বহুলাংশে যুক্তরাষ্ট্র (Quasifederal) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে এক-কেন্দ্রিক ব্যবস্থার সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। অনেকের মতে ভারত এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ে গঠিত এক যুক্তরাষ্ট্র। অপরপক্ষে বলা হয় ভারত, যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য-সমূহ সমন্বয়ে গঠিত এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রকৃতি

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুসরণে ভারতে এক লিখিত সংবিধান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার সমাধানকল্পে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংযোজিত হইয়াছে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট বৈধ অধিকার সম্পর্কিত মামলার বিচার করে ও মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করে।

ক্ষমতা বণ্টন লিখিত ও নির্দিষ্ট

কিন্তু একপ্রকার নাগরিকত্ব, একটি বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া এবং কেন্দ্রের হস্তে অবশিষ্টাংশ ক্ষমতা সমর্পণের মাধ্যমে কেন্দ্রের ক্ষমতা-বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিয়াছে। আপৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে কেন্দ্রের পরিচালনা শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি লাভ করে।

সর্বভারতীয় বিচার-ব্যবস্থা ও নাগরিকত্ব

এতদ্ব্যতীত আইনসভা প্রণীত আইনের যৌক্তিকতা বা উপযোগিতা বিচারের ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের নাই। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে পার্লামেণ্টের প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে। যদি পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে যত্নবান হয় অথবা নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনে ব্যাহত হয় তখন সুপ্রীম কোর্ট পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনগুলিকে অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা সীমিত

রাজ্যগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজদিগের মধ্যে চুক্তির সাহায্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে নাই এবং যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিবার কোন ক্ষমতা অংগরাজ্যগুলিকে অর্পণ করা হয় নাই। ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সাম্যনীতি প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। রাজ্যসভায় সকল রাজ্য হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয় নাই। ২৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় স্বার্থে রাজ্যগুলির সম্পর্কিত ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন প্রণয়নের অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগের ক্ষমতা অংগরাজ্যগুলিকে দেওয়া হয় নাই

এতদ্ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষে এক সর্বভারতীয় বিচার ব্যবস্থা এক নাগরিকত্ব প্রবর্তন ব্যতিরেকে, সর্বভারতীয় বেসামরিক স্থায়ী সরকারী চাকুরী ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে।

সর্বভারতীয় বেসামরিক স্থায়ী সরকারী চাকুরী

রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে নিযুক্ত ও প্রয়োজনে অপসারিত করেন এবং কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক গোলযোগ উপস্থিত হইলে রাজ্যপালের পরামর্শে বা নিজদায়িত্বে রাষ্ট্রপতি রাজ্যের সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। তাহা ছাড়া রাজ্যপাল প্রেরিত রাজ্যের বিলে সম্মতি জ্ঞাপন করা বা নাকচ করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। এতদ্ব্যতীত, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দান করিতে পারে, এবং এই সকল নির্দেশ অমান্য করিলে রাষ্ট্রপতি রাজ্যের শাসনভার বাতিল করিয়া নিজ হস্তে লইতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল

আর্থিক ক্ষমতা ও ব্যবস্থা গ্রহণের দিক দিয়া ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রিকতার বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অন্যান্য ক্ষমতা বণ্টনের সাথে সাথে আর্থিক ক্ষমতাগুলিও কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল কর ধার্য ও আদায় করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর সমর্পিত হইয়াছে। রাজ্যগুলির মধ্যে সাধারণ আর্থিক সাহায্য বণ্টন করিবার দায়িত্ব কেন্দ্রের।

আর্থিক ক্ষমতার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণ নীতি অনুসারে ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে দুষ্পরিবর্তনীয় নহে। ক্ষমতা বণ্টন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, পার্লামেণ্টে রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় ব্যতিরেকে সংবিধানের অন্যান্য প্রায় সকল অনুচ্ছেদই দুষ্পরিবর্তনীয় নহে এবং রাষ্ট্রগুলির মতামতের উপর নির্ভরশীল নহে। পার্লামেণ্ট এককভাবে রাজ্যের নাম পরিবর্তন বা রাজ্যসীমার পরিবর্তন সংক্রান্ত সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে।

সংবিধান সম্পূর্ণ দুষ্পরিবর্তনীয় নহে

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অপরিহার্য অংগস্বরূপ বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য সাধারণভাবে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেরূপ বিদ্যমান সেইরূপ প্রাধান্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগে পরিচালিত হয় না। ভারতের শাসনতন্ত্রে. বিচার বিভাগীয় প্রাধান্যের সহিত ভারতীয় পার্লামেণ্টের প্রাধান্যের এক সংমিশ্রন দেখা গিয়াছে। আইনসভার বিষয় বহির্ভূত হইলে বা মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলে বিচার বিভাগ আইন অবৈধ ঘোষণা করিতে পারেন। আইনের যৌক্তিকতা অথবা স্বাভাবিক ন্যায়শীলতার বিচার করিবার ভার বিচার বিভাগের উপর নাই। ভারতীয় সংবিধান বহুলাংশে সুপরিবর্তনীয় হওয়ায় প্রয়োজনমত যে কোন অনুচ্ছেদের সংশোধন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের কার্য ও সিদ্ধান্তকে পার্লামেণ্ট নাকচ করিয়া দিতে সক্ষম। এইভাবে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিধির বার বার পরিবর্তন সংগঠিত হয়। এই সকল কারণেই অনেকের মতে ভারতীয় সংবিধান প্রকৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় অপেক্ষা অধিকতর এককেন্দ্রিক। অধ্যাপক

বিচারবিভাগীয় প্রাধান্য প্রসঙ্গে

দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "India's constitution is federal in form with a pronounced unitary bias".

২৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যসভার দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রস্তাব অনুসারে পার্লামেণ্ট জাতীয় স্বার্থে রাজ্যবিভাগের সকল ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করিতে সক্ষম। দুই বা ততোধিক রাজ্যসরকারের অনুরোধেও রাষ্ট্রতালিকাভুক্ত বিষয়ে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে। আপৎকালীন সময় ঘোষণার দ্বারা ২৫০ অনুচ্ছেদ অনুসারে পার্লামেণ্ট ভারতের যে কোন এলাকা সম্পর্কে আইন প্রণয়নে সক্ষম। ২৫৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তি কার্যকর করিবার নিমিত্ত পার্লামেণ্ট ভারতের যে কোন এলাকা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে আইন প্রণয়ন করিতে সক্ষম। এই কেন্দ্রিক প্রবণতার জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। অবশ্য ডঃ আম্বেদকর এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। ডঃ আম্বেদকরের মতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনুসরণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলির মধ্যে শাসন বিভাগীয় এবং আইন বিভাগীয় ক্ষমতা বণ্টন করা সম্ভব হইয়াছে। "The basic principle of Federalism is that the legislative and executive authority is partitioned between the Centre and the States."···ইহাও মনে রাখা বিধেয় যে কেবলমাত্র আপৎকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের এলাকায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে ··"these overriding powers are not the normal features of the Constitution."······অনেকের মতে "যুক্তরাষ্ট্র" কথাটি সংবিধানে ব্যবহৃত না হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে কতকগুলি সুবিধার জন্য, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ নর্থ আমেরিকা আইনের প্রস্তাবনা অনুযায়ী রাজ্যসমবায় রাষ্ট্র (union of States) বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র বস্তুতঃ যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোয় গঠিত :

পার্লামেণ্টের ক্ষমতা

"Nothing much turns on the name, but the committee has preferred to follow the language of the preamble to the British North America Act 1867, and considered that there are advantages in describing India as a union although its Constitution may be federal in structure."

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতীয় নাগরিকত্ব (Indian Citizenship)

[দ্বৈত নাগরিকতার ব্যবস্থা নাই—নাগরিকতা সম্পর্কে স্থায়ী নিয়মাবলী প্রবর্তিত হয় নাই—নাগরিকতা অর্জনের সাধারণ নীতি ও ভিত্তি—নাগরিকতার বিলোপ—কমনওয়েলথভুক্ত দেশের অধিবাসী।]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে সর্বভারতীয় একক নাগরিকত্বের প্রবর্তন করা হইয়াছে। আইনের ও রাষ্ট্রনৈতিক সত্তার দিক দিয়া সকল নাগরিক সমান। অংগরাজ্যগুলিতে পৃথক নাগরিকতার ব্যবস্থা নাই।

নাগরিক সম্পর্কে স্থায়ী বিস্তৃত নিয়মাবলী নাই ১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকত্ব সম্পর্কে কোন স্থায়ী বিধিবদ্ধ বা বিস্তৃত নিয়মাবলী সন্নিবিষ্ট করা হয় নাই। সংবিধানের সূচনায় অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০ সালে কাহারা ভারতীয় নাগরিক হইবেন তাহাই সংবিধানে লিখিত আছে। ভারতের নাগরিকত্ব সম্পর্কিত ব্যাপারে বিশদ আলোচনা ও পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের উপর নির্ভর করা হইয়াছে। পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া নাগরিক অধিকার অর্জন, অবসান ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। পার্লামেন্টে ১৯৫৫ সালে প্রণীত নাগরিক আইনে (Citizenship Act.) এই বিষয়ে সমগ্রভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

বর্তমানে সংবিধানে ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ অনুচ্ছেদ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে ভারতীয় নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

জন্মস্থান

(১) নিজ জন্মস্থান, পিতামাতার জন্মস্থান বা স্থায়ী বসবাসের ভিত্তিতে নাগরিক অধিকার অর্জন সম্ভব। সংবিধান প্রবর্তনকালে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রে স্থায়ী বসবাসকারী বা জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন সকল ব্যক্তিকেই ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হইয়াছে। সংবিধান প্রবর্তনকালে ভারতে স্থায়ী বসবাসকারী ব্যক্তি নিজে ভারতের জমিতে জন্মগ্রহণ না করিলেও পিতামাতার জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিকত্ব তাহার উপর বর্তাইবে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর অব্যবহিত পূর্বে

পাঁচ বৎসর ধরিয়া সাধারণভাবে বসবাসকারী সকল ব্যক্তিকে ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে, সংবিধান প্রবর্তনকালে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হইবে। অবশ্য ভারতবর্ষে স্থায়ী বসবাস (domicile) একটি প্রয়োজনীয় সর্ত। স্থায়ী বসবাসের অংগ স্বরূপ প্রকৃত বসবাস ও স্থায়ীভাবে বাস করিবার অভিলাষ প্রয়োজন।

১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত ব্যক্তি

(২) এতদ্ব্যতীত ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই মাসের পূর্বে যাঁহারা পাকিস্তান পরিত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা স্বয়ং অথবা তাঁহাদের পিতামাতা, অথবা পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ বা মাতামহীর মধ্যে কেহ যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা যদি বর্তমান ভারতে আসিবার পর হইতে এদেশে সাধারণতঃ বসবাস করিয়া থাকেন—তবে তাহারা সংবিধানের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের নাগরিক অধিকার অর্জন করিবেন। ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই মাসের পর পাকিস্তান পরিত্যাগ করিয়া ভারতে যাঁহারা চলিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের সরকারী কর্মচারীর নিকট নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদন করিবার পূর্বে অন্ততঃ ছয় মাস ভারতে বসবাস করিতে হইবে। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে ১৯শে জুলাই ১৯৪৮ সালে ভারতে পারমিট বা পাশ প্রথার প্রথম প্রচলন হয়।

যাঁহারা ভারতে ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চের পূর্বে ফিরিয়া আসিয়াছেন

(৩) যে সকল ব্যক্তি ভারত হইতে পাকিস্তানে চলিয়া গিয়া পুনরায় ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চের পূর্বে ফিরিয়া আসেন তাঁহারা ভারতের নাগরিকরূপে গণ্য হইবেন। যাঁহারা ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চের পরে ভারতে আসিবেন তাঁহাদের উপযুক্ত অধিকর্তার নিকট পাশ রেজিস্টারীভুক্ত করিবার পর নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়।

বাহিরে বসবাসী ভারতীয়

(৪) ইহা ছাড়া যে সকল ভারতীয়, ভারতের বাহিরে থাকেন, তাঁহারা ঐ সকল রাষ্ট্রে ভারতবর্ষের কূটনৈতিক দপ্তরে নিজ নাম রেজিষ্ট্রি করিলে ভারতবর্ষের নাগরিকরূপে গণ্য হইবেন। সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী পার্লামেণ্ট ১৯৫৫ সালে ভারতীয় নাগরিক আইন (Citizenship Act)

পাশ করেন। ঐ নাগরিক আইনে ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব অর্জন, বিলোপ ইত্যাদি সকল বিষয়েই আলোচনা করা হইয়াছে।

ঐ আইন বলে যে সকল ব্যক্তি সংবিধান চালু হইবার পর অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০ সালের পরে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বা যাঁহাদের পিতা ভারতবর্ষের নাগরিক, তাহারা স্বাভাবিকভাবে ভারতবর্ষের নাগরিক বলিয়া গন্য হইবেন।

নাগরিকত্ব আইন করিবার জন্য দুইটি পন্থার কথা ঐ আইনে লিখিত হইয়াছে যথা রেজিস্ট্রিকরণ ও দেশীয়করণ প্রথা।

রেজিস্ট্রিকরণ প্রথায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারিবেন।

যাহাদের পূর্বপুরুষগণ ভারতীয় এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি ভারতের বাহিরে থাকেন, তাহারা অন্যান ছয় মাসকাল ভাবতবর্ষে অবস্থান করিয়া ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারেন। ভারতীয় নাগরিকগণের নারালক পুত্র কন্যা ভারতীয় নাগরিকরূপে গণ্য হইতে পারেন।

ভারতীয় নাগরিকের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবার ফলে বিদেশিনী মহিলাগণ ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করিতে সক্ষম। আবার কমনওয়েলথ গোষ্ঠীভুক্ত নাগরিকগণ ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন কারতে পারিবেন। ব্রিটিশ জাতীয়তা আইনেও (British Nationality Act) এইরূপ উল্লেখ আছে

দেশীয়করণের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করা সম্ভব। অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ বা বর্জন করিয়া বিদেশী নাগরিক ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারে। আবেদন করিবার পূর্বে অন্ততঃ ১২ মাস আবেদনকারীকে সরকারী চাকুরীতে যুক্ত থাকিতে বা ভারতে বসবাস করিতে হইবে। উক্ত বার মাসের পূর্বের সাত বৎসরের মধ্যে ভারতে অন্ততঃ চারি বৎসরের বসবাস, সৎচরিত্র এবং ভারতীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জনের বিশেষ গুণাবলীরূপে পরিচিত হইবে।

দেশীয় করণের মাধ্যম

বিদেশী কোন রাষ্ট্র ভারতবর্ষের আয়ত্তাধীন হইলে, সেই সকল স্থানের অধিবাসীগণ ভারতীয় নাগরিকরূপে গণ্য হইবেন।

সাধারণতঃ নাগরিক মাত্রই পৌর ও রাজনৈতিক উভয় অধিকার অর্জন বা উপভোগ করে। কিন্তু ভারতবর্ষের সংবিধানে এই নিয়ম পুরাপুরি পালন করা হয় নাই। বিদেশীগণ কোনরূপ রাজনৈতিক অধিকার উপভোগ করেন না এবং অনেক পৌর অধিকার হইতেও বঞ্চিত হন। তাহা ছাড়া শত্রু দেশের অধিবাসীগণও সকল পৌর অধিকার সমভাবে ভোগ করেন না। ১৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে ধার্য স্বাধীনতার অধিকার বিদেশীদিগকে অর্পণ করা হয় না। তবে এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহ বিদেশী রাষ্ট্র নহে এবং তাহাদের অধিবাসীগণ বিদেশী পর্যায়ভুক্ত নহে।

নাগরিক অধিকারের বিলোপ সাধন

১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুসারে কোন ভারতীয় নাগরিক বিদেশের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে ভারতীয় নাগরিকত্ব পরিত্যাগে বাধ্য হইবে। নিম্নলিখিত ভিত্তিতে ভারতীয় নাগরিকত্বের বিলোপ সাধন সম্ভব :—

(১) নাগরিকত্ব পরিত্যাগ বা বর্জনের দ্বারা যে কোন ভারতীয় নাগরিকের নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে। স্বেচ্ছায় নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিতে হইলে সেইরূপ কোন দরখাস্ত সরকারের ভারপ্রাপ্ত অফিসে দাখিল করিতে হইবে।

(২) অন্যদেশের নাগরিকত্ব অর্জনের মাধ্যমেও ভারতীয় নাগরিকত্বের বিলোপ সাধন সম্ভব।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব প্রত্যাহারে সক্ষম। মিথ্যা পরিচয় ও বিবরণ দ্বারা আবেদনকারী নাগরিকত্ব অর্জন করিলে, সংবিধান বা সরকারের আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে অথবা শত্রুপক্ষীয় রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে যুক্ত থাকিলে অথবা রেজেষ্ট্রীকৃত হইবার পাঁচ বৎসরের মধ্যে দুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিলে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিক অধিকার প্রত্যাহার করিতে সক্ষম। এতদ্ব্যতীত একাদিক্রমে সাত বৎসর ধরিয়া ভারতের বাহিরে বসবাস করিলে নাগরিকত্বের বিলোপসাধনের সম্ভাবনা দেখা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)

[মৌলিক অধিকার ও তাহার তাৎপর্য—সাম্যের অধিকার—স্বাধীনতার অধিকার—সম্পত্তির অধিকার—শিক্ষা-সংস্কৃতির অধিকার—শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার—শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার।]

লিখিত শাসনতন্ত্রের ধারা অনুসরণ করিয়া ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদে (১২ হইতে ৩৫ অনুচ্ছেদ) মৌলিক অধিকারগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

মৌলিক অধিকারের উপর ব্যক্তি অথবা সরকার কেহই হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম নহে। জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা ও সরকারের সুপরিচালনার জন্য মৌলিক অধিকারের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। সেইজন্য বলা হইয়াছে—

"Rights are the groundwork of the State. They are the quality which gives the exercise of its powers a moral character. And they are natural rights in the sense that they are essential for the good life." অর্থাৎ মহৎ ও নৈতিক জীবনযাপনের জন্য অধিকার অত্যাবশ্যক এবং অধিকার রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ। মার্কিন, আইরিশ ও জার্মান সংবিধানের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদের অনুকরণে ভারতের মৌলিক অধিকারগুলি গৃহীত হইয়াছে। জেফারসন (Jefferson) প্রদত্ত মানবিক অধিকারের ঘোষণা, রুশোর (Rousseau) ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ, জাতিপুঞ্জের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির সমন্বয়ে ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইংলণ্ডে সাধারণ আইনের দ্বারা জনগণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় যথাবিহিত আইনের পদ্ধতি (Due Process of Law) গৃহীত হয় নাই এবং স্বাভাবিক ন্যায়পরায়ণতার (Natural Justice) ভিত্তিতে আইনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা বিচারালয়গুলিকে প্রদান করা হয় নাই।

ভারতের মৌলিক অধিকারের গুরুত্ব থাকিলেও পূর্ণ ক্ষমতা স্বীকৃত হয় নাই। বহুক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার প্রয়োগ ও উপভোগ সীমিত করা সম্ভব হইয়াছে। ১৯ অনুচ্ছেদের স্বাধীনতার অধিকার "যুক্তিযুক্ত বাধা" দ্বারা (reasonable restrictions) বারংবার সীমিত করা সম্ভব হইয়াছে। ২২ অনুচ্ছেদে নিবর্তনমূলক আইনের ক্ষমতা প্রদত্ত হওয়ায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার বহুলাংশে সীমিত হইয়াছে। ৩১ ও ৩১এ অনুচ্ছেদের বলে সম্পত্তি রক্ষার অধিকার বহুভাবে খণ্ডিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বলা যাইতে পারে যে ভারতের শাসনতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকারের সহিত জাতির প্রয়োজনে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতার মধ্যে একটি স্বপ্নের সমন্বয় রচনা করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট মৌলিক অধিকার মূলতঃ নাগরিকদিগের উপভোগের জন্য সমর্পিত হইলেও কতিপয় অধিকার সর্বসাধারণের উপভোগ্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। জীবন রক্ষার অধিকার নাগরিক বিদেশী ও দেশবাসী নির্বিশেষে সকলের উপর সমর্পিত হইয়াছে।

আপৎকালীন সময় এই সকল মৌলিক অধিকারগুলি স্থগিত রাখা বা প্রত্যাহার করা সম্ভব। ৩৫৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে আপৎকালীন ঘোষণা বলবৎ হইলে ১৯ অনুচ্ছেদে ধর্ম ও স্বাধীনতার অধিকারগুলি স্থগিত থাকিবে। ৩৫৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি তাঁহার আদেশ দ্বারা সাময়িকভাবে মৌলিক অধিকারের কার্যকারিতা স্থগিত রাখিতে পারেন বা প্রত্যাহার করিতে পারেন।

ভারতীয় সংবিধানে অধিকারের যে সকল বাধা নিষেধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এতই ব্যাপক যে উহার তুলনা অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে পাওয়া যায় না। কোন গণতান্ত্রিক দেশে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ও স্বাভাবিক কালে নিবর্তনমূলক আটকের ন্যায় আটক ব্যবস্থা নাই (Preventive Detention Act)।

ভারতে মৌলিক অধিকারগুলি ভিন্ন নাগরিকদিগের ব্যক্তিত্ব সম্প্রসারণের উপযোগী অন্য কোন অধিকারের দলিল সংযোজিত হয় নাই।

আইনের যৌক্তিকতা অথবা যথাবিহিত আইনের পদ্ধতি বিচারের, কোন অধিকার আদালতের নাই, ফলে বিচারবিভাগীয় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বিশেষ

সীমাবদ্ধ হইয়াছে। শুধুমাত্র বিষয় বহির্ভূত হইলে অথবা মৌলিক অধিকার খণ্ডিত হইলেই বিচার বিভাগ আইনের বৈধতা নির্ণয় করিতে পারে।

সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভারতে, বিচার স্বাধীনতা ও সাম্য নীতির উৎকর্ষের জন্য মৌলিক অধিকারের উপযোগিতা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পার্লামেণ্ট সংবিধানের মৌলিক অধিকার সমূহ সহ বহু অনুচ্ছেদের পরিবর্তন সাধন করিতে সক্ষম। ফলে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই সকল সময় মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষিত হইবে ইহা ঠিক নহে। পার্লামেণ্ট বিশেষ সংখ্যাধিক্যের সাহায্যে প্রয়োজন মত মৌলিক অধিকারের যে কোন অনুচ্ছেদ সংশোধিত করিতে পারে। প্রথম ও চতুর্থ সংশোধন প্রস্তাবের সাহায্যে আদালতের রায় এড়াইবার জন্য যথাক্রমে ১৯ অনুচ্ছেদ ও ৩১ অনুচ্ছেদের পরিবর্তন সাধিত হয়। **'রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজের রাজ্য সরকার' মামলার রায়** এবং **'সুবোধ গোপাল বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার'** ইত্যাদি মামলার রায় ও ব্যাখ্যা এইভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

আমেরিকায় এমিনেণ্ট ডোমেন (Eminent Domain) বা সর্বোপরি ক্ষমতা নীতির সাহায্যে সার্বভৌম শক্তি, জাতীয় স্বার্থে, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে নাগরিকদিগের ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারেন। ভারতে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা হয় নাই। অবশ্য আংশিকভাবে এই নীতির সমর্থন ভারতের সংবিধানে পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত পুলিশী ক্ষমতার (Police power) নজীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও পাওয়া যায়। এই ক্ষমতার বলে সাধারণের ব্যবহারের জন্য ধার্য কল্যাণমূলক কার্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য প্রয়োজন মত রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম।

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের ২৯৮ ও ২৯৯ অনুচ্ছেদে চাকুরী-ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার সাম্য ও নিরপেক্ষতা এবং সম্পত্তি রক্ষার অধিকারের কথা বলা হইয়াছে।

Judicial Review (বিচার বিভাগের পর্যালোচনা)

ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা অসীম। পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা বিচার বিভাগের নাই। পক্ষান্তরে মার্কিন বিচারালয়গুলি আইনের পর্যালোচনা করিতে ও আইনের যৌক্তিকতা

বিচার করিতে সক্ষম। কোন আইন যদি স্বাভাবিক ন্যায় বিচার (Natural Justice) বা নীতিবোধের বহির্ভূত বলিয়া বিচারালয়ে প্রমাণিত হয় অথবা যথাবিহিত আইনের পদ্ধতি (due process of law) অমান্য করে তবে বিচারালয় সেই সব আইন সহজেই নাকচ করিতে ও অবৈধ ঘোষণা করিতে সক্ষম। সেইদিক দিয়া ভারতীয় বিচারালয়গুলি ইংলণ্ড ও মার্কিন বিচারালয়-গুলির ক্ষমতার মধ্যপথ অনুসরণ করে। ভারতীয় বিচারালয়গুলি শুধুমাত্র বিষয় বহির্ভূত কারণে ও মৌলিক অধিকার ভঙ্গের দোষে আইনগুলিকে অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে, মার্কিন বিচারালয়গুলির ন্যায় অন্য কোন কারণে আইনের বৈধতা বিচার করিতে ভারতের বিচার বিভাগ অক্ষম।

সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদে নাগরিকদিগের মৌলিক অধিকার সমূহ গ্রথিত হইয়াছে। সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকার সমূহ প্রধানত সাতটি শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা সম্ভব, যথা সাম্যের অধিকার (Right to Equality), স্বাধীনতার অধিকার (Right to Liberty), শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against exploitation), ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to freedom of religion), সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (Cultural and educational rights), সম্পত্তির অধিকার (Right to property), শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার (Right to Constitutional remedies)।

সাম্যের অধিকার (Right to Equality)

প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সাম্যের অধিকার স্বীকার করা হয়। সাম্যের অধিকারের মাধ্যমে সকলের জন্য সমান সুযোগ ও অধিকার বণ্টন করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ এই অধিকারের মাধ্যমে পক্ষপাতিত্ব বা স্বজন পোষণ নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে "The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India"; অর্থাৎ সংবিধানের আইনের দৃষ্টিতে সমতার বা আইনসমূহ কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হইবার

অধিকার রাষ্ট্র সকল ব্যক্তিকে প্রদান করিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন প্রস্তাবে গ্রথিত "the equal protection" অর্থাৎ আইন কর্তৃক সমান সংরক্ষণ ব্যবস্থার অনুরূপ।

আইনের দৃষ্টিতে সমতাঃ—এক ব্যক্তির সহিত অপর ব্যক্তির মধ্যে আইন কোন পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে না। আদালত সমূহের নিরপেক্ষতার উপর সাম্যের অধিকার কার্যকর হয়। ধর্ম, জাতি, বর্ণ, জন্মসূত্র ও স্ত্রী পুরুষ নির্বিচারে সকল ব্যক্তি আইনের চক্ষে সমান। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিই আইনের উর্ধ্বে নহে। দেশের সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী ও বিত্তশালী ব্যক্তি হইতে নগণ্য সাধারণ নাগরিক সকলেই আইনের চক্ষে সমান। বৈষম্য ও বৈসাদৃশ্য আইনের চক্ষে অপরাধ। আইন সকল ব্যক্তির উপর সমভাবে প্রয়োগ করা হইবে। এই নীতিতে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ আছে,—প্রথমতঃ আইনের চক্ষে সমতা, দ্বিতীয়তঃ আইনের সমপ্রয়োগ। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে। আইনের দ্বারা, বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ সম্ভব, তবে খেয়াল খুশীমত বৈসাদৃশ্য বা পৃথকীকরণ আইনসম্মত নহে। ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত সাম্যের অধিকার প্রায় ইংলণ্ডে প্রচলিত আইনের অনুশাসনের (Rule of Law) অনুরূপ। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে সাধারণতঃ জীবনযাত্রায় বা কর্মক্ষেত্রে এক ব্যক্তির সহিত অপর ব্যক্তির কোনরূপ ভেদ বিচার করা চলিবে না।

রাষ্ট্র যুক্তিসংগতভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া পৃথক পৃথক শ্রেণীর প্রতি পৃথক আইন প্রয়োগ করিতে পারে। অবশ্য একই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ভেদ বিচার সাধারণত করা হয় না। কারণ জেনিংসের মতে (Jennings) "amongst equals, the law should be equal and should be equally administered"।

এই সাম্যের নীতি পুরাপুরিভাবে ভারতের শাসনতন্ত্রে প্রযুক্ত হয় নাই, কারণ অবস্থানুসারে কেহ কেহ বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকারী হন।

৩৬১ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালগণকে আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে কতকগুলি সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রদূত বা দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগেরও আদালতে উপস্থিত করা হয় না। যুদ্ধকালীন সময় বিদেশী শত্রুপক্ষের ব্যক্তিবর্গকে আদালতে মামলা দায়ের করিবার অধিকার

দেওয়া হয় না। অপরাপর বন্দীদের যে সুযোগসুবিধা দেওয়া হয় ইহারা তাহা পান না। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল নিজ নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ বা সম্পাদনের জন্য কোন আদালতের নিকট দায়ী নহেন। তাঁহাদের শাসনকালে তাঁহারা ফৌজদারী মামলার জন্য অভিযুক্ত হইতে পারেন না এবং দেওয়ানী মামলা দায়ের করিবার পূর্বে ইহাদের দুই মাসের নোটিশ দিতে হয়।

'চিরঞ্জিৎলাল বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন' এবং **'আনোয়ার আলি সরকার বনাম পশ্চিম বাঙ্গলা রাজ্য সরকারের'** মামলায় স্থির করা হয় যে, যে উদ্দেশ্যে আইন করা হইবে সেই উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ সম্ভব (Discrimination), নচেৎ যে কোন প্রকৃত ও স্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ সাম্যের অধিকারের মূলে কুঠারাঘাত করিবে।

১৪ অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যার দ্বারা ইহা মনে করা ঠিক হইবে না যে, ঘটনা, পরিস্থিতি ও সর্তের প্রকারভেদ সত্ত্বেও ভারতে বসবাসী সকল ব্যক্তির প্রতি একইভাবে একইরকম আইনের অনুশাসন প্রযুক্ত হইবে। অর্থাৎ সাম্যের অধিকার বলবৎ করিবার পূর্বে ঘটনার ও পরিবেশ পরিস্থিতির গুণাগুণ বিচার করা হইবে। ভিন্নতর পরিবেশ ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একই আইনের অনুশাসন বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি বিভিন্নরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। আইনের বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে এক ব্যক্তি অন্যের সহিত সমান পর্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইলে তাহাদিগের মধ্যে কোন পক্ষপাত ঘটিতে পারে না। অর্থাৎ "It means only that there should be no discrimination between one person and another if as regards the subject matter of the legislation their position is the same."

সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদে একদিকে রাষ্ট্রের ভেদবিচার নীতি বা যুক্তিহীন শ্রেণীবিভাগ হইতে নাগরিকদিগের রক্ষা করা হইয়াছে অপরদিকে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি ধর্ম, শ্রেণী বা জন্মসূত্রের সুযোগে যাহাতে ভেদসৃষ্টি না করিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। কোন সাধারণের জন্য ব্যবহার্য বা রাষ্ট্র অর্থে পরিচালিত স্নানাগারে, জলপথে, পুষ্করিণী, হোটেল বা রেস্তোরাঁয় শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, পেশা, জন্মসূত্র বা নরনারীভেদে কোনরূপ প্রভেদ বা ভিন্নরূপ ব্যবহার বা বিচার করা চলিবে না। তবে সাম্যের

নীতির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রীজাতি ও শিশু বা অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য পৃথক ও বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব।

'অঞ্জলি রায় বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার' মামলার বিচারক স্থির করেন ১৪নং অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুসারে নারী ও শিশুদিগের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব।

'চম্পাকম বনাম মাদ্রাজ রাজ্য সরকার' এবং **'মাদ্রাজ রাজ্য সরকার বনাম শ্রীনিবাসন'** এই মামলা দুইটিতে প্রদত্ত সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের ফলে ১৫নং অনুচ্ছেদ সংশোধিত হয় এবং ১৫ (৪) ধারা সংযোজিত হয়। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে চিকিৎসা ও এঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ সরকারের আদেশটি সংবিধানগতভাবে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। মাদ্রাজ সরকারের এই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসন বণ্টন ১৫ ও ২৯নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধান বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ঐ বিচারগুলির ফল বাহির করিবার মানসে সংবিধানের প্রথম সংশোধন আইনে (১৯৫১) ১৫ অনুচ্ছেদের ৪ ধারা সংযোজিত হয় এবং তাহার ফলে সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য সরকারের বিশেষ ব্যবস্থাকরণের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সরকারী চাকুরীতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের ২৯৮ অনুচ্ছেদের অনুরূপ। কোন ধর্ম, জাতি, বর্ণ, জন্মসূত্র, শ্রেণী বা নরনারী ভেদে চাকুরীক্ষেত্রে কোনওরূপ বৈসাদৃশ্যমূলক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। একমাত্র অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সরকারী চাকুরীতে কতিপয় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তপশীলভুক্ত হিন্দু, হরিজন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ প্রভৃতি এই সংরক্ষিত আসনের দাবীদার হইতে পারেন। কিন্তু অনুন্নত শ্রেণী ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর জন্য সরকারী চাকুরীতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নাই। এই প্রসঙ্গে **'বেংকটরমন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য সরকারের'** মামলা উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৯ সালে মাদ্রাজ পাব্লিক সার্ভিস কমিশন ৮৩টি জিলা মুন্সীফ পদের জন্য দরখাস্ত আমন্ত্রণ করে। কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও বর্ণের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হইবে বলিয়া

স্থির করা হয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বেংকটরমন আবেদন জানাইলে বিচারক তাহার পক্ষে রায় দেন ও স্থির করেন মুশ্লীম, ক্রিশ্চান বা অব্রাহ্মণ হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ সংবিধান-বিরোধী।

তবে চাকুরীর ব্যাপারে এই নিয়মের কতকগুলি ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসী নাগরিকদিগের দাবী সর্বাগ্রগণ্য বলিয়া পার্লামেণ্ট স্থির করিতে পারে। অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য বা বিশেষ শ্রেণীর জন্য কেন্দ্রে বা রাজ্যের অভ্যন্তরে সরকারী চাকুরীর কতিপয় পদ সংরক্ষিত থাকিতে পারে। ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য নিয়োগ কালে, ঐ ধর্মে বিশ্বাসী বা প্রচারকদিগের সর্বাগ্রে স্বযোগ প্রদান করা সম্ভব।

সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতাচারণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার প্রতিরোধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত আছে। পার্লামেণ্ট ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতা নিবারক আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা বিধেয় যে অস্পৃশ্যতা নিবারক আইন কেবল মাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না, ভারতে অবস্থিত, সকল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযুক্ত। ক্রিশ্চান, মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্পৃশ্যতা নিবারক আইন ধার্য হইয়াছে। ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ৺পন্থজী বলেন, "The Bill does not apply to Hindus alone. It applies to all."

সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদের ফলে সামরিক বা অন্য প্রকার কৃতিত্ব ব্যতীত অন্য কোনরূপ খেতাব বা পদবী প্রদান অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হয়। বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কেহ কোনরূপ পদবী গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং ভারত সরকারের কার্যে নিযুক্ত বিদেশীগণও রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতিরেকে ঐরূপ পদবী বা অন্য কোনরূপ পুরস্কার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

স্বাধীনতার অধিকার (Right to Liberty)

সংবিধানের ১৯নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সকল ভারতীয় নাগরিককে (১) বাক্য ও মতামত প্রকাশ (২) চলা ফেরা (৩) সভা সমিতি গঠন বা যোগদান (৪) শান্তিপূর্ণভাবে নিরস্ত্র হইয়া সমবেত হইবার, (৫) ভারতের যে কোন স্থানে বসবাস করিবার ৬) সম্পত্তি দখল অর্জন বা হস্তান্তরের,

(৭) যে কোন বৃত্তি বা উপজীবিকা বা ব্যবসা গ্রহণ করিবার প্রভৃতি সাতপ্রকার স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

তবে এই স্বাধীনতার অধিকারগুলি দেশের ও জাতির মঙ্গলের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে সীমিত করিবার ক্ষমতাও সরকারকে প্রদান করা হইয়াছে। ১৯ অনুচ্ছেদকে সেইজন্য ব্যক্তিগত অধিকার ও সর্বজনমঙ্গলের এক অপূর্ব সমন্বয়ের নিদর্শন স্বরূপ গণ্য করা হয়।

১৯নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সকল অধিকার নিরঙ্কুশভাবে উপভোগে কোন বাধা থাকিত না যদি ঐ অনুচ্ছেদের সহিত দফাগুলি সংযুক্ত না করা হইত। **'গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য সরকারের'** মামলায় বিচারক বলেন, "If there were nothing else in article 19 these rights would have been absolute rights and the protection given to them would have completely debarred Parliament or any State legislature from making any law or taking away or abridging any of those rights."

অবশ্য উপরে উল্লিখিত সকল অধিকারগুলি নিরঙ্কুশভাবে উপভোগ করা নাগরিকগণের পক্ষে সম্ভব নহে। সংবিধানে নাগরিকগণকে বাক্যের স্বাধীনতা প্রদান করা হইলেও ঐ অধিকার যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধের দ্বারা সীমিত করা সম্ভব। বিচারালয়ের অবমাননা, মানহানি অশ্লীলতা ও অসদাচার রাষ্ট্রের নিরপত্তা রক্ষা, জনশৃংখলা ভংগ বা বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীবন্ধন বা অপরাধ অনুষ্ঠান প্রভৃতির অজুহাতে বাক্‌স্বাধীনতার অধিকারের উপর যুক্তিসংগতভাবে বাধা নিষেধ আরোপ করা সম্ভব। **'রমেশ থাপ্পার বনাম মাদ্রাজ সরকার'** এবং **'ব্রিজভূষণ বনাম দিল্লী সরকার'** এই দুইটি মামলায় সুপ্রীম কোর্ট জনশৃংখলা রক্ষার (public order) অর্থ ব্যাখ্যা করেন যে কোন গুরুতর বা মারাত্মক অপরাধ বা শৃংখলা ভংগের চেষ্টাতে ইহা প্রযোজ্য। তাহার ফলে সংবিধানের প্রথম পরিবর্তন আইন (১৯৫০) অনুসারে ১৯ (১) অনুচ্ছেদে নব নব অজুহাত যোগ হয়—যথা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা, বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রী বন্ধন এবং অপরাধ অনুষ্ঠান। এই পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তিগত অপরাধ বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার খাতিরে বাক্‌স্বাধীনতার উপর বাধানিষেধ করা যুক্তিসংগত ও বৈধ হইবে।

সমবেত হইবার অধিকারের উপরও বাধানিষেধ আরোপিত হইতে পারে। সমবেত হইবার অধিকার ভোগ করিতে হইলে সভা শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র সমাবেশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ বিশৃংখলা ও স্বাভাবিক জীবন বিব্রত ও শান্তি বিনষ্টের অপরাধে সমবেত হইবার অধিকার যুক্তিসংগতভাবে সংকুচিত করা সম্ভব। কোন অধিকার যুক্তিসংগতভাবে সংকুচিত হইতেছে কি না তাহা দেখিবার ভার বিচারালয়ের উপর আছে। সংকোচনের যৌক্তিকতা ও পরিধি বিচার করিয়া তাহা যুক্তিসংগত কিনা তাহা বিচার-বিভাগই ঠিক করিবেন এবং অতিরিক্ত বা সমর্থনযোগ্য নহে মনে করিলে বিচারালয় ঐ সকল আইন অবৈধ ঘোষণা করিতে পারিবেন।

সংস্থা গঠনের অধিকার নাগরিকগণকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই অধিকারের যাহাতে অপপ্রয়োগ না ঘটে সেই দিকে দৃষ্টি প্রদানও সরকার করে। অর্থাৎ সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্যের প্রতি সরকারী সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। কোন জঘন্য, ঘৃণ্য অপরাধ সাধনের জন্য সংস্থা গঠনের অনুমতি প্রদান করা হয়না। বিশৃংখলা বা নীতি গর্হিত উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থার উপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করিবার ক্ষমতা সরকারের আছে।

সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের জন্য প্রয়োজনে কয়েকজনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উপেক্ষিত হইতে পারে। এই প্রসংগে 'গোপালন বনাম মাদ্রাজের রাজ্য-সরকারের' মামলা উল্লেখযোগ্য। জাতীয় স্বার্থে বা জনস্বার্থে অথবা সংরক্ষিত উপজাতির মংগলার্থে ভারতের যে কোন স্থানে চলাফেরার অধিকার সংকুচিত করা বা যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে **'খারে বনাম দিল্লী রাজ্যসরকারের'** মামলা প্রণিধান-যোগ্য।

অনুরূপভাবে সম্পত্তি অর্জন, দখল ও হস্তান্তরের অধিকার অথবা যে কোন বৃত্তি, ব্যবসা বা উপজীবিকা গ্রহণের অধিকার সংকুচিত করা সম্ভব। কিন্তু বৃত্তি, ব্যবসা বা উপজীবিকা গ্রহণের মৌলিক অধিকারকে সংকুচিত করিতে যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ আরোপ করিতে হইবে। অযৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে কাহারো বৃত্তি বা উপজীবিকা প্রতিনিবৃত্ত করিবার প্রয়াস আদালত অগ্রাহ্য করিয়াছে। কৈরানার পৌরপ্রতিষ্ঠান জনৈক রসিদ আহমেদের সবজির কারবার বন্ধ করিবার উপক্রম করিলে

সুপ্রীম কোর্ট রসিদ আহমেদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও তাহার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ দান করে।

ভারতের সংবিধানে প্রথম পরিবর্তন আইনে (১৯৫০) বৃত্তি ব্যবসা বা উপজীবিকা গ্রহণের অধিকার অধিকতর সংকুচিত করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রকে প্রদান করা হয়। **'মতিলাল বনাম উত্তরপ্রদেশ সরকার'** এই মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়টিকে অতিক্রম করিতে যাহাতে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন কোন সংস্থা কোন একচেটিয়া ব্যবসা বা বাণিজ্য জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া চালাইতে পারে, তাহার ক্ষমতা প্রদানের জন্য এবং রাষ্ট্র জনগণের ব্যবসা বা উপজীবিকার প্রয়োজন মত নিয়মাবলী গঠন করিবার জন্য ১৯ (৬) অনুচ্ছেদটি বহুলাংশে বর্ধিত করা হয়। পরিশেষে বলা যাইতে পারে যে প্রেসিডেন্ট বিপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করিলে এই অধিকারসমূহ স্থগিত থাকিবে।

জীবনের অধিকার (Right to Personal Liberty): ভারতীয় সংবিধান অনুসারে আইনানুগ পদ্ধতি ভিন্ন কোন ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তা অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংকুচিত বা হরণ করা সম্ভব নহে। প্রচলিত আইন ভংগ না করিলে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা সম্ভব হয় না। অপরাধের পরিমাণ ও প্রকৃতির অনুপাতে শাস্তি বিধান করা হইবে। একবার অনুষ্ঠিত একটি অপরাধের জন্য একাধিকবার কাহাকেও শাস্তি প্রদান করা যাইবে না। অপরাধীকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানে বাধ্য করা যায় না। ২১ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে "no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law." অর্থাৎ আইনের নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে কাহারও জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিনষ্ট করা সম্ভব হইবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য যে আইনে নির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে এই মৌলিক অধিকার সংকুচিত করা সম্ভব। অর্থাৎ আইনসভা ইচ্ছা করিলে ফৌজদারী মামলার বিচার পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। **'আনোয়ার আলি সরকার বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের'** মামলায় রায় দান প্রসংগে বলা হয়, "That a competent legislature is entitled to alter the procedure in

criminal trials in such way as it considers proper." আইনের নির্দিষ্ট পদ্ধতি (procedure established by law) দ্বারা কাহারও মৌলিক অধিকার সংকুচিত করা হইবে না, এই ধারণা জাপানী সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদের অনুরূপ।

ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত ম্যাগ্না-কার্টা বা মহাসনদে অনুরূপ অধিকারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। "No man shall be taken or imprisoned,…or outlawed or exiled, or in any way destroyed, save by the law of the land"

এই অধিকারটি সম্পর্কে আদালতের ক্ষমতা নিতান্তই সীমিত। মার্কিন সংবিধানে যথাবিহিত প্রণালী (Due Process of Law) ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যায় না। আইন ন্যায়সঙ্গত কিনা তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বিচার করিয়া দেখিতে অক্ষম। কিন্তু আইনের যৌক্তিকতা বিচার করিয়া দেখিবার ক্ষমতা ভারতের সুপ্রীম কোর্টের নাই। তবে জীবনধারণের অধিকার সংকুচিত করিতে হইলে যথাবিহিত আইনের প্রয়োজন, শুধু সরকারের আদেশে উহা সম্ভবপর হয় না। ভারতীয় সংবিধানে প্রত্যক্ষীকরণ পদ্ধতি (Writ of Habeas Corpus) সংযোজিত হইয়াছে।

ঐ পদ্ধতি দ্বারা জীবনধারণের উপর নিষেধ আরোপণের আইনের বৈধতা বিচারের ও অবৈধ হইলে আশু মুক্তিদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

আইন ন্যায়সঙ্গত কিনা বা যুক্তিপূর্ণ কিনা তাহা বিচার করিবার অধিকার সুপ্রীম কোর্টের না থাকায় আইনসভার প্রাধান্য ভারতে বিশেষ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সময় সময় জীবনের নিরাপত্তা বা ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কিত অধিকার সংকুচিত করা সম্ভব।

সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বন্দীদের অধিকারগুলির বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপূরক হিসাবে সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে স্থির করা হয় যে যথাশীঘ্র কারণ না জানাইয়া কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইবে না। গ্রেপ্তারের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হইবে এবং কোন বন্দীকে তাহার মনোমত আইনজীবির দ্বারা বিচারালয়ে নিজ পক্ষ সমর্থনের অধিকার

হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। কিন্তু এই ব্যবস্থা নিবর্তনমূলক আটক আইন (Preventive Detention Act) দ্বারা সংকুচিত করা হইয়াছে। বিদেশী শত্রুগণও ঐরূপ অধিকার লাভ করিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রের বা রাজ্যের নিরাপত্তা, আইন শৃংখলা রক্ষা, অত্যাবশ্যক সম্ভার ও সেবার সরবরাহ প্রভৃতির জন্য নিবর্তনমূলক আটক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য নিবর্তনমূলক আইনের উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

নিবর্তনমূলক আইনের দ্বারা আটক ব্যক্তিকে বিনাবিচারে তিন মাসের উর্দ্ধে সাধারণতঃ গ্রেপ্তার করিয়া রাখা হয় না। তবে হাইকোর্টের জজ বা ঐরূপ গুণাবলী সম্বলিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত এক উপদেষ্টামণ্ডলী কোন ব্যক্তিকে তিনমাসের অধিক গ্রেপ্তারের অনুমোদন করিলে সেইরূপ গ্রেপ্তার সম্ভব হয়, তবে কোনও কারণেই পার্লামেণ্ট অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত কাল এই বন্দীদের গ্রেপ্তার করিয়া রাখা চলে না। অবশ্য পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারে। যত শীঘ্র সম্ভব আটক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ অবহিত করা হয়। অবশ্য জনস্বার্থ-বিরোধী মনে করা হইলে সরকার গ্রেপ্তারের কোন কারণ না দর্শাইতে পারেন। যথাশীঘ্র সম্ভব আটক ব্যক্তিকে নিজ পছন্দ অনুসারে ব্যবহারজীবি নিয়োগ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হয়।

অনেক সমালোচকের মতে বিনাবিচারে এবং কোনও আইন বহির্ভূত অপরাধ করিবার পূর্বেই শুধুমাত্র বেআইনী কার্য করিবার সম্ভাবনায় এইরূপ নিবর্তনমূলক আটক আইন পাশ করিবার ক্ষমতাপ্রদান সংবিধানের এক গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে শাসনতন্ত্র সমর্থকদের মতে, ভারতের শিশু সাধারণতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ ক্ষমতা সরকারের বিশেষ প্রয়োজন। নচেৎ অসামাজিক ও দেশদ্রোহী ব্যক্তিদের কার্যে সংবিধান বানচাল হইয়া যাইতে পারে।

সম্পত্তির অধিকার (Right to Property)

আইনের সমর্থন ও ক্ষমতা ব্যতীত কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি হরণ বা হস্তক্ষেপ সম্ভব নহে। সংবিধানে সকল নাগরিকের

সম্পত্তি অর্জনের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা যে কোন আইনসঙ্গত উপায়ে সম্পত্তি অর্জন সম্ভব।

ব্রিটিশ ও আমেরিকার শাসনতন্ত্রেও ঐরূপ অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সাধারণের প্রয়োজনে এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া সরকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হরণ করিতে পারেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ২৯৯ অনুচ্ছেদে ঐরূপ ক্ষমতার উল্লেখ আছে।

উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া জাতীয় স্বার্থেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হরণ করা সরকার বা শাসন বিভাগের পক্ষে সম্ভব নহে। পৃথিবীর কোন সংবিধানেই সম্পত্তির অধিকার অবাধ বা নিরঙ্কুশ অধিকার বলিয়া বিবেচিত হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোপরি ক্ষমতা (eminent domain) বা পুলিশী ক্ষমতার (Police Power) অথবা ট্যাক্স বা কর ধার্য করিবার ক্ষমতার সাহায্যে রাষ্ট্রের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

ভারতীয় সংবিধানের ৩১নং অনুচ্ছেদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত সর্বোপরি ক্ষমতার অনুসরণে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হরণের নিমিত্ত ৩১ অনুচ্ছেদে তিনটি সর্ত পূরণের কথা বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ, সরকারী কার্যের জন্য বা জনকল্যাণের জন্য সম্পত্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষতি পূরণের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, এইরূপ ক্ষেত্রে আইনে রাষ্ট্রপতির চরম সম্মতি থাকা বিধেয়। রাষ্ট্রপতির চরম সম্মতি দানের ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয়। রাজ্যপাল সম্মতি দান করিয়া বিলটিকে আইনে পর্যবসিত করিয়া মামুলী সম্মতির জন্য রাষ্ট্র-পতির নিকট পাঠাইবে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতেন। কিন্তু বিশ্বেশ্বর রাও বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সরকারের মামলার পর এই বিতর্কের সমাপ্তি ঘটে। স্থির হয় যে রাষ্ট্রপতির সম্মতিতেই কেবল বিল আইনে পরিণত হইবে। এই ব্যাপারে রাজ্যপালের ক্ষমতা স্বীকার করা হয় নাই। "The Governor being empowered by clause (3) of article 31 to reserve Bill for consideration of the President and this having been done, it was for the President either to assent to the Bill or to withhold his assent." পশ্চিমবঙ্গ

সরকার বনাম বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলায় আদালতের সিদ্ধান্তের পর সংবিধানে চতুর্থ সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে স্থির হয় যে, আইনে নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ পর্যন্ত হয় নাই বলিয়া কোন আইনকে আদালত বাতিল করিতে পারিবে না।

জনস্বার্থ সংরক্ষণার্থে বা পরিচালনার উন্নতি বিধানকল্পে সাময়িকভাবে রাষ্ট্র যে কোন সম্পত্তির পরিচালনাভার গ্রহণ করিতে সক্ষম। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঠাকুর বক্তৃতা" দান প্রসঙ্গে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি উইলিয়াম ডগলাস ব'লেন যে ১৯৫৫ সালের চতুর্থ সংশোধন প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারত সরকার উপযুক্ত ক্ষতি-পূরণ না দিয়াও যে কোন বেসরকারী কারখানা, বা শিল্প-উদ্যোগ জাতীয়-করণ করিতে সক্ষম। সংশোধন প্রস্তাবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে যৌক্তিকতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ "There is no review of the reasonableness of the amount of compensation. The result can be just compensation or confiscation —dependent wholly on the mood of the Parliament."

করধার্য বা জরিমানা আদায়ের অজুহাতে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নকল্পে জীবন ও সম্পত্তির বিনাশ রোধ কল্পে বা বাস্তত্যাগী ব্যক্তিদিগের সম্পত্তির ব্যাপারে বিনা ক্ষতিপূরণে রাষ্ট্র সম্পত্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। দ্বারভাঙ্গা মহারাজার বহু প্রকার জমিদারী উচ্ছেদের মামলায় সুপ্রীম কোর্ট কোন কোন ক্ষেত্রে জমিদারী উচ্ছেদ আইনের কোন কোন ধারা অবৈধ ঘোষণা করেন। তাহার ফলে সংবিধানের প্রথম সংশোধন আইন (১৯৫১) পাশ হয় এবং নূতন ৩১এ ও ৩১বি ধারাগুলি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট হয়। ঐ অনুচ্ছেদগুলির ফলে জমিদারী বিলোপ আইনগুলির বৈধতা নিরূপণ বিচারালয়ের ক্ষমতার বাহিরে আসিয়া পড়ে। জমিদারী স্বত্ব উচ্ছেদের নিমিত্ত প্রণীত ৩১এ অনুচ্ছেদের পরিসরের ব্যাপকতা চতুর্থ সংশোধনের মাধ্যমে বিশেষ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সংশোধন প্রস্তাবের বলে সরকারের পক্ষে নানাবিধ সমাজ কল্যাণমূলক বিধি প্রবর্তনে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কৃষিজমির সীমানা নির্ধারণ, দুই বা ততোধিক কোম্পানীর একত্রীকরণ, কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট,

ডিরেকটর বা অংশীদারদিগের স্বত্ব বা ক্ষমতা বিলোপ বা. পরিবর্তন, ঋণ প্রভৃতির লাইসেন্স প্রদত্ত ক্ষমতার লোপ, খনিজ বা খনিজ তৈল বিষয়ের কোন চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া ঐসব খনি বা খনিজ তৈল জাতীয়-করণ করা বা ঐ বিষয়ের কোন অধিকার বিলোপ ইত্যাদি সম্ভব হইয়াছে।

সুবোধ গোপাল বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মামলায় আদালতের সিদ্ধান্তের পর চতুর্থ সংশোধনের সাহায্যে ৩১নং অনুচ্ছেদের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। ও ৩১ (২এ) নূতন যোগ হয়। তাহার ফলে নিয়ন্ত্রণ আইনের (regulatory laws) সাহায্যে যদি কাহারো সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয় অথচ সেই সম্পত্তিতে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সংস্থার অধিকার না বর্তায় তবে তাহার জন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দানের প্রয়োজন অনুভব করা হয় না।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right Against Exploitation)

২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদে বল প্রয়োগের মাধ্যমে, অত্যাচারের সাহায্যে মানুষের দ্বারা কায়িক পরিশ্রম করান বিশেষ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়। মানুষ ক্রয় বিক্রয়, বেগার খাটান প্রভৃতি দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগের বিপজ্জনক কার্যে বা কঠিন কার্যে খনি ইত্যাদিতে নিয়োগ করা আইনবিরুদ্ধ। ভারতীয় সংবিধানের এই ব্যবস্থা কতকটা মার্কিন সংবিধানের আইন সংশোধন প্রস্তাবের অনুরূপ।

ধর্মের অধিকার (Right to Religion)

ভারতের সংবিধান অনুসারে ভারত এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State) বলিয়া পরিচায়িত। রাষ্ট্র অনুমোদিত বা সমর্থিত কোন ধর্ম ভারতবর্ষে থাকিবে না এবং সকল ধর্ম পালনের সমান অধিকার ও সুবিধা থাকিবে। কোন বিশেষ ধর্ম প্রচারের জন্য রাষ্ট্র নাগরিকদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিবে না। অথবা রাষ্ট্রের সাহায্যে পরিচালিত শিক্ষায়তনগুলিতে কোন প্রকার ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইবে না। অর্থাৎ কাহাকেও কোন বিশেষ গোঁড়ামিতে (dogma) আবদ্ধ হইতে বাধ্য করা

যাইবে না। অবশ্য কোন বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা বা শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সংস্কৃত কলেজে উপনিষদ সম্পর্কে শিক্ষা করা হয়। কোন শিক্ষায়তনেই কোন ব্যক্তিকে তাহার নিজের বা তাহার অভিভাবকের অনুমতি ভিন্ন বিশেষ ধর্মশিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করা যাইবে না। যেমন একদিকে রাষ্ট্রের কোন বিশেষ ধর্ম থাকিবে না অন্যদিকে তেমনি সকলেরই ধর্ম ভারতবর্ষে প্রচার, স্বীকার ও ব্যবহার করিবার পূর্ণ অধিকার থাকিবে। প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মস্বীকার ও ধর্মপ্রচারের সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। যে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় ভারতে মন্দির মঠ বা গীর্জা প্রভৃতি ধর্মাচরণের গৃহ বা কেন্দ্র নির্মাণ করিতে পারে অথবা স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি ধর্ম প্রচার কার্যের জন্য অর্জন ও ব্যবহার করিতে পারে। রাষ্ট্র জনশৃঙ্খলা স্বাস্থ্যরক্ষা বা নৈতিক উন্নতির খাতিরে এই ধর্মাচরণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারে, এই সকল অনুষ্ঠানের ধর্মনিরপেক্ষ কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এবং হিন্দু মন্দির দ্বার সকল সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত করিতে পারে। সংবিধানের ২৫ হইতে ২৮ অনুচ্ছেদে ধর্মের অধিকারের উল্লেখ আছে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights)

সংবিধানের ২৯ ও ৩০ ধারায় এই সকল অধিকারের উল্লেখ আছে। ভারতে বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গের নিজ নিজ ভাষা সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও লিপি অনুসরণ করিবার অধিকার আছে। কেবলমাত্র ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা শ্রেণীর ভিত্তিতে, রাষ্ট্র পরিচালিত কোন শিক্ষায়তনের প্রবেশ-পথ নিষিদ্ধ হইবে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পছন্দমত নিজ নিজ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিবার সুযোগ লাভ করে। সরকার অর্থ সাহায্য দানের সময় সংখ্যালঘুদের প্রতিষ্ঠানের সহিত অধিকাংশ সম্প্রদায়ের কোন প্রভেদ করিবেন না। সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মঙ্গলকল্পে বহুবিধ বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। চাকুরীর ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের ও বিশেষতঃ অনুন্নত শ্রেণীর জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিতে পারে, আইন সভায় জনসংখ্যানুযায়ী সংখ্যালঘু ও অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের জন্য ঐ প্রকার আসন সংরক্ষিত থাকিবে। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে লোকসভায় দুইজন অবধি

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সভ্য মনোনীত করিতে পারেন। গভর্নর ইচ্ছা করিলে রাজ্যের আইন সভায় উচিত মত এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সভ্য মনোনীত করিতে পারেন। সংবিধানের অষ্টম সংশোধন আইনের ফলে ঐ সকল সাময়িক প্রথা সংবিধান সুরু হইতে দশ বৎসরের স্থলে কুড়ি বৎসর বলবৎ থাকিবে।

শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)

মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ ও কার্যকরী করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণের নিকট আবেদন করিবার অধিকার ভারতীয় সংবিধানে দেওয়া হইয়াছে। ৩২ অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট মৌলিক অধিকার বলবৎ করিবার নিমিত্ত বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ (habeas corpus), যে কোন পরমাদেশ (mandamus), প্রতিষেধ (prohibition) অধিকার পৃচ্ছা (quo warranto) এবং উৎপ্রেষণ (certiorari) অথবা ঐ ধরণের কোন আদেশ বা নির্দেশ জারি করিতে সক্ষম।

২২৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে হাইকোর্ট এই সকল নির্দেশগুলি, মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে জারি করিতে পারে। সংবিধানের ১৩৯ ধারা অনুসারে পার্লামেণ্ট যে কোন প্রকার অবস্থায় উল্লেখিত নির্দেশগুলি জারি করিবার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টকে প্রদান করিতে পারেন।

অবশ্য আপৎকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা দ্বারা এবং পৃথক আদেশ জারী করিয়া আদালতে অধিকার সমূহ বলবৎ করিবার আবেদন স্থগিত করিতে পারেন।

৩২ ধারায় বর্ণিত নির্দেশের সুযোগ গ্রহণ করিতে হইলে যে ব্যক্তি অধিকার বলবৎ করিতে চাহে তাহাকেই স্বয়ং আবেদন করিতে হইবে। অবশ্য বেআইনীভাবে আটক থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বন্ধু বা আত্মীয় তাহার পক্ষে আবেদন করিতে পারে। উপযুক্ত ও যথাবিহিত নির্দেশ আদালত জারি করিবে। আবেদন প্রার্থিত না হইলেও নির্দিষ্ট ও যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনে আদালত দ্বিধা প্রকাশ করে না। আবেদন করিতে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটিলে বা ঘটনা সম্পর্কে উপযুক্ত প্রমাণ না থাকিলে বা সন্দেহপূর্ণ তথ্য থাকিলে আদালত নির্দেশ জারি না করিতেও পারেন।

বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus)—বন্দী ব্যক্তিকে সশরীরে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য এই নির্দেশ জারি করা হয়। এবং কি কারণে তাহাকে আটক করা হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধান করা হয়।

এই আদেশ বা লেখের ফলে বেআইনীভাবে আটক বন্দীগণ তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করে এবং অন্যথায় সকল বন্দীগণের অনতিবিলম্বে বিচারের বন্দোবস্ত হয়।

পরমাদেশ (Mandamus)—কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা নিম্নতন আদালতকে বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট পরমাদেশ নির্দেশ জারি করে। অবশ্য কেবলমাত্র সর্বজন স্বার্থ সংক্রান্ত কার্যের ব্যাপারেই এবং আইনসঙ্গত অধিকার সম্বন্ধে এই আদেশ ধার্য করা হয়। এই আদেশ দ্বারা আদালত সরকারকে আইনসম্মত ও জনস্বার্থসংক্রান্ত কার্য করিতে বাধ্য করিতে পারে। পরমাদেশের প্রার্থনার পূর্বে প্রার্থীকে ন্যায়বিচার চাহিতে হইবে এবং তাহা অস্বীকার করিলে তবেই বিচারক এই প্রকার আদেশ দিবেন।

উৎপ্রেষণ (Certiorari)—নিম্নতন বিচারালয় বা বিচার-কার্যের ক্ষমতা আছে এমন ব্যক্তি আইনানুগ ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিলে উৎপ্রেষণের মাধ্যমে ঐ আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া আইনানুগ বিচারের জন্য উর্ধ্বতন আদালতে বিচার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রতিষেধ (Prohibition)—এই ব্যবস্থা বা নির্দেশের মাধ্যমে উর্ধ্বতন আদালত নিম্নতন আদালতকে আপন সীমানা বা বিচার বিভাগীয় এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য করে এবং নিষেধাজ্ঞা দ্বারা সেই সীমা ছাড়াইয়া যাওয়া বন্ধ করে।

অধিকার পৃচ্ছা (quo warranto)—পদপ্রার্থীর যোগ্যতা বিষয়ক বিচারের জন্য এই নির্দেশের প্রয়োজন হয়। কোন ব্যক্তি যে পদের জন্য উপযুক্ত নহে সেই পদের জন্য যখন দাবী পেশ করে তখন অধিকার পৃচ্ছা নির্দেশের সাহায্যে সেই ব্যক্তির যোগ্যতা বিচারের ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐ বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে দাবি বিবেচনা করা হয়।

সপ্তম অধ্যায়

নির্দেশমূলক নীতি

(Directive Principles)

[সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রবর্তন নির্দেশমূলক নীতির উদ্দেশ্য]

সংবিধানের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৩৬ হইতে ৫১ অনুচ্ছেদগুলির সমন্বয়ে নির্দেশমূলক নীতিগুলি প্রকাশ করা হইয়াছে। এই নির্দেশমূলক নীতিগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, কার্যাবলী ও ভূমিকার আভাস পাওয়া যায়। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রতিফলন এই নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক আবিষ্কারের কথা এবং জনহিতকর রাষ্ট্রের নীতি ও আদর্শের কথা এই নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে প্রকাশ পাইয়াছে।

জনহিতকর রাষ্ট্রের প্রবর্তন নির্দেশমূলক নীতির উদ্দেশ্য

ভারতীয় সংবিধানে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ব্যতিরেকে প্রকৃত গণতন্ত্রের বিকাশ কোন অবস্থাতেই সম্ভব নহে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি

মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করিবার ক্ষমতা আদালতের হস্তে ন্যস্ত হইলেও: নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে আদালত বলবৎ করিতে অসমর্থ।

আদালত নির্দেশমূলক নীতি বলবৎ করে না

বলা হইয়াছে জনগণের কল্যাণের নিমিত্ত সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচারের জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে। রাষ্ট্রের কাঠামো ও প্রকৃতি এইরূপভাবে গঠিত হইবে যাহাতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নাগরিকগণ পর্যাপ্ত জীবিকার্জনের অধিকার ভোগ করিতে সক্ষম হয়। জনগণের জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকিবে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্র চেষ্টিত থাকিবে। রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হইবে সর্বজনের মঙ্গলের জন্য সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বণ্টন করা। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির কর্ম-

জীবিকার্জন। জীবনধারণের মান। আন্তর্জাতিক শান্তি. কর্ম সংস্থান মালিকানা নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন

সংস্থান করা, মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের অন্যতম মহান দায়িত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

শিক্ষা, বেকার ভাতা, বৃদ্ধ ও পীড়িতের আর্থিক সাহায্য, গণতান্ত্রিক নিয়োগ ব্যবস্থা, প্রসূতি সদন, কর্মের স্বাচ্ছন্দ্য, কুটীর শিল্পের প্রসার

নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান, শিক্ষা, বেকারভাতা, বার্ধক্যে ও পীড়িত অবস্থায় পঙ্গু বা অঙ্গহানি হইলে অর্থসাহায্য প্রভৃতির অধিকার প্রদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। নিয়োগ ব্যবস্থার সর্তাদি ন্যায়সংগত ও মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন কিনা তাহা রাষ্ট্র লক্ষ্য রাখিবে। রাষ্ট্র প্রসূতিদিগের সহায়তা করিবে ও প্রসূতিসদনের ব্যবস্থা করিবে। সকল শ্রেণীর শ্রমিকদিগের জন্য কর্মের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান কল্পে দৈনিক কার্যকাল ও জীবনধারণের উপযোগী বেতন নির্ধারণ রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সহিত গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক বনিয়াদের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত কুটীরশিল্পের প্রসারে সহায়তাও রাষ্ট্রের আদর্শ কর্তব্যরূপে অভিহিত হইবে।

জীবনীশক্তিবৃদ্ধি জনস্বাস্থ্যের উন্নতি খাদ্য পুষ্টি ব্যাধি প্রতিরোধ ও চিকিৎসার উন্নতি বৃদ্ধি ও পশুপালন শিক্ষার প্রসার বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠন ইত্যাদি।

ভারতীয় নাগরিকদিগের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানে রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকিবে। খাদ্য পুষ্টি, ব্যাধি প্রতিরোধ ও চিকিৎসার উন্নতির মাধ্যমে এই ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি ও পশুপালন সংগঠন করা ও গবাদি পশু হত্যা নিবারণ করা, শিশুদিগের জন্য অর্থাৎ চৌদ্দ বৎসরের অনূর্ধ্ব বালক-বালিকাদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাদানের প্রয়াস, গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠন ও কার্যকর করা রাষ্ট্রের মহান দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

একই প্রকার দেওয়ানী মামলা—মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ—ঐতিহাসিক স্মারকগুলির সংরক্ষণ

সকল নাগরিকের জন্য একইপ্রকার সর্বভারতীয় দেওয়ানি আইন প্রচলিত করা, ঔষধ প্রস্তুতি ব্যতিরেকে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা, ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্মারক বস্তুগুলির উপযুক্ত সংরক্ষণ করা, শাসন বিভাগ হইতে বিচার-বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ করা ইত্যাদি রাষ্ট্রের আদর্শ কর্তব্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

যদিও এই নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত বলবৎ করিতে সক্ষম নহে

তথাপি এই নীতিগুলি তাৎপর্যহীন নহে। আইনসভা এই সকল মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই নীতিগুলি আইনে পর্যবসিত করিবে এবং শাসনবিভাগ এই সকল নীতিগুলির নির্দেশমত শাসনকার্য পরিচালনা করিবে। বিচারালয়গুলিও এই নীতিগুলির আদর্শে সংবিধানের বিভিন্ন দুজ্ঞেয় বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করিবেন।

নির্দেশমূলক নীতিগুলির উদ্দেশ্য

অষ্টম অধ্যায়

ইউনিয়ন সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সম্পর্ক

[১৯৫৬ সালের পূর্বে ভারতীয় ইউনিয়নের অবস্থা ও '৫৬ সালের ১লা নভেম্বরের পরে পুনর্গঠন ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্মত ক্ষমতা বণ্টন—ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত বিষয়, যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়, অবশিষ্টাংশ ক্ষমতা, রাজ্য তালিকাভুক্ত ক্ষমতা]

সংবিধানে ভারতকে কতিপয় রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত ইউনিয়নরূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের পূর্বে ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলি ক খ, গ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ঘ শ্রেণীভুক্ত ছিল। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর আর্থিক সুবিধা ও ভাষার ভিত্তিতে এবং কতকাংশে যোগ্যতার মাধ্যমে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন করা হয়। এই পুনর্গঠনের ফলে রাজ্যগুলির মধ্যে পূর্বে প্রবর্তিত শ্রেণী বিভাগের বিলোপ সাধন করা হয়। ভারতবর্ষে এখন ১৬টি রাজ্য, যথাক্রমে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ও কাশ্মীর নাগাভূমি এই রাজ্যগুলি ব্যতীত কেন্দ্র শাসিত আটটি অঞ্চল ভারতে রহিয়াছে, যথা দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান নিকোবর ও লাক্ষা দ্বীপ মিনিকয় ও আমিন দ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ, দাদরা ও নগর হাবেলী এবং গোয়া, দমন ও ডিউ। ১৯৫৪ সালের চুক্তির মাধ্যমে ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরী,

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বরের পর রাজ্য পুনর্গঠন

কারিকল, মাহে প্রভৃতি অঞ্চল ভারত সরকারের নিকট সমর্পিত হয়। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাহায্যে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটাইয়া গোয়া মুক্তি সম্ভবপর করা হয়। ইউনিয়ন ও অঙ্গ রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা হইয়াছে।

১৯৬১ সালের সংবিধান দশম সংশোধন আইনে দাদরা ও নগর হাবেলী সপ্তম কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল বলিয়া গণ্য হয়। ১৯৬২ সালের দ্বাদশ সংশোধন আইনে গোয়া দমন ও ডিউ অষ্টম কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল রূপে পরিগণিত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে রাজ্য, কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ও অধিকৃত অঞ্চল লইয়া ভারতরাষ্ট্র গঠিত। পার্লামেণ্ট অধিকাংশের অনুমোদনে কোন রাজ্য গঠন, রাজ্যগুলির সীমা পরিবর্তন, সঙ্কোচন বা বর্ধিতকরণ অথবা দুই রাজ্যের একত্রীকরণ করিতে সক্ষম। শুধু ঐ সকল আইন রাষ্ট্রপতির মত লইয়া পার্লামেণ্টে গৃহীত হইবে এবং রাষ্ট্রপতি তাঁহার সম্মতি দিবার পূর্বে যে রাজ্যগুলি ঐ সকল আইনের আওতায় পড়িবে তাহাদের মতামত জানিবেন। এই সকল আইন সংশোধনী আইন বলিয়া গণ্য হইবে না।

ইউনিয়ন সরকার রাষ্ট্রপতি শাসিত

বেরুবাড়ী আইন বিচারে সুপ্রীম কোর্ট ধার্য করেন যে ঐ পদ্ধতি শুধুমাত্র ভারতের সীমানার মধ্যে রাজ্যগুলির সীমারেখা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে। যদি ভারতবর্ষের সীমারেখা খণ্ডিত করিয়া ভারতের কোন রাজ্য বা রাজ্যের অংশ বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত মিলিত করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তবে তাহার জন্য ৩৬৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংশোধনী প্রস্তাব যথাবিহিত দুই তৃতীয়াংশর সংখ্যাধিক্যে পাশ করিয়া সেই ভাবে সংবিধানের প্রথম অথবা তৃতীয় অনুচ্ছেদের সংশোধন আবশ্যক হইবে।

ইউনিয়ন সরকারের শাসক প্রধান হইলেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা ও উপদেশ দিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হইয়াছে রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে কার্য চালাইবার জন্য উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয়।

রাজ্য সরকারগুলির শাসক-প্রধান রাজ্যপালরূপে পরিচিত। একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে রাজ্য-প্রধান সদর-ই রিয়াসৎ রূপে অভিহিত। রাজ্যপালের কার্যে সহায়তা ও নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়।

রাজ্য সরকারের শাসক প্রধান হইলেন রাজ্যপাল

ইউনিয়ন আইন সভা পার্লামেণ্টরূপে আখ্যায়িত। ভারতীয়'পার্লামেণ্ট দুইটি পরিষদের সমন্বয়ে গঠিত। উচ্চ পরিষদ রাজ্যসভা ও নিম্ন পরিষদ লোকসভা বলিয়া অভিহিত হয়।

দ্বিপরিষদীয় ভারতীয় পার্লামেণ্ট

রাজ্যে সাধারণত নিম্নতন পরিষদ লইয়া বিধান সভা গঠিত হয়, অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিপরিষদীয় বিধান সভার নজীর আছে। রাজ্য আইনসভা অনুমোদন করিলেও পার্লামেণ্টে যথাবিহিত পাশ হইলে রাজ্যের বিধানসভার অন্য পরিষদ গঠন বা বিলোপ সাধন করা যাইতে পারে।

রাজ্যের আইনসভা

শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের ন্যায় ইউনিয়ন রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে পৃথক বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। সমগ্র ভারতে একই প্রকার সর্বভারতীয় বিচার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। রাজ্যের নূতন পঞ্চায়েৎ বিচার সভা হইতে সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট অবধি এক পিরামিড রূপ বিচারবিভাগের কাঠামো পরিলক্ষিত হয়।

একইপ্রকার বিচার ব্যবস্থা

ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির মধ্যে তিন প্রকারে আইন বিভাগীয় ক্ষমতার বণ্টন হইয়াছে। সপ্তম তপশীলে ইউনিয়ন তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা এই তিনটি তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পার্লামেণ্ট ইউনিযন তালিকাভুক্ত বিষয় সমূহের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে এবং যুগ্ম তালিকাভুক্ত (Concurrent List) বিষয়গুলির ব্যাপারে পার্লামেণ্ট ও রাজ্য বিধান সভা উভয়ই আইন প্রণয়নে সক্ষম। কিন্তু যে স্থলে-পার্লামেণ্টের আইনের সহিত রাজ্য আইনের বিরোধ উপস্থিত হয় সেই স্থলে পার্লামেণ্টের আইন বলবৎ হয়। রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় সমূহের উপর রাজ্য বিধান মণ্ডলীর আইন প্রণয়নের অধিকার থাকিলেও কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা মধ্যে মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্টাংশ (residuary) ক্ষমতা কেন্দ্রীয় বা ইউনিয়ন সরকারকে সমর্পণ করায় কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় দুই বা ততোধিক রাজ্য আইন পরিষদ প্রস্তাব করিয়া অনুরোধ করিলে পার্লামেণ্ট তাহাদের সাধারণ স্বার্থে রাজ্য তালিকার কোন বিষয়ে আইন

ইউনিয়ন তালিকা রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা

অবশিষ্টাংশ ক্ষমতা

প্রণয়ন করিতে পারে। রাজ্য সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দাবি করিলে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকার যে কোন বিষয়ে আইনের প্রস্তাব গ্রহণ বা আইন প্রণয়ন করিতে সক্ষম হন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি ও সর্তপালনের জন্য পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ।

ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত ৯৭টি বিষয়ে একমাত্র ইউনিয়ন সরকারই আইন প্রণয়নে সক্ষম। রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ৬৬টি বিষয়ে রাজ্য বিধানমণ্ডলীর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে। যুগ্ম তালিকায় ৪৭টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

সপ্তম তপশীলের অন্তর্ভুক্ত প্রথম তালিকার অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় বা ইউনিয়ন সরকারের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং ১৬২ অনুচ্ছেদ অনুসারে দ্বিতীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ে রাজ্য সরকারের শাসন বিভাগীয় ক্ষমতার কথা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু যুগ্ম তালিকা বা তৃতীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকার উভয়ের অধীনস্থ হইলেও রাজ্য সরকারের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

অবশ্য রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার অর্জন করিয়াছে। পার্লামেণ্টের আইনের উপযুক্ত প্রয়োগ ব্যবস্থা বা ইউনিয়ন শাসন বিভাগের ক্ষমতা লংঘন প্রতিরোধকল্পে যে নির্দেশ দান প্রয়োজনীয় তাহা কেন্দ্রীয় বা ইউনিয়ন সরকার প্রদান করিতে দ্বিধা করে না। তাহা ছাড়া রেলপথের সংরক্ষণ, জাতীয় বা সামরিক প্রয়োজনে সর্ব প্রকার পরিবহন ও যোগাযোগের সংগঠন, পরিচালনা অথবা রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে।

রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দান করিতে পারে

আপৎকালীন সময় রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইউনিয়ন সরকার রাজ্য সরকারকে শাসনবিভাগীয় নির্দেশ দান করে।

প্রশাসনিক ক্ষমতা বণ্টনের আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা স্মরণীয় যে

আপৎকালীন ব্যবস্থায় ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি এককেন্দ্রিকরূপ পরিগ্রহ করে। স্বাভাবিক অবস্থায়ও বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপায় সহযোগে ইউনিয়ন সরকার রাজ্য সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান, ইউনিয়ন সংক্রান্ত কার্য বিষয়ে রাজ্য সরকারকে ক্ষমতা অর্পণের মাধ্যমে, সর্বভারতীয় চাকুরী ব্যবস্থা ও অর্থ সাহায্য মঞ্জুরির দ্বারা কেন্দ্রীয় বা ইউনিয়ন সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। এই পদ্ধতিগুলি ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

আপৎকালীন সময় কেন্দ্রের ক্ষমতা

ইউনিয়ন প্রণীত আইনের কার্যকারিতা ও রাজ্যগুলির শাসনবিভাগীয় সীমানা অতিক্রান্ত করিবার বিষয় ব্যতিরেকে সামরিক প্রয়োজনে রাস্তাঘাট যানবাহন সম্প্রসারণ ও রেলওয়ে সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে ইউনিয়ন সরকার নির্দেশ প্রদান করিতে সক্ষম। অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে অর্থসংক্রান্ত নীতি ব্যাখ্যা করিয়া—ইউনিয়ন সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দানে সক্ষম।

সামরিক প্রয়োজন ও কেন্দ্রিকতা

ইউনিয়ন সরকারের নির্দেশাবলী অবমাননা করিলে রাষ্ট্রপতি রাজ্য সরকারের শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে স্থানে ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে জরুরী অবস্থা ঘোষণা দ্বারা রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ৩৬৫ অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত নির্দেশ সমূহের প্রচলন করিতে পারেন।

৩৫৬ অনুচ্ছেদ

নবম অধ্যায়

ইউনিয়নের শাসন বিভাগ—রাষ্ট্রপতি

(The President)

[নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান—বিশেষ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন—অপসারণ—রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর যোগ্যতা—শাসনবিভাগীয়, আইন বিভাগীয়, বিচার বিভাগীয়, অর্থসংক্রান্ত, জরুরী বিষয় সংক্রান্ত ক্ষমতা]

রাষ্ট্রপতিই ভারতীয় ইউনিয়নের শাসক-প্রধান। অবশ্য রাষ্ট্রপতি কেবলমাত্র নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা। প্রকৃত ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার নিকট দায়ী মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে শাসন কার্য পরিচালিত হয়।

নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান

ভারতের রাষ্ট্রপতি এক নির্বাচনী সংস্থার মাধ্যমে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে হস্তান্তরযোগ্য একটিমাত্র ভোট প্রদানের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যগণকে লইয়া রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংস্থা গঠিত হয়। ভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব যথাসম্ভব একই হারে হয় এবং ইউনিয়ন ও সমষ্টিগতভাবে রাজ্যগুলির মধ্যে ভোটের সমতা রক্ষা করিবার প্রয়াস হয়। গাণিতিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন

$$\text{রাজ্য বিধান সভার সদস্যের মোট ভোটের সংখ্যা} = \frac{\text{রাজ্যের মোট জন সমষ্টি}}{\text{রাজ্য বিধান সভার মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা} \times ১০০০}$$

$$\text{পার্লামেন্টের সদস্যের মোট ভোটের সংখ্যা} = \frac{\text{সমস্ত রাজ্য বিধান সভাগুলির সকল সদস্যদিগের মোট ভোটগুলির সংখ্যা}}{\text{পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা}}$$

রাষ্ট্রপতি ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইলেও তাঁহার পুনর্নির্বাচনে কোন বাধা নাই।

কার্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিতে পারেন অথবা পার্লামেণ্ট বিচার কার্য (impeachment) পরিচালনা করিয়া তাঁহাকে অপসারিত করিতে পারেন। পার্লামেণ্টের যে কোন পরিষদ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান ভংগের অভিযোগ আনিতে পারে এবং এইরূপ অভিযোগপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করিবার পূর্বে ঐ পরিষদের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশের দ্বারা স্বাক্ষরিত অন্তত ১৪ দিনের এক নোটিশ জারি করিয়া প্রস্তাব উত্থাপনের অভিপ্রায় জানাইতে হয়। ইহার পর উক্ত প্রস্তাব ঐ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা সমর্থিত হইয়া পাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক পরিষদে এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর অপর পরিষদে এই বিষয়ে অনুসন্ধান কার্য চলিবে এবং অপর পরিষদে অভিযোগ সত্য বলিয়া দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সমর্থন জানাইয়া প্রস্তাব পাশ করিলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করা যায়।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও অপসারণ সংক্রান্ত নীতি

রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। উক্ত প্রার্থীকে লোকসভার সদস্যপদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল গুণাবলীসম্পন্ন হইতে হইবে। বেতনভোগী কোন পদে রাষ্ট্রপতি অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না এবং রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন অবস্থায় লোকসভা বা রাজ্যসভার সদস্যপদ গ্রহণে সক্ষম হইবেন না।

পদপ্রার্থীর যোগ্যতা

পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা রাষ্ট্রপতির বেতন, ভাতা ইত্যাদি স্থির করে, অন্যথায় রাষ্ট্রপতি দ্বিতীয় তপশীলে উল্লিখিত বেতন, ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন।

রাষ্ট্রপতির সুযোগ সুবিধা

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই বিশ্বস্ততার সহিত রাষ্ট্রপতির কার্য সম্পাদন করিবেন, যথাসাধ্য সংবিধান ও আইন রক্ষা ও পালন করিয়া ভারতের জনগণের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবেন বলিয়া এই মর্মে ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতির পদের গুরুত্ব

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

(১) শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা

সংবিধানের ৫৩নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ইউনিয়নের সকল শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর বর্তাইবে। তিনি নিজে বা তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদিগের দ্বারা দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। রাষ্ট্রপতির শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতাকে মোটামুটি প্রশাসনিক, সামরিক ও কূটনৈতিক এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

শাসন বিভাগ সংক্রান্ত ক্ষমতা

(ক) প্রশাসনিক ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান হইলেও তাঁহার নামে সকল প্রশাসনিক কার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইউনিয়নের কার্য পরিচালনা সম্পর্কে সংবাদ গ্রহণের অধিকার রাষ্ট্রপতিকে অর্পণ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি নিয়োগ ও পদচ্যুত করিবার ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান মন্ত্রী, অপরাপর ইউনিয়ন মন্ত্রী, অ্যাটর্নী জেনারেল, অডিটর জেনারেল, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ, রাজ্যগুলিতে অবস্থিত হাইকোর্টের বিচারপতিগণ রাজ্যপাল, আর্থিক কমিশন, সরকারী চাকুরী কমিশন প্রভৃতি নিয়োগ করেন এবং প্রয়োজনে রাজ্যপাল, অ্যাটর্নী জেনারেল বা মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

(খ) সামরিক ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতি ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। অবশ্য প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া রাষ্ট্রপতি কার্য পরিচালনা করিবেন। পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতিরেকে রাষ্ট্রপতির পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সৈন্য নিয়োগ সম্ভব নহে।

(গ) কূটনৈতিক ক্ষমতা—রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবার গৌরব অর্জন করেন। অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূত, কূটনৈতিক কর্মচারী ও রাষ্ট্রপ্রধানদিগকে গ্রহণ করেন এবং ভারতের পক্ষে নানা দেশে অনুরূপ রাষ্ট্রদূত বা কূটনৈতিক কর্মচারী প্রেরণ করেন।

(২) রাষ্ট্রপতির আইন বিভাগীয় ক্ষমতা

ভারতীয় পার্লামেন্টের সহিত ভারতের রাষ্ট্রপতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর ন্যায় রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের যে কোন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে নিম্ন পরিষদ বা লোকসভার অধিবেশন স্থগিত করিয়া বা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বানেও সক্ষম।

আইন বিষয়ক ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনের সুরুতে বক্তৃতা করেন। সাধারণ নির্বাচনের পরে এই যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করা হয় এবং পরে বৎসরের প্রথমে অনুরূপ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি বক্তৃতা করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতির বক্তৃতার মধ্য হইতে মন্ত্রিসভার নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। সংবিধানের ৮৬ নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি যে কোন সময় যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে পারেন বা বাণী প্রেরণে সক্ষম।

রাষ্ট্রপতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের রিপোর্ট পার্লামেন্টে দাখিলপূর্বক সদস্য-দিগের মতামত গ্রহণ করিতে পারেন। বাৎসরিক অর্থনৈতিক বিবৃতি (Annual Financial Statement) অতিরিক্ত বাজেট অডিটর জেনারেলের বিবরণ বা অর্থ কমিশনের প্রস্তাব ও সুপারিশসমূহ, রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

নূতন রাজ্য গঠন সংক্রান্ত কোন বিল, সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কোন বিল ইত্যাদি পার্লামেন্টে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতির সম্মতি ও সুপারিশ গ্রহণ করিতে হয়। রাষ্ট্রপতির বিনা অনুমতিতে অর্থবিল পার্লামেন্টে উত্থাপন করা সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রপতির বিনা অনুমোদনে সাহায্য সংক্রান্ত বিল পেশ করা যায় না অথবা সংরক্ষিত তহবিল হইতে ব্যয় করা সম্ভব হয় না।

রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টে গৃহীত বিলে সম্মতি প্রদান করিতে পারেন বা সম্মতি দানে বিরত থাকিতে পারেন অথবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য বিলের ক্ষেত্রে পুনরায় বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টে বিল ফেরৎ পাঠাইতে পারেন। অবশ্য পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ পুনরায় বিল পাস করিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দানে বাধ্য হন।

১২৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অধিবেশনের বিরতিকালে অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারেন।

(৩) বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial Powers)

রাষ্ট্রপতি দণ্ডিত ব্যক্তিকে করুণাপ্রদর্শন করিতে পারেন। তিনি দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডাদেশ মকুব, হ্রাস বা স্থগিত করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি মৃত্যুদণ্ডও মকুব করিতে পারেন।

বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা

(৪) অর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে আলোচ্য বৎসরের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত একটি বিবরণী বা বাজেট পার্লামেন্টের যুক্ত অধিবেশনে উপস্থাপিত বা পেশ করেন। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত ব্যয় মঞ্জুরীর দাবী বা অর্থ-সংক্রান্ত বিল বা রাজস্ব বিল উত্থাপন করা সম্ভব নহে। রাষ্ট্রপতি অভাবিত ব্যয় মিটানর জন্য আকস্মিকতা তহবিল (Contingency Fund) হইতে অর্থ মঞ্জুর করিতে পারেন।

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা

(৫) জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি—(ক) যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগ উপস্থিত হইলে অথবা রাষ্ট্রপতির মতে ঐরূপ গোলযোগের আশু সম্ভাবনা থাকিলে, (খ) দেশের শাসনযন্ত্র বিকল হইয়া পড়িলে এবং (গ) রাষ্ট্রে আর্থিক সংকট উপস্থিত হইলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন।

জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা

(১) ৩৫২ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়াছে আশংকায় যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের বা আশুসম্ভাবনার অজুহাতে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ ঘোষণা পূর্ব হইতে পার্লামেন্ট দ্বারা সমর্থিত না হইলে সাধারণতঃ দুই মাস কাল বলবৎ থাকিবে। জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন সময় ইউনিয়ন সরকার রাজ্য সরকার-গুলিকে নির্দেশ প্রদান করে, লোকসভার কার্যকাল ৫ বৎসরের পরিবর্তে ৬ বৎসর ধার্য হইতে পারে এবং রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিতে পারে। জরুরী ঘোষণা বলবৎ থাকা-

কালীন সময় ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকাররূপ মৌলিক অধিকার-সমূহ সাময়িক ভাবে প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয় এবং রাষ্ট্রপতির আদেশ-অনুযায়ী মৌলিক অধিকার প্রয়োগ কল্পে আদালতে আবেদন করিবার অধিকার বিনষ্ট হইয়া যায়। যদিও সংবিধানে আপদকালীন অবস্থা ঘোষণা করিবার সমগ্র ক্ষমতা ও ঐরূপ অবস্থা বিচারের ভার রাষ্ট্রপতিকে অর্পণ করা হইয়াছে তথাপি আশা করা যায় যে গণতান্ত্রিক শাসকরূপে রাষ্ট্রপতি তাহার সর্বপ্রকার জরুরী ক্ষমতা মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যবহার করিবেন।

(২) ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন রাজ্যের রাজ্যপালের নির্ভরযোগ্য সংবাদের ভিত্তিতে অথবা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতির যদি ধারণা হয় যে উক্ত রাজ্যপালের সংশ্লিষ্ট রাজ্যে শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে তদানীন্তন রাজ্য বিধানসভার পক্ষে কার্য সম্পাদন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, ঐ রাজ্যে বিশৃংখলা ও ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে তাহা হইলে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম রাখিবার জন্য রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা দ্বারা ঐ রাজ্যের হাইকোর্ট ব্যতীত সমস্ত শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন, ফলে ঐ রাজ্যে হাইকোর্ট ব্যতীত সংবিধান অনুযায়ী অন্যসব শাসনকার্য স্থগিত থাকে। তিনি নিজে ঐ রাজ্য পরিচালনা করিতে পারেন ও আইন প্রণয়ন করিতে পারেন অথবা রাজ্যপালের হাতে ঐ রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেন। পার্লামেন্ট ঐ রাজ্যের রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়েও আইন বলবৎ করিতে সক্ষম হয়। সাধারণতঃ এইরূপ জরুরী অবস্থার মেয়াদ দুইমাসকাল ধার্য হয়। পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে, ইহা ছয়মাস পর্যন্ত চালু থাকিতে পারে। পূর্ব পাঞ্জাবে ১৯৫১ সালে, পেপসু রাজ্যে ১৯৫৩ সালে, অন্ধ্র রাজ্যে ১৯৫৪ সালে, ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্যে ১৯৫৬ সালে স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন অসম্ভব হওয়ায় ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় অসুবিধা হওয়ায় ঐরূপ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। কেরালা রাজ্যের কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিসভাও ১৯৫৯ সালে এইভাবে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল ও কেরালায় রাষ্ট্রপতির শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। কেরালা রাজ্যপালের মতে কেরালা সরকার অধিকাংশ জনগণের বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, যদিও আইনসভায় মন্ত্রিসভার অল্পসংখ্যক সংখ্যাধিক্য ছিল। সেইজন্য অনন্যোপায় হইয়া রাজ্যপালের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কেরালা রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে বাধ্য হন।

(৩) যদি ভারতের বা ভারতের কোন অংশের আর্থিক সুনাম বিপন্ন হয় বা আর্থিক স্থায়িত্ব ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইলে ৩৬০ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি আর্থিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। এইরূপ অবস্থায় অর্থ সংক্রান্ত যে সকল বিধি ও নীতি কেন্দ্র ধার্য করে তাহাই রাজ্যগুলিকে মানিয়া চলিতে হয়। ঐরূপ ঘোষণাকালীন সেইসব রাজ্যসরকারের অর্থ-বিল রাজ্যপালের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতিরেকে বলবৎ হয় না এবং সরকারী চাকুরি এমন কি সুপ্রীম কোর্ট ও রাজ্যের প্রধান বিচারালয়গুলির বিচারপতিগণের বেতন হ্রাস করাও অসম্ভব হয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে সর্বশক্তিমান হিসাবে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় মন্ত্রিপরিষদ এবং পার্লামেণ্ট সকল শাসন বিভাগীয় এমন কি রাষ্ট্রপতির বিচার বিভাগীয় কর্মও সম্পাদন করিতেছে। নামে রাষ্ট্রপতি শাসক-প্রধান, কিন্তু প্রত্যেক ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি কার্য পরিচালনা করেন। ৭৪ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে রাষ্ট্রপতির কার্যে সহায়তা ও উপদেশ প্রদানের জন্য প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে এক মন্ত্রিসভা থাকিবে—"There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions." আবার মন্ত্রিমণ্ডলী যে উপদেশ দিবেন তাহা বিচারালয়গুলির আয়ত্তাধীন নহে।

উক্ত অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি সরাসরিভাবে অথবা তাঁহার অধস্তন কর্মচারীদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। সম্রাট বনাম শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মামলার বিচারে প্রিভি কাউন্সিল বলেন যে মন্ত্রিগণ অধীনস্থ কর্মচারীর পর্যায়ভুক্ত।

পার্লামেণ্টারী প্রথায় ও দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পক্ষে স্বৈরাচারী হইবার কোন সুযোগ নাই। ভারতের রাষ্ট্রপতি, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের মতে, সর্ব অবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি ("the President would become constitutional President in all matters")।

আবার ভারতীয় সংবিধানের জনক এবং সংবিধান কমিটির চেয়ারম্যান

ডঃ আম্বেদকরের মতে রাষ্ট্রপতি জাতীয় প্রতিনিধি বটে, কিন্তু জাতির শাসক নহেন—'The President will represent the nation but will not rule the nation'.

ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ব্রিটিশ রাজা বা মার্কিন রাষ্ট্রপতির সহিত তুলনামূলকভাবে বিচার করিলে ভারতের রাষ্ট্রপতির সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর সহিত অধিকতর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি প্রকৃতপক্ষে শাসক-প্রধান কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি অন্ততঃ স্বাভাবিককালে শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান। অবশ্য আপদ্‌কালীন অবস্থায় তাঁহার প্রকৃত ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কোন অবস্থাতেই আইনসভার সহিত যুক্ত বা আইনসভার নিকট দায়ী নহেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি আইনসভার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত। এই ক্ষেত্রে ব্রিটেনের রাজা বা রাণীর সহিত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটেনের রাজা বা রাণীর ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত বা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। বস্তুতঃ ব্রিটেনে যেমন রাজা বা রাণী মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে কার্য সম্পাদন করে ভারতের রাষ্ট্রপতিও সেইরূপ মন্ত্রিসভার ইচ্ছাকেই রূপ দেন।

রাষ্ট্রপতির প্রকৃত পদমর্যাদা ও ক্ষমতা

দশম অধ্যায়

উপরাষ্ট্রপতি (Vice-President)

[নির্বাচন-পদপ্রার্থীর যোগ্যতা, অপসারণ ও পদত্যাগ]

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে হস্তান্তরযোগ্য একটি ভোট প্রদানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের সদস্যগণ যুক্ত অধিবেশনে মিলিত হইয়া উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন। তিনি

উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও কার্যকাল

৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। পদত্যাগ বা অপসারণের মাধ্যমে ৫ বৎসরের পূর্বেই রাষ্ট্রপতির কার্যকালের সমাপ্তি সূচিত হইতে পারে।

পদচ্যুতি

রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্য উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি দাবি করিলে এবং ঐ প্রস্তাব লোকসভা কর্তৃক সমর্থিত হইলে উপরাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করা সম্ভব। রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা সম্পন্ন যে কোন ৩৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হইতে পারেন। উপরাষ্ট্রপতি পদে আসীন থাকাকালীন অবস্থায় তিনি পার্লামেন্টের সদস্য থাকিতে বা কোন বেতনভোগী পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে অসমর্থ হন।

রাজ্যসভার সভাপতিপদে উপরাষ্ট্রপতি অধিষ্ঠিত থাকেন। রাষ্ট্রপতির অবর্তমান কালে উপরাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপতির সমুদয় কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

একাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদ

(President & Council of Ministers)

[রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান ও প্রকৃতক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ ও প্রধানমন্ত্রী শাসন চালনা করে—মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি শাসন পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ]

ভারতীয় সংবিধানে ইউনিয়ন শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্য পরিচালনায় সহায়তা ও উপদেশ প্রদানের জন্য মন্ত্রিসভা সংযোজিত আছে। ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions."

মন্ত্রিপরিষদ ও প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত শাসক

রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান এবং প্রকৃতক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ এবং প্রধানমন্ত্রীই হইলেন প্রকৃত শাসক।

মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি, আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রিগণ নিযুক্ত হন।

সংবিধানের ৭৪ ও ৭৫ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতির নিয়মতান্ত্রিক চরিত্র প্রকট

সংবিধানগতভাবে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদ নিয়োগে বাধ্য এবং সংবিধানের ধারাগুলি মানিয়া চলিতে শপথ অনুযায়ী বাধ্য থাকেন ফলে রাষ্ট্রপতির নিয়মতান্ত্রিক চরিত্র বিশেষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সংবিধানের ৭৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে দায়ী থাকেন। আইনসভা প্রয়োজন-বোধে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে বিচারকার্য-পরিচালনা করিয়া রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করিতে পারে।

আদালত রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্ক অনুসন্ধানে অপারগ

রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া কার্য পরিচালনা করিতেছেন কিনা তাহা অনুসন্ধান করা আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত। "The question whether any, and if so what advice was tendered by the Ministers to the President shall not be inquired into in any Court."

আইনগতভাবে বাধ্য না হইলেও পরিস্থিতি অনুসারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার অবমাননায় সক্ষম নহে

মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণে আইনগতভাবে রাষ্ট্রপতি বাধ্য না হইলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাচক্রে প্রথা ও রীতিনীতির চাপে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার অবমাননা করিতে অসমর্থ হন। যদি রাষ্ট্রপতি কোন কারণে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণে অস্বীকৃত হন তাহা হইলে ঐ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবে। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হইবে, কারণ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভা রাখিতে বাধ্য এবং সংবিধানের ৭৫ (৫) ধারা মতে মন্ত্রিগণ যদি তাহাদের নিয়োগের ছয়মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের সদস্য না হন তবে তাঁহারা মন্ত্রিপদ হইতে অপসারিত হইবেন। কিন্তু লোকসভায় যৌথভাবে দায়ী থাকিতে অক্ষম অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভের যোগ্য মন্ত্রিসভা গঠন করা রাষ্ট্রপতির সাধ্যাতীত। অতএব পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য সমর্থিত মন্ত্রিসভা বা

প্রধানমন্ত্রীর সহিত বিরোধিতা করিতে রাষ্ট্রপতি প্রবৃত্ত হইবেন না। রাষ্ট্রপতি এমতাবস্থায় লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে পারেন। কিন্তু ঐ নির্বাচনের ফলে পদত্যাগকারী মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবে না এমন নিশ্চয়তা নাই। ফলে শাসন-ব্যবস্থার অচলাবস্থা প্রতিরোধ করা কোনপ্রকারে সম্ভব হইবে না।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে সংবিধান-স্রষ্টাগণ রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক কর্তা করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে গভর্ণর জেনারেলের মত সর্বক্ষমতাশালী করেন নাই এবং সেই কারণে সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে নিজ ইচ্ছার ক্ষমতা (powers in his discretion) ও নিজ বিচারে দায়িত্বপালনের ক্ষমতা (powers in his individual judgment) দেওয়া হয় নাই।

এইজন্য রাষ্ট্রপতিকে সাক্ষীগোপাল বা জাঁকজমকপূর্ণ মহাশূন্য (Magnificent zero) আখ্যা দেওয়া যায়। অবশ্য রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন-বোধে মন্ত্রিসভাকে উৎসাহ, পরামর্শ ও নানা ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিতে পারেন। মন্ত্রিপরিষদ ও প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখেন। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধি-বিবেচনার উপর রাষ্ট্রপতির কার্য ও প্রতিপত্তি নির্ভর করে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রাজনৈতিক দূরদ্রষ্টা রাষ্ট্রপতিকে কোন মন্ত্রি-পরিষদই অবহেলা করিতে পারে না।

রাষ্ট্রপতি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নহেন

রাষ্ট্রপতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি মুকুটহীন ছায়া সম্রাট। তিনি ফরাসী প্রেসিডেণ্ট ও ব্রিটিশ রাজার অনুরূপ, তবে এই উভয়জন অপেক্ষা তাঁহার ক্ষমতা অধিকতর। "A phantom King without a crown the Indian President is a prototype of the French President and the English King though endowed with potentialities greater than both of them." অধুনা রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিমণ্ডলীর সম্পর্ক সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। একটি মতবাদ রাজনৈতিক, তাঁহাদের মতে প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবে। অপর মতবাদটি

দুইটি আধুনিক মত

আইনপূর্ণ। তাঁহাদের মতে ভারতের রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র সাক্ষীগোপাল বা নিয়মতান্ত্রিক অধিপতি নহেন, তিনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। তাঁহারা এই মতবাদের যুক্তিপ্রসঙ্গে বলেন যে লিখিত শাসনতন্ত্রে সংবিধানের ভাষার উপরেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষের লিখিত সংবিধানে ৫৩ অনুচ্ছেদে দেশের শাসনবিষয়ক সমস্ত ক্ষমতার শীর্ষস্থানে রাষ্ট্রপতির স্থান উল্লিখিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে তিনি নিজে সরাসরিভাবে অথবা তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালিত করিবেন।

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে গভর্ণর ও মন্ত্রিসভার সম্পর্ক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'সম্রাট বনাম শিবনাথ' বিচারে প্রিভি কাউন্সিলের মতে এই অনুচ্ছেদের তাৎপর্য হয় এই যে মন্ত্রিমণ্ডলী অধীনস্থ কর্মচারী ভিন্ন কিছুই নহে।

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রপতিই মন্ত্রিমণ্ডলীকে নিয়োগ করিবেন এবং তাঁহাদের পদচ্যুতির ক্ষমতাও তাঁহার বর্তমান। ৭৭ অনুচ্ছেদ মতে তিনি তাঁহাদের মধ্যে কার্যবিভাগ করিবেন এবং তাঁহাদের কার্য পরিচালনার রীতি ও প্রকার বিষয়ক রুল জারী করিবেন।

তৃতীয়তঃ ৭৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মন্ত্রিসভার অধিবেশনের সিদ্ধান্তগুলি বা অন্য কোন বিষয় জানিতে চাহিলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে তাহা জানাইবেন। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে, মন্ত্রিসভা বিশেষ অধিবেশন করিয়া রাষ্ট্রপতি প্রেরিত কোনও বিষয়ে যৌথভাবে মতদান করিয়া তাহা রাষ্ট্রপতিকে জানাইবেন।

চতুর্থতঃ রাষ্ট্রপতির বহুপ্রকার আইনগত ক্ষমতা, বিচার ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হয় না এবং অর্ডিনান্স জারীর মাধ্যমে সাময়িক আইন রচনা করিতে তিনি সক্ষম। পরিশেষে রাষ্ট্রপতির আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করিয়া নিজহস্তে বহুবিধ ক্ষমতা গ্রহণ করিবার কথা উল্লেখ করা হয়। সংবিধানে মন্ত্রিসভার কথা উল্লেখ থাকিলেও রাষ্ট্রপতি স্বাভাবিককালে অথবা আপৎকালীন অবস্থায়--সর্বসময়েই মন্ত্রিসভার উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য থাকিবেন, এইরূপ কোন অনুচ্ছেদ না থাকায় এই দুই বিপরীত মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তাই বলা হয় যে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনের কাঠামো লিখিত সংবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা দায়িত্বশীল সরকারের রাজনৈতিক রীতিনীতি ও ব্যবহারের ভিত্তিতে গঠিত ও ন্যস্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

মন্ত্রিপরিষদের কার্য

[দায়িত্বশীল সরকার ও মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব—রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ—পার্লামেণ্টের সদস্যগণের মধ্য হইতে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়—মন্ত্রিপরিষদ ও পার্লামেণ্ট]

ভারতীয় সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক ভারতে দায়িত্ব বিশেষ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। পার্লামেণ্টের সদস্যদিগের মধ্য হইতে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হয়। রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে বিরাজ করেন ও প্রকৃত শাসনক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের উপর বর্তায়। শাসন পরিচালনা, আইন প্রণয়ন, সরকারী আয় ব্যয় ইত্যাদি সকল ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদের সীমাহীন দায়িত্ব পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ সরকারী বিলের খসড়া প্রস্তুত করা ও পার্লামেণ্টে উত্থাপনের উদ্যোগ করা এবং ঐ বিলের পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করা মন্ত্রিপরিষদের কার্যের তালিকাভুক্ত।

মন্ত্রিপরিষদের নিয়োগ ব্যবস্থা ও ক্ষমতার প্রকৃতি

রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত, আইন সংক্রান্ত, অর্থ সংক্রান্ত ও জরুরী ক্ষমতা সংক্রান্ত সকল বিষয়, মন্ত্রিপরিষদের নির্দেশে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মন্ত্রিপরিষদ ও প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, অডিটর জেনারেল প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ পদের নিয়োগ ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রদূত মনোনয়নও মন্ত্রিপরিষদের নির্দেশে হয়। আর্থিক বৎসরের প্রারম্ভে অথবা সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি যে বিবৃতি বা অর্থসংক্রান্ত বিবরণ বা আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করেন তাহা মন্ত্রিপরিষদ প্রস্তুত করে। মন্ত্রিসভার পরামর্শে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের হস্তে ক্রীড়নকের ন্যায় কার্য করিতে দ্বিধা করেন না। যেহেতু দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থায় অধিকাংশ আইনসভার সদস্য সমর্থিত মন্ত্রিসভা সকল কার্যের জন্য আইনসভার নিকট প্রত্যক্ষভাবে এবং নির্বাচক মণ্ডলীর নিকট পরোক্ষভাবে দায়ী থাকেন।

রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমে শাসন-কার্য পরিচালনা করে

মন্ত্রিসভার সদস্যদিগের মধ্যে পদমর্যাদা অনুসারে শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রথম পর্যায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী, দ্বিতীয় পর্যায় রাজ্যমন্ত্রী বা ক্যাবিনেট মর্যাদার যোগ্যমন্ত্রী ও তৃতীয় পর্যায় উপমন্ত্রী-গণের সহিত আমাদের পরিচিতি হয়।

শ্রেণীবিভাগ

৭৫ অনুচ্ছেদে লিখিত আছে যে মন্ত্রিপরিষদ ভারতের লোকসভার নিকট ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে দায়ী থাকিবেন। অর্থাৎ লোকসভা অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগ করিতে হয়। কোন বিশেষ মন্ত্রীর বেতন হ্রাস করিলে, অনাস্থা জ্ঞাপন করা হইল বলিয়া বিবেচিত হয়।

লোকসভা ও মন্ত্রিপরিষদ

মন্ত্রিসভার সদস্যদিগের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তর বণ্টন করা হয়। কল্যাণকর কর্ম, বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা, শিক্ষা ইত্যাদি বিভাগ এক একজন মন্ত্রীর পরিচালনায় নিয়ন্ত্রিত হয়। সামগ্রিকভাবে ক্যাবিনেট এইসকল বিভাগের নীতি নির্ধারণ করে এবং উহা কার্যকরী করিবার প্রয়াস পায়। পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যগণের মধ্য হইতে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় বলিয়া দলীয় প্রথার মাধ্যমে ক্যাবিনেট পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করিবার সুযোগ লাভ করে। কর ধার্য অথবা ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি করিবার অধিকার মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদিগের উপর সমর্পণ করা হইয়াছে। মন্ত্রিপরিষদের অনুরোধ ও পরামর্শ ক্রমেই রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স জারি করেন।

সদস্যদিগের ভিন্ন ভিন্ন দপ্তর সম্পর্কে দায়িত্ব

পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনগুলি কার্যকর করা ও প্রয়োগ ব্যবস্থার তদারক করা মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম কর্তব্য। শাসন কার্য পরিচালনা প্রসঙ্গে যে ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন প্রয়োজন বলিয়া স্থির হইবে সেই ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করা মন্ত্রিপরিষদের কর্তব্য। যুদ্ধ, শান্তি চুক্তি সম্পাদন, বৈদেশিক নীতি ও সকল কিছুর নীতি নির্ধারণ মন্ত্রিপরিষদের কর্তব্য। অবশ্য বর্তমানে শাসনব্যবস্থার জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রিসভার সদস্যদিগের সকল ব্যাপার তদারক করিবার সুযোগ থাকে না, ফলে স্থায়ী বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদিগের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং ফলে আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

পার্লামেণ্টের আইন কার্যকর করা মন্ত্রিপরিষদের কর্তব্য

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মত মন্ত্রিপরিষদ আইনগত ভাবে রাষ্ট্রপতির কার্যের জন্য দায়ী থাকেন না। ৭৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে আইন বা আদেশগুলিতে রাষ্ট্রপতির পক্ষে দস্তখত করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি যথাবিহিত আইন করিয়া পদস্থ কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত করিতে পারেন। তাহাছাড়া ৩০০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের নামে অনুষ্ঠিত কার্যের বা আইনের জন্য যথাক্রমে ভারত সরকার বা রাজ্যসরকার দায়ী থাকিবেন।

মন্ত্রিপরিষদ ও পার্লামেণ্ট

শাসনবিভাগ ও আইন-বিভাগের মধ্যে সেতু হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ

পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রি-পরিষদের সহিত আইন সভার অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্য পার্লামেণ্টের সদস্য

মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ সকলেই পার্লামেণ্টের সদস্য। পার্লামেণ্টের সদস্যগণের মধ্য হইতেই মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। সকল মন্ত্রী পার্লামেণ্টের যে কোন পরিষদে উপস্থিত থাকিতে পারেন ও বক্তৃতা করিতে পারেন। মন্ত্রিগণ যে পরিষদের সদস্য সেই পরিষদের ভোট গ্রহণ কালে ভোট প্রদান করিতেও সক্ষম।

বিল উপস্থাপন সংক্রান্ত ক্ষমতা

প্রয়োজন মত বিলের খসড়া প্রস্তুত করিয়া পার্লামেণ্টে উহা উপস্থাপিত করা মন্ত্রীদিগের অন্যতম কর্তব্য। পার্লামেণ্টে উপস্থিত কালে মন্ত্রিগণ সদস্যদিগের নানা প্রশ্নের উত্তর দান করেন। মন্ত্রিগণের উদ্যোগে যে সকল বিল উত্থাপিত হয় তাহা পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যদিগের সমর্থনের জন্য পাস হইতে বিশেষ বাধার সম্মুখীন হয় না।

পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী

ভারতীয় মন্ত্রিপরিষদ সংবিধানগতভাবে পার্লামেণ্টের নিকট যৌথভাবে দায়ী (৭৫ অনুচ্ছেদ)। পার্লামেণ্ট যদি মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন তাহা হইলে মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগে বাধ্য হয়। বস্তুতঃ এই পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রি-পরিষদ পার্লামেণ্টের সৃষ্টি ও পার্লামেণ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে পার্লামেণ্টকে ওয়াকিবহাল রাখা মন্ত্রিপরিষদের বিশেষ কর্তব্য।

বর্তমানে দলীয় নিয়মানুবর্তিতার জন্য মন্ত্রিপরিষদই পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যদিগের আস্থাভাজন ব্যক্তির সমন্বয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধান মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হন। ফলে পার্লামেণ্ট মন্ত্রিপরিষদের সকল কার্যই অনুমোদন করিবে ইহাই স্বাভাবিক।

দলীয় নিয়মানুবর্তিতা

পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে কোন কর ধার্য বা আদায় বা সরকারী ব্যয় পরিচালনা করা বা অর্থমঞ্জুর করা বা অর্থসংক্রান্ত কোন নীতি কার্যকর করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও মন্ত্রিপরিষদই পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্রপতির বিনা অনুমোদন বা সুপারিশে অর্থসংক্রান্ত কোন বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হইতে পারে না। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমে পরিচালিত হয়। কতকগুলি এমন সরকারী ব্যয় আছে যাহা পরিবর্তন বা প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টকে অর্পণ করা হয় নাই। এতদ্ব্যতীত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত পার্লামেণ্টে প্রত্যাখ্যাত হইবে, ইহা অসম্ভব।

অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ও পার্লামেণ্ট

উপসংহারে স্বীকার করিতে হইবে যে বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর, মুলতুবী প্রস্তাব বা অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবের মাধ্যমে পার্লামেণ্ট কতক পরিমাণে মন্ত্রিপরিষদকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রধান মন্ত্রী (The Prime Minister)

[নিয়োগ ব্যবস্থা—মন্ত্রিপরিষদের নেতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ও তাহার গুরুত্ব]

ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন ও প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন বলিয়া স্থির করা আছে। "The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister."

নিয়োগের ব্যবস্থা

দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থায় ও পার্লামেণ্টারী প্রথায় প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রি-পরিষদের নেতা হিসাবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। পার্লামেণ্টারী প্রথায় একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসকের প্রয়োজন অনুভব করা যায়, কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীই সর্বেসর্বা হিসাবে বিরাজ করেন।

মন্ত্রিপরিষদের নেতা

লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হয়। ভারতে পার্লামেণ্টের যে কোন পরিষদ হইতে প্রধান মন্ত্রী পদপ্রার্থী হওয়া সম্ভব।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা

সংবিধানের ৭৮নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে শাসন বিষয়ক ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের দায়িত্ব প্রধান মন্ত্রীর উপর সমর্পিত হইয়াছে। "It shall be the duty of the Prime Minister to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union."

প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি

প্রধান মন্ত্রীই মন্ত্রিপরিষদের নেতা ও নিয়ন্ত্রক। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ-ক্রমে ও ইচ্ছানুসারে ক্যাবিনেট সভার তথা মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি হস্তক্ষেপ করেন না।

ক্যাবিনেট সভার নিয়ন্ত্রক

প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের যে কোন সদস্যকে পদত্যাগে বাধ্য করিতে

পারেন ও ইচ্ছানুসারে যে কোন ব্যক্তিকে শূন্যস্থানে বসাইতে পারেন।

প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রি-পরিষদের সদস্যের মধ্যে সম্পর্ক

প্রধান মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রিপরিষদের কোন সদস্যের মতবিরোধ উপস্থিত হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে মন্ত্রিসভা পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা কিছুমাত্র সংকুচিত হয় না। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করিলে মন্ত্রিপরিষদের পতন সূচিত হয় অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্যকে পদত্যাগ করিতে হয়। সূর্যকে আবর্তন করিয়া যেমন গ্রহ উপগ্রহ অবস্থান করে সেই প্রকারে প্রধান মন্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য মন্ত্রীগণ অবস্থান করে। প্রধান মন্ত্রীর সাহায্যেই মন্ত্রিপরিষদের যৌথ দায়িত্ব বলবৎ করা সম্ভব হইয়াছে। ডঃ আম্বেদকারের মতে, "In my opinion collective responsibility is enforeced by the enforcement of two principles. one principle is that no person shall be nominated to the Cabinet except on the advice of the Prime Minister. Secondly, no person shall be retained as a member of the Cabinet if the Prime Minister says that he shall be dismissed."

সহযোগিতার নীতি

অন্যান্য মন্ত্রিগণের সহিত যুক্তভাবে প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি নির্ধারণ করেন। প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিগণের মধ্যে অবশ্যই প্রভু ভৃত্য সম্পর্ক গঠিত হয় নাই, উপরন্তু প্রধান মন্ত্রীর সহিত অন্য মন্ত্রিগণ সহযোগিতার বন্ধনে একই আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে আবদ্ধ।

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে সেতু প্রধানমন্ত্রী

মন্ত্রিপরিষদ ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে প্রধান মন্ত্রী যোগসূত্র স্বরূপ। সরকার পক্ষের অন্যতম মুখপাত্র ও বক্তা হিসাবে প্রধান মন্ত্রী বিশেষ সম্মানিত। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাকে কেন্দ্র করিয়া দল শক্তি ও প্রতিপত্তি লাভ করে। প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তার মাধ্যমে দলের জনপ্রিয়তা নির্ধারিত হয়।

দলীয় ঐক্য রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব

পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে দলীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার দায়িত্ব প্রধান মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। প্রধানতঃ প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যাস জারি করেন বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন ও ক্যাবিনেট-অনুসৃত সকল নীতির জন্য সাময়িকভাবে ও সাধারণভাবে তিনিই দায়ী থাকেন।

ক্যাবিনেট সভার সভাপতি

শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, শাসন-কুশলতা প্রভৃতি ব্যক্তিগত গুণাবলীর উপর প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি নির্ভরশীল।

ব্যক্তিগত গুণাবলী

চতুর্দশ অধ্যায়

পার্লামেণ্ট (The Parliament)

[পার্লামেণ্টের গঠন, সদস্যগণের অধিকার, পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ও কার্য—উভয় পরিষদের সম্পর্ক—স্পীকার—]

পার্লামেণ্টের স্বরূপ

স্বাধীন ভারতের পার্লামেণ্ট সকলপ্রকার বন্ধনমুক্ত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। কোন বিদেশী শাসকের কর্তৃত্ব ইহাকে পঙ্গু করিতে পারে না, পার্লামেণ্টের আইন দেশের প্রতিটি নরনারী ও অনুষ্ঠানের উপর সমভাবে প্রযোজ্য, কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারে না। এমনকি পার্লামেণ্ট বিশেষ সংখ্যাধিক্যে সংবিধান সংশোধন করিতে পারে ও আন্তর্জাতিক চুক্তিপালনের জন্য দেশের কোন অংশ বিদেশী সরকারকে প্রদান করিতে পারে। এই সকল দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতের পার্লামেণ্ট স্বাধীন, বন্ধনমুক্ত ও সর্বশক্তিশালী।

তবে বিপরীতবাদীদের মতে ভারতের পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা সীমিত এবং বিচারালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ভারতের শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federation), সেইজন্য পার্লামেণ্ট সাধারণতঃ রাজ্যতালিকা-অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। তাহা ছাড়া পার্লামেণ্ট যদি মৌলিক

অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ করিয়া আইন প্রণয়ন করে তবে সেই সকল আইন বিচারপতিগণ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ভারতের পার্লামেণ্ট আংশিক ভাবে স্বয়ং প্রধান ও আংশিক ভাবে কর্তৃত্বাধীন।

পার্লামেণ্টের গঠন

রাষ্ট্রপতি ও দুইটি পরিষদ, যথা রাজ্যসভা এবং লোকসভা লইয়া পার্লামেণ্ট গঠিত। ৫০০র অনধিক সদস্য লইয়া লোকসভা গঠিত হইবে। রাজ্যগুলি হইতে প্রাপ্তবয়স্কদিগের ভোটের মাধ্যমে পার্লামেণ্টের সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। নির্বাচনের সুবিধার জন্য রাজ্যগুলিকে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হইবে, যাহাতে প্রতি ৫ লক্ষ জনগণের জন্য একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত না হয়। তপশীল জাতি ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে না। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিনিধিগণ ঐ রাজ্যের বিধান সভার সুপারিশে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং অনধিক ২০ জন আঞ্চলিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারেন। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে প্রয়োজন জ্ঞানে রাষ্ট্রপতি দুইজন সদস্য মনোনীত করিতে পারেন।

উচ্চতন পরিষদ

পার্লামেণ্টের উচ্চতন পরিষদ রাজ্যসভারূপে অভিহিত। মোট ২৫০ জন সদস্য লইয়া রাজ্যসভা গঠিত হয়। ঐ সদস্য সংখ্যার মধ্যে ১২ জন চারুকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজসেবা প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ ও গুণী ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। অবশিষ্ট ২০৮ জন সদস্য রাজ্য বা ইউনিয়নের প্রতিনিধি। রাজ্যের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক এক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়। পার্লামেণ্টের আইন অনুসারে ইউনিয়ন অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হয়। রাজ্যসভায়ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বণ্টন করা হয়।

নিম্নতন পরিষদ

লোকসভার কার্যকাল ৫ বৎসর বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। রাজ্যসভা একটি স্থায়ী পরিষদ। প্রতি দুই বৎসর অন্তর ⅓ অংশ সদস্য রাজ্যসভা হইতে পদত্যাগ করেন। লোকসভা কার্যকালের পূর্বে রাষ্ট্রপতি ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। অপর দিকে জরুরী অবস্থা বিবেচনায় রাষ্ট্রপতি লোকসভার কার্যকাল বৃদ্ধিও করিয়া দিতে সমর্থ হয়।

রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের যে কোন পরিষদের পৃথক অধিবেশন বা উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুসারে পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত বা ভংগ হইতে পারে। প্রধানমন্ত্রী, তথা মন্ত্রিপরিষদের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি এই কার্যগুলি প্রতিপালন করেন।

যুক্ত অধিবেশন

পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে হইলে সদস্যপদ প্রার্থীকে অন্ততঃ ৩০ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে (রাজ্যসভার জন্য) এবং লোকসভার সদস্য পদে নির্বাচিত হইবার জন্য প্রার্থী ২৫ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই।

সদস্যপদের যোগ্যতা

সরকারী চাকুরেকে আইনগতভাবে পার্লামেণ্টের সদস্যপদ প্রার্থী হইতে দেওয়া হয় না। বিকৃতমস্তিষ্ক দেউলিয়া বা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ কোন ব্যক্তির পক্ষে পার্লামেণ্টের সদস্যপদ প্রার্থী হওয়া সম্ভব নহে। অবশ্য মন্ত্রিগণকে সরকারী চাকুরেরূপে গণ্য করা হয় না।

সদস্যপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আইন

পার্লামেণ্টের উভয় পারিষদ কতিপয় সুযোগ সুবিধা লাভ করে। ব্যক্তিগতভাবে সদস্যগণ কতকগুলি সুযোগ ভোগ করেন এবং যৌথভাবেও সদস্যগণ কতিপয় সুযোগ ভোগ করিতে সমর্থ হন।

ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধা

সংবিধানের অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে পার্লামেণ্টে বিশদভাবে আইন প্রণয়নের পূর্বে ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্যগণ পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে বাক্-স্বাধীনতা এবং বিবরণী প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করিবে এবং তদ্ভিন্ন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হাউস অব কমন্সের সদস্যগণ যে যে সুবিধা ভোগ করেন তাহা সবই ভোগ করিতে পারিবেন। ঐ সকল সুযোগ সুবিধা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে।

ব্যক্তিগতভাবে আদালতে আটক না থাকার, সাক্ষ্যদান হইতে বিরত থাকার ও বাক্স্বাধীনতার সুবিধা সুযোগ সদস্যগণ ভোগ করেন। পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে সদস্যগণের বাক্স্বাধীনতার অধিকার অটুট রাখা হইয়াছে। পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে কিছু বলিবার জন্য অথবা ভোট প্রদানের জন্য কোন সদস্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না।

যৌথভাবে বা সামগ্রিকভাবে পার্লামেণ্ট কতিপয় সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পার্লামেণ্টের কার্যের বা বিতর্কের বিবরণ প্রকাশ করিবার, পার্লামেণ্টের আভ্যন্তরীণ আইন শৃংখলা রক্ষা করিবার নিয়মকানুন ভংগ করিবার অপরাধে শাস্তিপ্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে পার্লামেণ্ট যৌথভাবে সুবিধা ভোগ করে।

যৌথ সুযোগ-সুবিধা

নিবর্তনমূলক আটক আইনের বলে বন্দী হইলে পার্লামেণ্টের সদস্যগণ কোন সুবিধাই ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না। পার্লামেণ্টের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশ করিলে উক্ত পত্রিকার সম্পাদককে তিরস্কার করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে। সম্প্রতি ব্লিৎস পত্রিকার সম্পাদককে নতমস্তকে পার্লামেণ্টে আসিয়া স্পীকারের নিকট হইতে তিরস্কার ভোগ করিতে হয়। পার্লামেণ্টের অধিবেশনে আগন্তুকদিগের আসা যাওয়ার উপর বাধা নিষেধ আরোপ করা সম্ভব। ভারতীয় পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে অধিকার সম্পর্কিত কমিটি আছে (Privilege committee)। এই কমিটি অধিকার ভংগের প্রশ্নের অনুসন্ধান করিয়া যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান করে।

পার্লামেণ্টের কার্য

পার্লামেণ্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব হইল আইন প্রণয়ন। ইউনিয়ন তালিকা ও যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের উপর পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে সক্ষম। আইন বিভাগীয় কার্যাদি সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য। আইন বিভাগের গুরুত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া বিচারক স্টোরী (Story) বলেন যে প্রত্যেক স্বাধীন সরকারের আইন বিভাগের ক্ষমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আইন সংক্রান্ত কার্য

"The legislative power is the great and overruling power in every free Government."

পার্লামেণ্টের প্রকাশ্য মত, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ উভয়ের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখে। "In general······the powers both of executive and judiciary find their limits in the declared will of the legislative organ."

পার্লামেণ্টের মধ্যে রাষ্ট্রের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ লাভ সম্ভব হয়। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ ও মন্ত্রিগণ আইনের খসড়া প্রণয়ন করেন ও আইনের প্রতিটি অনুশাসন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং আইন অনুমোদন করেন। আইনগত বিষয়গুলির বিশদ বিশ্লেষণের জন্য কয়েকটি কমিটির উপর আইনসভা দায়িত্ব অর্পণ করেন। আইন সংশোধন করিবার ক্ষমতাও পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা

পার্লামেণ্টের সদস্যদিগের মধ্য হইতেই মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। পার্লামেণ্টই মন্ত্রিপরিষদকে নিয়ন্ত্রিত করে। মন্ত্রিগণ একক ও যৌথভাবে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকে। পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্য অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব পেশ করিলে মন্ত্রি-পরিষদকে পদত্যাগ করিতে হয়।

অর্থসংক্রান্ত কার্য

পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রের অর্থসংক্রান্ত কার্য নির্বাহ করে। অর্থসংক্রান্ত আইনের খসড়া প্রস্তুত, আলোচনা এবং অর্থসংক্রান্ত আইন অনুমোদনের দায়িত্ব আইনসভার। সরকারের আয়ের উৎস, পরিমাণ ও বিভিন্ন খাতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইবে তাহার অনুমোদন পার্লামেণ্ট করে। পার্লামেণ্টের বিনা অনুমোদনে কর ধার্য বা কর আদায় সম্ভব নহে।

রাষ্ট্রপতির সম্মতি ও বিল

পার্লামেণ্ট বিল পাস করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রদান করিলে অর্থ-সংক্রান্ত: বিল ব্যতীত অপর সকল বিল রাষ্ট্রপতি পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠাইতে পারেন। ঐ বিল পার্লা-মেণ্টের উভয় পরিষদ পুনরায় পাস করিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদানে বাধ্য হন। পার্লামেণ্ট বিতর্ক, মুলতুবী প্রস্তাব, অনাস্থা-জ্ঞাপক ভোট ইত্যাদির সাহায্যে সরকারকে সংযত করিয়া থাকে।

পার্লামেণ্টের বিল পাসের পদ্ধতি

মন্ত্রিগণ ব্যতীত সাধারণ কোন সদস্য বিল উত্থাপনের অনুমতি চাহিলে এক মাসের নোটিশ দিতে হয়। বিলটি উত্থাপিত হইবার পর গেজেটে প্রকাশিত হয়। মন্ত্রিগণ বিল উত্থাপন করিলে সরকারী বিল সরাসরি গেজেটে প্রকাশিত হয়।

বিল উত্থাপিত হইবার পর পরিষদে বিলটির বিচার বিবেচনা হইতে পারে বা বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা যাইতে পারে অথবা জনগণের মতামত জানিবার জন্য প্রচারিত হইতে পারে।

ইহার পর দ্বিতীয় পাঠ পর্যায়ে বিলটির নীতি ও সাধারণ ধারাগুলি সম্পর্কে আলোচনা চলে ও বিলটি প্রয়োজন মত সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা সম্ভব। সিলেক্ট কমিটিতে বিলটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার চলে ও প্রয়োজনে সংশোধন সাধিত হয়।

কমিটির রিপোর্ট ও সংশোধিত বিল গেজেটে প্রকাশ করা হয় ও ইহার পর বিচার বিবেচনার জন্য বিলটি গৃহীত হইলে বিলটির বিভিন্ন অনুচ্ছেদ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা চলে ও ভোট গ্রহণ করা হয়।

ইহার পর তৃতীয় পাঠ পর্যায় বিলটির সামগ্রিক মূল্যায়ন হয় ও সামগ্রিকভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা হয়। এক পরিষদে এই স্তরগুলি অতিক্রান্ত হইবার পর পাস হইয়া অপর পরিষদে অনুরূপভাবে বিলটিকে পাস করিতে হয়।

অর্থসংক্রান্ত কার্য

এপ্রিল মাসের ১লা তারিখে নূতন আর্থিক বৎসর (Financial year) শুরু হয়। আর্থিক বৎসরের প্রারম্ভেই রাষ্ট্রপতি সরকারী আয় ব্যয় ও বাৎসরিক অর্থ বিবরণী পাঠ করেন। কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিল হইতে ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিল হইতে অপর যে সকল ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয় তাহা দুইভাগে প্রদর্শিত হয়। সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় পার্লামেণ্টের বাৎসরিক অনুমোদন সাপেক্ষ নহে (Non-votable expenditure)। অবশ্য এই সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে আলোচনা চলিতে পারে। সঞ্চিত তহবিল হইতে অন্যান্য যে ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয় তাহা লোকসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্যসভার কোন অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। এই ব্যয় মঞ্জুরীর জন্য আলোচনা ও ভোট গ্রহণ করা হয়।

লোকসভার ব্যয় মঞ্জুরীর দাবী অনুমোদিত হইলে যথাসম্ভব শীঘ্র বিনিয়োগ আইনের (Appropriation Act) সাহায্যে কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ লইবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

লোকসভার বাজেট আলোচনা ও বিনিয়োগ আইন পাস হইতে সময় লাগে। ইতিমধ্যে গণনানুদান (Votes on account) দ্বারা লোকসভা সরকারকে অর্থব্যয়ের ক্ষমতা প্রদান করে।

চলতি বৎসরে মঞ্জুরীকৃত অর্থ অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে বা নূতন ব্যাপারে ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে অনুপূরক ব্যয়ের দাবি জানান হয় (supplementary demands)। সরকারী আয় ব্যয়, পার্লামেণ্ট ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক (The Comptroller and Auditor General), সরকারী গণিতিক কমিটি (The Public Accounts Committee) এবং আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি (Estimates Committee) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে।

অর্থসংক্রান্ত কোন বিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা সম্ভব হয় না। লোকসভায় অনুমোদনের পর অর্থ বিলটির মর্মার্থ রাজ্যসভায় পেশ করা হয়। রাজ্যসভা কিছু সংশোধন করিতে পারে তবে সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করা না করা লোকসভার ইচ্ছাধীন। লোকসভা প্রত্যায়নাদান (Votes on credit) ও ব্যতিক্রমনুদান (exceptional grants) ধার্য করিতে পারে।

স্পীকারের ক্ষমতা ও মর্যাদা

আইনসভার সদস্যদিগের মধ্য হইতে একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করা হয়। লোকসভায় এবং রাজ্য বিধান সভায় স্পীকার নির্বাচন করা হয়। স্পীকার লোকসভার অধিবেশনকালে সভাপতিত্ব করেন। লোকসভার কার্যকালের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্পীকারের কার্যকাল নির্দিষ্ট হয়।

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

অবশ্য পদত্যাগ করিবার ফলে অথবা লোকসভার সদস্যপদ হারাইবার জন্য বা অপসারণজনিত কারণে স্পীকারের কার্যকালের মেয়াদ হ্রাস পাইতে পারে। লোকসভার অধিকাংশ

পদত্যাগ ও অপসারণ

সদস্যের সমর্থনে স্পীকার অপসারিত হইতে পারেন। এইভাবে পদচ্যুত করিতে হইলে ১৪ দিনের নোটিশ জারি করিতে হয়।

নিরপেক্ষতা

ব্রিটেনের স্পীকারের ন্যায় ভারতীয় লোকসভার স্পীকার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া দলাদলির উর্ধ্বে থাকিবার প্রয়াস পান। ভারত সরকারের সঞ্চিত তহবিল হইতে স্পীকারের বেতন ধার্য করা হয়।

সভার নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা

স্পীকারের অবর্তমানে ডেপুটি স্পীকার সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে পারেন। সভার কার্য পরিচালনা, আলোচনা নিয়ন্ত্রণ করা, বিতর্কের গতি ও ধারা নিয়ন্ত্রণ করা এবং সভায় নিয়ম শৃংখলা বজায় রাখা স্পীকারের কর্তব্য।

ভোট গ্রহণ

বিতর্কমূলক বিষয় আলোচনাকালে স্পীকার ভোট গ্রহণ করিতে পারেন এবং উক্ত বিষয়ে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমসংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইলে স্পীকার নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদান করিতে পারেন।

লোকসভার নিয়ম-কানুনের ব্যাখ্যাকর্তা

বিভিন্ন দলের সদস্যদিগের বিভিন্ন বিষয় মতামত প্রকাশের সুযোগ-সুবিধা স্পীকার প্রদান করেন। লোকসভার নিয়মকানুন ব্যাখ্যা নির্ধারণ ও প্রয়োগ করা স্পীকারের অন্যতম দায়িত্ব। স্পীকার কোন বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন না বা কোন দলের হইয়া বক্তৃতা বা ওকালতি করেন না।

প্রশ্নোত্তর

স্পীকার প্রশ্নোত্তরের সময় নির্ধারণ করেন ও মুলতুবী প্রস্তাব আলোচনার যোগ্য কিনা তাহা বিবেচনা করেন। বিল উত্থাপনের নির্দেশ স্পীকারই দান করেন। আলোচনা কালে বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করা হইলে তাহার মীমাংসা স্পীকার করেন। বক্তৃতার সময়ও বক্তা নির্ধারণ করা স্পীকারের কর্তব্য। পরিষদের নেতার সহিত আলোচনা করিয়া স্পীকার সভার কার্যক্রম স্থির করেন।

সভার কার্য স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা

সভার শৃংখলা রক্ষার জন্য সদস্যদিগের উত্তেজনা হইতে বিরত করা বা তিরস্কার করা ও প্রয়োজনে বহিষ্কার করাও স্পীকারের কার্যের এক্তিয়ারভুক্ত। সভায় বিশৃংখলা চরম অবস্থায় উঠিলে তিনি সাময়িকভাবে সভার কার্য স্থগিত রাখিতে

সক্ষম হন। কোন বিল, অর্থ বিল কিনা তাহা স্পীকার নির্ধারণ করেন।

সম্প্রতি ভারতের লোকসভার স্পীকার হাইকোর্টের ন্যায় বিচারকার্য পরিচালনা করেন। ব্লিৎস পত্রিকার সম্পাদক লোকসভার এক সদস্যের নামে অসৌজন্যমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিলে স্পীকার উক্ত পত্রিকার সম্পাদককে লোকসভায় তলব করেন ও তিরস্কার করেন।

হাইকোর্টের ন্যায় কার্যভার পরিচালনা

সদস্যগণ তাঁহাদের অধিকার ও সুবিধা সংরক্ষণের জন্য স্পীকারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্পীকার আশ্রয়দান করিলে অনেকক্ষেত্রে গুরুতর অপরাধে অপরাধী সদস্যদিগের কেশাগ্র স্পর্শ করা শাসনবিভাগের পক্ষে অসম্ভব হয়।

সদস্যগণের অধিকার সংরক্ষণ

স্পীকার পদপ্রার্থী ব্যক্তিকে চতুর, বিচক্ষণ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইতে হয়। সাধারণতঃ স্পীকারের চরিত্রের উপর ও ব্যক্তিগত গুণরাজির উপর বিরোধীদলের সদস্যগণের তাঁর নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মে।

ব্যক্তিত্ব

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাজ্যসমূহের শাসনব্যবস্থা

[রাজ্যপাল –তাঁহার কাষ ও গুরুত্ব –রাজ্যসমূহের ব্যবস্থাবিভাগ]

রাজ্যসমূহের শাসনব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় সরকার বা ইউনিয়ন সরকার যেরূপ রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদ লইয়া শাসনবিভাগ গঠন করিয়াছে অনুরূপভাবে পার্লামেণ্টারী কাঠামোতে ও দায়িত্বশীল সরকারের ব্যবস্থায় রাজ্যপাল ও মন্ত্রিপরিষদ লইয়া রাজ্যের শাসনবিভাগ গঠিত।

রাজ্যপাল (Governor)

সংবিধানের ১৫৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। প্রথা ও রীতিনীতি অনুসারে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি

রাজ্যপাল নিয়োগ করিয়া থাকেন। ৩৫ বা ততোধিক বয়স্ক যে কোন ভারতীয় নাগরিক রাজ্যপাল পদপ্রার্থী হইতে পারেন। প্রার্থীকে বেতনভোগী সকল কার্য পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং রাজ্যপাল পদে নির্বাচনের পর পার্লামেণ্ট বা রাজ্যবিধান সভার সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সাধারণতঃ ৫ বৎসরের জন্য, রাজ্যপাল নিযুক্ত হন কিন্তু কার্যকালের পূর্বেই পদত্যাগের মাধ্যমে বা অপসারণের দ্বারা রাজ্যপাল পদ হইতে তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করান সম্ভব। যে কোন সময় রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে পদচ্যুত করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর রাজ্যপাল কায়েম থাকেন। সাধারণত দেশদ্রোহিতা, ঘুষ গ্রহণ ইত্যাদি জঘন্য কর্মের জন্য রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে পদচ্যুত করেন।

রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালও নিয়মতান্ত্রিক শাসক। মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ ও উপদেশ মতই সর্ব অবস্থাতে রাজ্যপালকে কার্য করিতে হয়। যদিও সংবিধানের কোন সূত্রে রাজ্যপালকে মন্ত্রীদের উপদেশ অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য করা হয় নাই, তবুও গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল সরকারের ভিত্তিতে গঠিত সংবিধানে, রাজ্যপাল মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করিয়া পারেন না— পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম সুনীলকুমার বসু, মামলায় বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী এইরূপ মন্তব্য করেন।

দলের মন্ত্রিগণ তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী পর্যায়ভুক্ত কিনা এই বিষয়ে কলিকাতা হাইকোর্ট সম্রাট বনাম ধীরেন্দ্রনাথ সেন ও সম্রাট বনাম হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই তুইটি মামলায় রায় দেন যে মন্ত্রিগণ ঐ পর্যায়ে পড়েন না। প্রিভিকাউন্সিল পরবর্তীকালে সম্রাট বনাম শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মামলায় কলিকাতা হাইকোর্টের রায় নাকচ করিয়া মত প্রকাশ করেন যে মন্ত্রিগণ কর্মচারী পর্যায়ভুক্ত এবং মন্ত্রীদের সম্বন্ধে কেহ কটু মন্তব্য করিলে তাহাকে দেশদ্রোহিতা অপরাধে অভিযুক্ত হইতে পারে।

সংবিধানের ১৫৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যপাল রাজ্যের শাসনবিভাগ পরিচালনা করিবেন। রাজ্যপাল স্বয়ং অথবা তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিবৃন্দ রাজ্যের নানাবিধ শাসনকার্য পরিচালনা করিবে। রাজ্যপালের নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। রাজ্যপাল সকল মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং মন্ত্রিগণ রাজ্যপালের ইচ্ছানুসারে ঐ পদে কায়েম থাকেন। অবশ্য

মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব আছে আইনসভার নিকট। রাজ্যপাল কূটনৈতিক সামরিক অথবা জরুরী ইত্যাদি কোন ক্ষমতার অধিকারী নহেন। তিনি কতিপয় আইনবিভাগীয় ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা উপভোগ করিয়া থাকেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ন্যায় বর্তমানে রাজ্যপালের কোন বিশেষ দায়িত্ব ক্ষমতা (powers in individual judgement) অথবা নিজ ইচ্ছার ক্ষমতা (powers in discretion) নাই। তবে আসাম রাজ্যের রাজ্যপাল উপজাতি এলাকার শাসনকার্য পরিচালনায় ও খনিজ সম্পত্তির মুনাফা বিতরণে রাষ্ট্রপতির প্রতিভূ হিসাবে নিজ ইচ্ছায় (powers in his discretion) কাজ করিবেন। সপ্তম সংশোধন আইনের ফলে ৩৭১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্ধ্র প্রদেশ ও পাঞ্জাব রাজ্যের রাজ্যপাল-স্থানীয় কমিটির পরিচালনায় ও বোম্বাই রাজ্যের রাজ্যপাল কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্বে (special responsibility) কাজ করিবেন। রাজ্যপালের শাসনগত, আইনগত, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষমতা পর্যালোচনা করিয়া অবশ্য অনেকে এই মত প্রকাশ করেন যে রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে প্রভূত ক্ষমতাশালী দেশশাসক হইতে পারেন ও মন্ত্রীদের মত অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন।

কিন্তু সেইরূপ করিলে সংবিধানের লিখিত আইনে রাজ্যপাল অপরাধী না হইলেও সংবিধানের মূল নীতি ব্যর্থ হইবে, কারণ যৌথ দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা ব্যতীত রাজ্যপালের শাসনকার্য ব্যাহত ও অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

পার্লামেণ্টের সহিত রাষ্ট্রপতি যেমন অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত অনুরূপভাবে রাজ্যপালও রাজ্য বিধানসভার সহিত জড়িত। রাজ্যপাল বিধানসভারই অংশ হিসাবে বিদ্যমান। সাধারণ নির্বাচনের পর তিনি বিধানসভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে পারেন ও রাজ্যসরকারের নীতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রয়োজনমত বাণী প্রেরণ করিতে সক্ষম। রাজ্যপাল বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান. স্থগিত ও ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব ও আর্থিক নীতি সম্পর্কিত বিবরণ রাজ্যপাল বিধানসভায় পেশ করেন। অর্থবিল বিধানসভায় উত্থাপিত হইবার পূর্বে রাজ্যপালের সুপারিশের প্রয়োজন হয়।

বিধানসভায় পাস হইয়া বিলটি আইনে পরিণত হইবার জন্য রাজ্যপালের সম্মতির জন্য রাজ্যপালের নিকট প্রেরিত হয়। রাজ্যপাল সম্মতি প্রদান করিলে বিলটি তৎক্ষণাৎ আইনে পরিণত হয়। রাজ্যপাল সম্মতিদানে অসম্মত হইলে বিলটি আইন হিসাবে প্রচলিত হইতে পারে না। অর্থ সংক্রান্ত বিল ব্যতীত অন্যান্য বিল রাজ্যপাল পুনর্বিবেচনার জন্য বিধান সভায় ফেরৎ পাঠাইতে সক্ষম। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপাল সম্মতিদানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির মত জানিতে পারেন। রাজ্যের অর্থবিল সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদানও করিতে পারেন বা সমর্থন জানাইতে অসমর্থ হইতেও পারেন। অন্যান্য বিল সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ বিধানসভার পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠান।

২১৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যপাল রাজ্যের অভ্যন্তরে অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারেন। অবশ্য বিধানসভার অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন সময়ে এইরূপ অর্ডিন্যান্স জারি করা সম্ভব। এই ক্ষমতা রাজ্যপাল স্বয়ং প্রয়োগ করেন না। মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল এই ধরণের অর্ডিন্যান্স জারি করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির বিনা অনুমোদনে রাজ্যপাল অর্ডিন্যান্স জারি করিতে অপারগ।

দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থায় রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বিশেষ সংকুচিত হইয়াছে এবং সর্বদাই রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদের উপদেশ ও পরামর্শমত কার্য করেন। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে নিযুক্ত রাজ্যপালের কতিপয় স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা রহিয়াছে।

অনেক ক্ষেত্রে রাজ্যপাল দণ্ডিত অপরাধীর দণ্ডের মেয়াদ হ্রাস বা মকুব করিতে পারেন। হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করিবার সময় রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের মতামত গ্রহণ করেন।

মন্ত্রিপরিষদ

ইউনিয়নের ন্যায় রাজ্যগুলিতে ভারতীয় সংবিধান অনুসারে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তিত হইয়াছে। দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থায় ও পার্লামেণ্টারী প্রথায় একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা থাকেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদই শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

রাজ্যপালকে পরামর্শদান ও সহায়তা করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক রাজ্যে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। মন্ত্রিপরিষদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকেই রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিয়োগ করিয়া থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে আইন ও শাসন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে ওয়াকিবহাল রাখেন। রাজ্যপালের ইচ্ছানুসারে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের সভায় আলোচনা করেন।

মন্ত্রিসভার সদস্যগণ বিধানসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন, এবং বিধানসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকেন। অর্থাৎ বিধানসভা অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব পাস করিলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। মুখ্যমন্ত্রীর সহিত কোন মন্ত্রীর মতবিরোধ উপস্থিত হইলে বিরোধী মন্ত্রী পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন ও মন্ত্রিসভা পূর্ববৎ কাজ করিতে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে সামগ্রিকভাবে মন্ত্রিসভার অবসান ঘটে। রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন বা পুনরায় নির্বাচনের আদেশ প্রদান করিতে সক্ষম। কিন্তু দলীয় নিয়মানুবর্তিতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করিয়া কার্য করিতে সাহসী হন না। ঐ দলীয় নিয়মানুবর্তিতার জন্যই বর্তমানে বিধানসভা মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রিত না করিয়া মন্ত্রিসভাই বিধানসভাকে নিয়ন্ত্রিত করে বলা যায়।

রাজ্যসমূহের ব্যবস্থাবিভাগ

রাজ্যের বিধানসভাগুলি রাজ্যপাল এবং দুইটি অথবা একটি পরিষদ লইয়া গঠিত। পশ্চিম বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পাঞ্জাব রাজ্যের ব্যবস্থা বিভাগ দুইটি পরিষদ, যথা বিধান পরিষদ ও বিধানসভা লইয়া গঠিত। অন্ধ্র, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, এবং উড়িষ্যাতে একটি পরিষদ লইয়া ব্যবস্থা বিভাগ গঠিত। মহীশূর রাজ্যেও দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থা বিভাগ প্রবর্তিত হইয়াছে।

রাজ্য বিধানসভা

প্রাপ্তবয়স্ক নির্বাচকদিগের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্য বিধান-সভার সদস্যগণ নির্বাচিত হন। বিধানসভার সদস্যগণকে নির্বাচিত করিবার জন্য রাজ্যগুলিকে এমনভাবে কতকগুলি নিবাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়, যাহাতে প্রতি ৭৫০০০ জন সংখ্যার জন্য একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত না হয়। বিধানসভার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ৫০০ ও ৬০ জন নির্ধারিত হইয়াছে।

৫ বৎসরের জন্য বিধানসভা গঠন করা হইয়াছে, অবশ্য এই ৫ বৎসর কার্যকাল সমাপ্ত হইবার পূর্বেই রাজ্যপাল বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। আবার, রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতাবলে বিধান সভার কাযকাল কিছু পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে।

সংবিধানের ১৬১ অনুচ্ছেদ অনুসারে ভারত সরকারের কোন বিভাগের বেতনভোগী চাকুরের পক্ষে রাজ্য বিধানসভা বা পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। অবশ্য রাজ্যমন্ত্রিগণ এই পর্যায়ভুক্ত নহেন। দ্বিতীয়তঃ বিকৃত-মস্তিষ্ক কোন ব্যক্তি এই সদস্যপদে বহাল থাকিতে অসমর্থ। তৃতীয়তঃ দেউলিয়া ব্যক্তির পক্ষে বিধানসভা বা পরিষদের সদস্যপদে আসীন থাকা নিষিদ্ধ। চতুর্থতঃ বিধানসভার সদস্যপদ গ্রহণ করিতে হইলে ভারতের নাগরিক ও ভারতের প্রতি আনুগত্য স্বীকারে স্বীকৃত হইতে হইবে।

সদস্যদিগের যথোপযুক্ত গুণাবলী আছে কিনা সে বিষয় বিচারের ভার রাজ্যপাল ও নির্বাচনী কমিশনের উপর অর্পণ করা হইয়াছে।

রাজ্যপাল উপযুক্ত বিবেচনা করিলে এবং প্রতিনিধিত্ব অপর্যাপ্ত বিচারে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় হইতে সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। তপশীলী, ও উপজাতীয় অঞ্চলের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে।

বিধানসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করা হয়। সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব ভিন্ন সভার নিয়ম শৃংখলা বজায় রাখা তাঁহার কতব্য।

রাজ্য বিধানপরিষদ :—বিধানপরিষদের সদস্য সংখ্যা ৪০-এর কম অথবা রাজ্য বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যার ১/৩ অংশের অধিক হইতে পারে না। বিধানপরিষদ বিধানসভার ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে এই

আশংকায় সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখা হইয়াছে। সদস্যগণের এক অংশ নির্বাচিত হইবেন এবং অপর অংশ মনোনয়নের ভিত্তিতে বিধানসভায় প্রেরিত হইবেন।

পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান যথা জিলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। এক দ্বাদশাংশ সদস্য তিন বৎসরের স্থায়ী স্নাতকদিগের দ্বারা ও অপর এক দ্বাদশাংশ শিক্ষকগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। বিধান সভার সদস্যগণ এক তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত করেন। অবশিষ্ট সদস্যগণকে রাজ্যপাল ললিত কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে গুণী ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে মনোনয়ন দান করেন।

বিধানপরিষদ একটি স্থায়ী পরিষদ। প্রতি দুই বৎসর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্য পদত্যাগ করে। এই সদস্যপদ গ্রহণের জন্য অন্ততঃ ৩০ বৎসর বয়স হওয়া প্রয়োজন। বিধানপরিষদের সদস্যগণ একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি নির্বাচিত করেন।

অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিধানপরিষদের কোন ক্ষমতা স্বীকার করা হয় নাই। বিধানপরিষদে কোন অর্থ সংক্রান্ত বিল উত্থাপন করা যায় না। বিধানসভা কর্তৃক প্রেরিত অর্থ বিল ১৪ দিনের মধ্যে বিধানপরিষদকে ফেরৎ পাঠাইতে হয়। বিধানপরিষদের সম্মতিতে হউক বা বিনা সম্মতিতে হউক রাজ্যপালের অনুমোদন লাভ করিলে ঐ বিল আইনে পরিণত হয়।

অর্থসংক্রান্ত বিল ব্যতীত অন্যান্য বিল প্রসঙ্গে দেখা যায় বিধানসভা কর্তৃক প্রেরিত বিল বিধানপরিষদ তিন মাসের মধ্যে ফেরত না পাঠাইলে বা প্রত্যাখ্যান করিলে বিধানসভা পুনর্বিবেচনা করিতে পারে বা নাও করিতে পারে। বিধানসভা বিধানপরিষদের সংশোধন প্রস্তাব বা প্রত্যাখ্যানের যুক্তির সহিত একমত না হইলে বিলটি দ্বিতীয়বার পাস করিতে পারে। এমতাবস্থায় এক মাসের মধ্যে বিলটি গৃহীত হইয়া আইনে পরিণত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

এইভাবে বিধানপরিষদকে বিধানসভার সহিত অধীনতামূলক সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ করা হয়।

রাজ্যের আইনসভা—আইনসভা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মধ্যে যে কোন এলাকার জন্য ও সামগ্রিকভাবে রাজ্যের জন্য যে কোন আইন প্রণয়ন

করিবার ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বা যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির সম্পর্কে রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়নে সক্ষম। অবশ্য পার্লামেণ্ট কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার আইন-সংক্রান্ত ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে এবং যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে দেখা গিয়াছে রাজ্য ও ইউনিয়ন সরকারের মধ্যে ক্ষমতাগত সংঘাত উপস্থিত হইলে ইউনিয়ন সরকারের প্রতিপত্তিই স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রিকতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপাল সম্মতিদানের জন্য বিধানসভা বা পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য ধরিয়া রাখেন, রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে বিলটি নাকচ করিয়া দিতে পারেন।

রাজ্যপাল, স্পীকার, পরিষদের সভাপতি, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ প্রভৃতির বেতন ও ভাতা রাজ্যের "সঞ্চিত তহবিলের" উপর ধার্য হয় (charge on the consolidated fund of the State)।

অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপার বিধানসভার অনুমোদন সাপেক্ষ। বিধানসভাই রাজ্যে কর ধার্য ও আদায় ব্যাপারে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্যপালের বিনা সুপারিশে বিধানসভা কোন ব্যয় বরাদ্দ করিতে অসমর্থ।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য রাজ্যের সহিত সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকিলেও এই রাজ্যে কতক পরিমাণে স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা সংযোজিত হইয়াছে। এই রাজ্যের শাসক সদর-ই-রিয়াসৎ রূপে পরিচিত। সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে এই রাজ্যের সরকারের বিনা পরামর্শে ভারতের ইউনিয়ন সরকার জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে না।

ষোড়শ অধ্যায়

বিচার ব্যবস্থা

[বিচার বিভাগ—সুপ্রীম কোর্ট—হাইকোর্ট—নিম্ন আদালত—ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিভাগ]

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকত্ব অথবা দ্বৈত বিচারব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। কেন্দ্রীয় বিচারব্যবস্থা ও রাজ্যসরকারের বিচারব্যবস্থায় কোন সংবিধানগত প্রভেদ সৃষ্টি করা হয় নাই। রাজ্য ও ইউনিয়ন একই আদালত ও বিচারব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হয়। সকল আদালতগুলির শীর্ষে সুপ্রীম কোর্টের অবস্থান। সুপ্রীম কোর্টের নিম্নে বিভিন্ন রাজ্যে হাইকোর্ট ও হাইকোর্টের নিম্নে অধস্তন আদালতসমূহের অবস্থান।

সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট

জিলা ও দায়রা জজের কোর্ট	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত	প্রেসিডেন্সী স্মল কজেস কোর্ট

দায়রা আদালত ও অন্যান্য নিম্ন আদালত সমূহে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগ বর্তমান।

সুপ্রীম কোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের বিশেষ গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য বা আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন পরিলক্ষিত হয়। এই বণ্টন জনিত সমস্যা ও ক্ষমতার এলাকা নির্ধারণ ইত্যাদির জন্য বিচার বিভাগীয় মধ্যস্থতার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাহাছাড়া শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা কল্পে এবং মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য বিচার বিভাগের গুরুত্ব প্রত্যেকটি যুক্ত-রাষ্ট্রেই সম্যকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

১২৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে ভারতে একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক

অপর সাতজন বিচারপতি লইয়া এক সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে। ১৯৫৬ সালের পার্লামেণ্ট প্রণীত এক আইন অনুসারে বিচারপতিদিগের সংখ্যা হয় প্রধান বিচারপতি ব্যতীত আরও দশজন। ১৯৬০ সালের এক সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে বিচারপতিদিগের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩জন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ ও অন্যান্য রাজ্যসমূহের হাইকোর্টের বিচারপতিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি বিচারপতি নিয়োগ করেন। ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক বিচারপতি কার্য সম্পাদনে সক্ষম। অবশ্য মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বে তিনি পদত্যাগ করিতে পারেন অথবা প্রমাণিত অসদাচরণের বা অযোগ্যতার অপরাধে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অপসারিত হইতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি পদপ্রার্থীকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রার্থীকে পাঁচ বৎসরের জন্য হাইকোর্টের বিচারপতি বা দশ বৎসর-কাল এ্যাডভোকেট অথবা রাষ্ট্রপতির মতে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হইতে হইবে। বিচারপতিগণ কার্যগ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতি সমীপে শপথ গ্রহণ করেন।

সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতি ভারতের কোন আদালতে আইন ব্যবসায়ে কখনও লিপ্ত থাকিতে পারেন না। দ্বিতীয় তপশীলে বিচারপতি-দিগের বেতন ভাতা ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দেশ দান করা হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ মাসিক যথাক্রমে পাঁচ হাজার ও চারি হাজার টাকা বেতন লাভ করিতে সমর্থ। কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিল হইতে বিচারপতিগণের বেতন দান করা হয়।

১২৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়া ও হাই-কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগ করিতে পারেন। ১৩০ অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট দিল্লীতে অবস্থিত হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচার-পতিগণ যাহাতে নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচার করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহাদের বেতন ও ভাতা consolidated fund হইতে নির্দিষ্ট এবং তাঁহাদের নিযুক্ত হইবার পর কোনও ক্রমেই তাহা হ্রাস প্রাপ্ত করা যায় না। তাহাছাড়া বিচারপতিগণের সম্বন্ধে কোনওরূপ আলোচনা আইনসভায় নিষিদ্ধ। বিচারপতিগণ অবসর গ্রহণের পর সেই আদালতে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারেন না।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্য

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট প্রধানতঃ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য পালন করে, যথা—(১) কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন যথাযথ বহাল রাখিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ভারসাম্য বহাল রাখে। (২) শাসনতন্ত্রে সংবিধানের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকাররূপে পরিগণিত হইয়া সংবিধানকে রক্ষা করে ও মৌলিক অধিকারগুলিকে যথাযথ বলবৎ রাখে। (৩) শ্রেষ্ঠ আপীল আদালতরূপে সুপ্রীম কোর্ট ভারতের সকল প্রকার বিচার বিভাগের শীর্ষস্থানে অবস্থিত।

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের চারি প্রকারের এলাকা আছে, যথা মূল এলাকা (Original jurisdiction), আপীল এলাকা (Appellate jurisdiction), পরামর্শদান এলাকা (Advisory jurisdiction), নির্দেশ, আদেশ বা লেখ বাহির করিবার এলাকা (constitutional writ, jurisdiction to issue directions, orders or writ)। এতদ্ব্যতীত ভারতের সুপ্রীম কোর্ট অভিযোগ আদালত (Court of record) রূপে পরিচিত। সুপ্রীম কোর্ট সম্পর্কে স্যার আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার বলেন যে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট বিশ্বের যে কোন সুপ্রীম কোর্ট অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী। "The Supreme Court in the Indian Union has more powers than any Supreme Court in any part of the world."

(১) **মূল এলাকাঃ**—বৈধ অধিকারের প্রশ্ন জড়িত আছে এমন কোন বিবাদ যদি ভারত সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে বাধে অথবা ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য একপক্ষে ও এক বা একাধিক রাজ্য অন্যপক্ষে এমন সংঘাতের যদি সৃষ্টি হয় অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে উহার বিচার একমাত্র সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকাতে অনুষ্ঠিত হইবে। অবশ্য সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকারপত্র, সনদ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিবাদের বিচার প্রধান ধর্মাধিকরণে হইতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত কোন গত্যন্তর নাই। অবশ্য সুপ্রীম কোর্ট তাহার পরামর্শদান এলাকায় এই সকল বিচারের যথাযথ পরামর্শ দান করিতে পারেন।

(২) **আপীল এলাকা ঃ**– ভারতের অন্তর্ভুক্ত যে কোন হাইকোর্টের রায় বা ডিক্রীর বিরুদ্ধে চার প্রকারের আপীল করা যাইতে পারে। যথা— (ক) সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আপীল, (খ) দেওয়ানী মামলার বিরুদ্ধে আপীল, (গ) ফৌজদারী আপীল এবং (ঘ) অন্যান্য আপীল

(ক) ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে হাইকোর্ট কোন মামলায় যদি এই মর্মে প্রমাণপত্র (certificate) দেয় যে মামলাটির সহিত সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে, তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্টে আপীল আনয়ন করা যায়। সুপ্রীম কোর্ট যদি স্থির করে যে, কোন মামলার সহিত সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে, তাহা হইলে বিশেষ অনুমতি (special leave) প্রদানের সাহায্যে আপীলের অনুমতি দিতে পারে।

(খ) কোন দেওয়ানী মামলায় যদি হাইকোর্ট এই মর্মে প্রমাণপত্র প্রদান করে যে মামলাটির মূল্য (value) বা মামলায় বর্ণিত সম্পত্তির মূল্য বিশসহস্র টাকার কম নহে তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্টে ঐ মামলার বিরুদ্ধে আপীল আনয়ন সম্ভব। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যদি হাইকোর্ট অথবা সুপ্রীম কোর্ট মনে করে যে কোন মামলা গুরুত্বপূর্ণ এবং সুপ্রীম কোর্টে আপীলের যোগ্য তাহা হইলে সেই মামলার আপীলও সুপ্রীম কোর্টে হইবে। তবে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে যদি কোন হাইকোর্ট নিম্নের কোন বিচারালয়ের রায় বহাল রাখে তবে তাহার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিতে হইলে কোন গুরুত্বপূর্ণ আইনের ব্যাখ্যা নিহিত আছে, এই মর্মে হাইকোর্টের প্রমাণপত্র প্রদান করিতে হইবে।

(গ) ফৌজদারী মামলায় যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট কোন দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ নাকচ করিয়া দিয়া মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে অথবা যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট নিম্ন আদালত হইতে মামলা অপসারণ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে অথবা মামলাটি আপীলযোগ্য বলিয়া যেক্ষেত্রে হাইকোর্ট প্রমাণপত্র প্রদান করে, সেই সকল ক্ষেত্রে মামলাগুলি সুপ্রীমকোর্টের নিকট আপীলযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা ছাড়া যদি অন্য কোন কারণে হাইকোর্ট বা সুপ্রীমকোর্ট মনে করে যে বিশেষ কারণে

ফৌজদারী: আপীলটি সুপ্রীমকোর্টে গ্রহণীয় ও আপীলযোগ্য তবে সেই বিচারটি সম্পর্কে সুপ্রীমকোর্টে আপীল করা চলিতে পারে।

পার্লামেণ্ট সুপ্রীমকোর্টকে ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করিতে পারে।

সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীমকোর্ট স্বীয় বিবেচনায় ভারতের অন্তর্গত সকলপ্রকার বিচারালয় বা ট্রাইবুন্যালের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিবার বিশেষ অনুমতি প্রদান করিতে পারে। অবশ্য সামরিক আদালত বা ট্রাইবুনালের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রয়োগ সম্ভব নহে।

পরামর্শ দান এলাকা :—আইন সংক্রান্ত বা কোন তথ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ করিয়া সংবিধানের ব্যাখ্যা ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীমকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। সুপ্রীমকোর্ট ঐ সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে তাহাদের মতামত ও পরামর্শ দান করিতে পারে। অবশ্য সুপ্রীমকোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য নহেন।

আদেশ বা লেখ এলাকা :—ভারতের সুপ্রীমকোর্ট প্রয়োজন মত বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus), পরমাদেশ (Mandamus), প্রতিষেধ (Prohibition), অধিকার পৃচ্ছা (Quo Warranto) এবং উৎপ্রেষণ (Certiorari) ইত্যাদির নির্দেশ আদেশ বা অধিকার বলবৎ করিতে সক্ষম। এই ক্ষমতাগুলি ব্যতীত ভারতের সুপ্রীমকোর্ট নিজ আদেশের পুনর্বিবেচনা করিতে সমর্থ, এবং মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলে বা স্ব স্ব তালিকা বহির্ভূত বিষয়ে আইন পাশ করিলে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা করিয়া সেই সকল আইনকে অবৈধ ঘোষণা করিতে সক্ষম। ভারতের অন্তর্গত সমস্ত আদালত সুপ্রীম কোর্টের নির্দিষ্ট আইনকে মানিয়া চলে। এই হিসাবে সুপ্রীমকোর্ট ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের আদালত এবং একাধারে সর্বোচ্চ আপীল আদালত ও সংবিধানের সংরক্ষক এবং ব্যাখ্যাকার।

রাজ্যের আদালত

ভারতের সংবিধান অনুসারে ভারতের অন্তর্গত প্রতিটি অংগরাজ্যে একটি হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনমত একজন প্রধান বিচারপতি ও অন্য কয়েকজন বিচারপতি নিয়োগ করেন। রাজ্যের রাজ্যপালের সহিত

পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি এই সকল বিচারকগণকে নিয়োগ করেন। সাধারণতঃ বিচারকগণের কার্যকালের মেয়াদ ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত। অবশ্য কার্যকালের মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই অসদাচরণ বা অযোগ্যতা প্রমাণ হইলে পর বিচারপতিগণকে অপসারিত করা সম্ভব। অথবা বিচারপতিগণ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে পারেন।

ভারতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি যে কোন বিচারককে এক হাইকোর্ট হইতে অন্য হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করিতে পারেন। হাইকোর্টের বিচারক পদপ্রার্থীকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে এবং অন্ততঃ দশবৎসর ভারতের বিচার বিভাগের কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে। অথবা দশ বৎসর ধরিয়া হাইকোর্টের Advocate হিসাবে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে হইবে। হাইকোর্টের বিচারকগণ, অবসর গ্রহণ করিবার পরও সেইসকল হাইকোর্ট ব্যতীত অন্য যে কোন হাইকোর্টে বা সুপ্রীমকোর্টে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারিবেন।

হাইকোর্টের বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা কোন ক্রমেই কমান চলিবে না বা তাহা আইনসভার ভোটের উপর নির্ভর করিবে না। তাহাদের বিষয় কোনরূপ আলোচনাও আইনসভায় করা চলিবে না। প্রত্যেক রাজ্যের বিচারবিভাগের শীর্ষস্থানে হাইকোর্ট অবস্থিত।

হাইকোর্টে দেওয়ানী ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলার আপীল আনয়ন করা সম্ভব। অনেক রাজ্যে হাইকোর্টের মূল এলাকাও আছে। হাইকোর্ট সংবিধান সংক্রান্ত যে কোন মৌলিক অধিকার বলবৎ করিবার জন্য বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, উৎপ্রেষণ ও অধিকার পৃচ্ছা প্রভৃতি নির্দেশ দিতে পারেন অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যেও ঐসকল আদেশ বা লেখ বাহির করিতে পারেন। যে সকল ক্ষেত্রে মানুষের কোন আইনগত অধিকার ব্যাহত হয় অথচ তাহা প্রতিকারের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকেনা, সেই সকল ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বহুপ্রকার শাসনতান্ত্রিক আদেশ, নির্দেশ বা লেখ বাহির করিতে পারে। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে হাইকোর্টের যে যে ক্ষমতা ছিল তাহা বর্তমান শাসনতন্ত্রে অব্যাহত আছে। তাহা ছাড়া ভারতের সংবিধানে হাইকোর্টের রাজস্ব বিষয়ক ক্ষমতাও প্রদান করা হইয়াছে যদিও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে হাইকোর্টের রাজস্ববিষয়ক কোন ক্ষমতা ছিল না।

হাইকোর্টের মূল ও আপীল বিভাগ ছাড়া প্রদেশের সকল নিম্নতন আদালতের পরিচালনার ক্ষমতা বর্তমান। নিম্নতন কোন আদালতের বিচারকার্য সুচারুরূপে না হইলে সেই মামলা নিজ আয়ত্তে বিচার করিবার বা যোগ্য কোন আদালতে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা হাইকোর্টের আছে।

নিম্নতন আদালত সমূহের বিচার ব্যবস্থাকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী এই দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। দেওয়ানী বিচারের সর্বনিম্ন আদালত হইল পঞ্চায়েত বা ইউনিয়ন কোর্ট। এক বা একাধিক গ্রামের জন্য সামান্য টাকার দাবী দাওয়ার মীমাংসাকল্পে এইরূপ আদালত গঠিত হয়। এই আদালতের আদেশ প্রয়োজনে মুন্সেফী আদালত বাতিল করিয়া দিতে পারে। বড় বড় নগরেও অল্প টাকার মামলার মীমাংসার জন্য স্মল কজেস কোর্ট আছে। এই আদালতের রায় হাইকোর্ট সংশোধন করিতে পারে।

বিভিন্ন মহকুমায় ও জিলা সহরে মুন্সেফের আদালত আছে। মহকুমা ও জিলার মুন্সেফী আদালতের উপরে সাবজজের আদালতের অবস্থান। এই আদালতে মূল ও আপীল উভয় এলাকাই বর্তমান। সাবজজের আদালতের উপরে জিলা জজের আদালত অবস্থান করে।

দেওয়ানী বিচারের মতই গ্রামাঞ্চলে ছোটখাট ফৌজদারী মামলার বিচার হয় ইউনিয়ন বেঞ্চ বা পঞ্চায়েতে। সহরাঞ্চলে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত সমূহে ফৌজদারী মামলার বিচার অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক জিলায় প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। ক্ষমতা অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ম্যাজিস্ট্রেট পক্ষকে বিভক্ত করা হইয়াছে। জিলায়, জিলা জজই দায়রা জজের কার্য সম্পাদন করে। সহরাঞ্চলে দায়রা জজের পৃথক আদালত অবস্থিত। কলিকাতা প্রভৃতি বৃহৎ সহরে ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটগণ আছেন। দায়রা জজ বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা চলে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হাইকোর্টে জুরীর সহায়তায় ফৌজদারী মামলার বিচার হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

(Local Self-Government)

[স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা কি ? ভূমিকা—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সংগঠন]।

গণতান্ত্রিক চেতনা নাগরিকবৃন্দের মধ্যে সম্প্রসারণের জন্য দেশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া জনসাধারণের পরিচালনায় শাসন করিবার ব্যবস্থা হইলে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা হয়। সমগ্র দেশ কয়েকটি রাজ্য বা প্রদেশে, প্রতিটি প্রদেশ বা রাজ্য কতিপয় জিলায় ও জিলাগুলি মহকুমায় ও মহকুমাগুলি থানায় বিভক্ত হয়।

এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি লাভ করে। গণতন্ত্র অর্থাৎ জনসাধারণের শাসন। দায়িত্বশীল, সচেতন শিক্ষিত জনসাধারণের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভরশীল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া (East India Company) কোম্পানির আমল হইতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলে। ১৬৮৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর রাজার সম্মতিক্রমে কোম্পানী মাদ্রাজে এক পৌরসংঘ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দান করে। পোর্টসমাউথ বারোর (Portsmouth Borough) কাঠামো অনুকরণে এই পৌরসংঘ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা চলে। প্রাথমিক ভাবে একটি টাউন হল, ও একটি স্কুলের পরিচালনার ভার ঐ পৌরসংঘের উপর ন্যস্ত থাকিবে বলিয়া স্থির হয়। ১৬৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাদ্রাজে ঐ পৌরসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু নূতন কর আরোপের জন্য তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় ও ফলে পৌরসংঘের প্রগতি স্তিমিত হয়। ১৭২৬ সালে কলিকাতায় ও বোম্বাইতে পৌর প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। একজন মেয়র ও নয়জন অল্ডারম্যান সমন্বয়ে ঐ পৌরসংঘ গঠিত হয়। নয়জন অল্ডারম্যানের মধ্যে সাতজনই ছিলেন ব্রিটেনের অধিবাসী। ১৭৯৩ সালে প্রেসিডেন্সী সহরগুলিতে পৌরসংস্থা গঠনের পুর্ণোদ্যোগ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ১৮৩৫ সালে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন পাশ হয়। ১৮৪২ সালে বাংলাদেশে নানা অঞ্চলে পৌরসংস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলে।

১৮৪২ সালে মুসৌরীতে ও ১৮৪৫ সালে নৈনিতালে পৌরসংঘ স্থাপিত হয়। লর্ড রিপনের আমলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার ঘটে। জনগণের অধিকার লর্ড রিপন বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। ১৯১৯ সালে মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের শাসন-সংস্কার ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কায়েম হইবার পর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। মণ্টেগুর প্রচেষ্টায় পৌরসংঘের শাসন-ব্যবস্থায় নির্বাচিত সদস্যদিগের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়।

প্রধান পৌর স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠান

পৌরসংঘ (Municipality)

কলিকাতা, বোম্বাই প্রমুখ প্রধান প্রধান সহর ব্যতীত অন্যান্য সহরে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি পৌরসংঘরূপে পরিচিত। কোন পৌরসংঘ বা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য সংখ্যা অর্থাৎ কমিশনারগণের সংখ্যা ৯ এর কম বা ৩ এর অধিক হইতে পারিবে না। পৌরসংঘের সদস্যগণ করদাতাগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। কমিশনারগণ একজন সভাপতি ও এক বা একাধিক সহ-সভাপতি নির্বাচিত করেন। সাধারণতঃ মিউনিসিপ্যালিটির কার্যকালের মেয়াদ ৪ বৎসর ধার্য থাকে। প্রয়োজনবোধে রাজ্য সরকার পৌরসংঘের কার্যকাল ১ বৎসর বৃদ্ধি করিতে সক্ষম। যে সকল পৌরসংঘের বাৎসরিক আয় লক্ষাধিক টাকা সেই সকল পৌরসংঘে সাধারণতঃ একজন কর্মকর্তা বা Executive officer থাকে। প্রয়োজনবোধে পৌরসংঘগুলি স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) নিয়োগ করিতে পারে। পৌরসংঘে সাধারণতঃ স্বাস্থ্যাধিকারিক, স্বাস্থ্য-পরিদর্শক প্রভৃতি থাকেন।

আয় (Income) : কর আদায়, নিজস্ব সম্পত্তি সংরক্ষণ প্রভৃতির আয় হইতে সাধারণতঃ পৌরসংঘের ব্যয় সংকুলান করা হয়। এতদ্ব্যতীত সরকারের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করা যায়। পৌরসংঘগুলি ইচ্ছা করিলে সরকারের অনুমতি লইয়া ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

সাধারণতঃ পৌরসংঘগুলি জল ও আলো সরবরাহের জন্য এবং ময়লা পরিষ্কারের জন্য বাড়ী ও জমির উপর কর ধার্য করে। বিভিন্ন যানবাহনের উপর কর ধার্য করা হয়। জন্তু জানোয়ারদের উপর কর ধার্য করা হয়।

এতদ্ব্যতীত ব্যবসা, বৃত্তি, খেয়া পারাপার ও পুল পারাপার হইবার জন্য কর আদায় করা হয়। পৌরসংঘের নিজস্ব বাজার, ডাক বাংলো বা বিশ্রামাবাস হইতে আয় হয়। সহরের জমি ও বাড়ী প্রভৃতির বাৎসরিক আয়ের উপর একপ্রকার হোল্ডিং রেট বা কর স্থাপন করা হয়।

ব্যয় (Expenditure): রাস্তাঘাট নির্মাণ, সংস্কার, ময়লা নিষ্কাশন ও জল সরবরাহ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও শিক্ষা প্রসারের জন্য অধিকাংশ আয় ব্যয়িত হয়।

কার্যাবলী (Functions): পৌরসংঘগুলি নানা কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। রাস্তাঘাট নির্মাণ, ময়লা নিষ্কাশন, জল সরবরাহ ব্যতীত চিকিৎসালয় স্থাপন, প্রাথমিক চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা, অগ্নিনির্বাপণ, সংক্রামক ব্যাধিনিরোধ প্রমুখ বিবিধ কার্য সম্পাদন করে। পুষ্করিণী খনন ও সংস্কার সাধন, নলকূপ ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা, প্রসূতি সদন, ধাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা, জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা প্রভৃতি পৌরসংঘের অন্যতম দায়িত্ব।

পৌরপ্রতিষ্ঠান (Municipal Corporation)

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রমুখ সকল প্রধান সহরগুলিতে পৌর প্রতিষ্ঠানের অবস্থান আছে। ১৯৫১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে এই প্রতিষ্ঠানের পুরাতন গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া নূতন গঠনতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। ১৯৫২ ও '৫৫ সালে আইনটির কিছু সংশোধন সাধিত হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

কলিকাতা কর্পোরেশন মোট ৮৬ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। তন্মধ্যে ৮০ জন সদস্য ওয়ার্ড সমূহ হইতে নির্বাচিত হন, ৫ জন অল্ডারম্যান আছেন ও নগর উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি পদাধিকার বলে ইহার সদস্য নিযুক্ত হন। কাউন্সিলরগণ ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। রাজ্যসরকারের অনুমোদন ক্রমে ইহার কার্যকাল আরো একবৎসর বৃদ্ধি পাইতে পারে। কাউন্সিলর-গণের মধ্য হইতে একজনকে মেয়র ও একজনকে ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত করা হয়। মেয়র নির্বাচন মোটামুটি দলীয় ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়। মেয়র পদ বিশেষ সম্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ। মেয়রকেই নগরের প্রথম

নাগরিক বলিয়া সম্মানিত করা হয়। রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনার হইলেন কর্পোরেশনের প্রধান কর্মসচিব। বিভিন্ন কাজের সুষ্ঠু নির্বাহের জন্য কয়েকজন সদস্যের সমন্বয়ে এক একটি স্থায়ী কমিটি নিযুক্ত হয়। চার পাঁচটি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে এক একটি বারো গঠিত হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ নির্মাণ, অর্থ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের তদারকের জন্য একজন সভাপতির নেতৃত্বে এক একটি স্থায়ী কমিটি সংগঠিত। মুখ্য কর্মসচিব ব্যতীত বিভিন্ন এলাকায় পৌর কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় তাহার তদারকের জন্য মুখ্য এঞ্জিনিয়ার, মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকার ও আরো অসংখ্য কর্মচারী আছেন। স্কুলফাইনাল বা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কোন ২১ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি কর্পোরেশনের নির্বাচক হইতে সক্ষম। এতদ্ব্যতীত বস্তি অঞ্চলে ৪৲ ভাড়া দেন বা অন্য অঞ্চলে যাহারা ৮৲ টাকা ভাড়া দেন এমন ব্যক্তিও নির্বাচক হইতে পারেন। বর্তমানে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দ্বারা নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান হইয়াছে।

আয় (Income): কর্পোরেশনের ব্যয় সংকুলান হইবার অন্যতম উৎস হইল জমি ও বাড়ীর উপর ধার্য কর। যানবাহন ও গবাদি পশু প্রভৃতির উপর কর, ব্যবসা বৃত্তি ও পেশার উপর ধার্য কর হইতেও কর্পোরেশনের আয় হয়। এতদ্ব্যতীত কর্পোরেশনের নিজস্ব বাজার ও অন্যান্য সম্পত্তি, বিজ্ঞাপনের উপর লাইসেন্স ফী প্রভৃতি হইতে আয় হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকার ধার দেয় ও কর্পোরেশনও রাজ্যসরকারের অনুমোদন ক্রমে ঋণ পাইতে সক্ষম।

ব্যয় (Expenditure): জনকল্যাণকর কার্য, জল সরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশন, পথঘাট সংস্কার ও নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা প্রভৃতির জন্য কর্পোরেশনের আয় ব্যয়িত হয়।

কার্য (Function): পথঘাট সংস্কার ও নির্মাণ কর্পোরেশনের অন্যতম কর্তব্য। রাস্তাগুলির নামকরণ, জল সরবরাহের ব্যবস্থা, ময়লা নিষ্কাশন, পরিস্রুত ও অপরিস্রুত জল সরবরাহ, উদ্যান নির্মাণ ও সংরক্ষণ, রাত্রিকালে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা, বাজারে কসাইখানা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ, নলকূপ খনন প্রভৃতি কর্পোরেশনের অন্যতম কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত। সহরে গৃহ-নির্মাণাদি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য—সংক্রামক

ব্যাধি প্রতিরোধকল্পে প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন, হাসপাতাল নির্মাণ, জন্মমৃত্যুর হিসাব সংরক্ষণ প্রমুখ নানা কার্য কর্পোরেশন করিয়া থাকে। শ্মশান ও গোরস্থান রক্ষণাবেক্ষণ কর্পোরেশনের অন্যতম কার্য। এতদ্ব্যতীত অগ্নিনির্বাপণ, গ্রন্থাগার স্থাপন, সন্তরণের পুল নির্মাণ, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা কর্পোরেশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাদি।

কলিকাতা নগর উন্নয়ন সংস্থা (Calcutta Improvement Trust)

কলিকাতা মহানগরীতে একটি নগর উন্নয়ন সংস্থা বিদ্যমান। একজন সভাপতি সহ দশজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত এই সংস্থা বস্তি ও অনুন্নত অঞ্চল বাসোপযোগী করিতে প্রয়াসী। নগরের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে নব নব রাস্তা নির্মাণ, প্রাসাদোপম গৃহ নির্মাণ এই সংস্থার অন্যতম অবদান। বহু পরিত্যক্ত অনুন্নত অঞ্চল এই সংস্থা সংস্কার করিয়াছে। সহরের খাটাল অপসারণ করিয়া নূতন রাস্তা নির্মাণ ও গৃহাদি নির্মাণ এই সংস্থার কৃতিত্ব।

প্রধান গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান
(Rural Self Government)

গ্রাম্য পঞ্চায়েত (Village Panchayets)

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ভারতে বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ। ব্রিটিশ শাসন কালে ইংরাজী কাঠামো অনুসারে পৌর প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন হয় ও ভারতের ঐতিহ্যবিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অকাল মৃত্যু ঘটে। স্বাধীন ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনর্জীবনের উদ্যোগ চলিতেছে। ১৯৫৬ সালে নূতন পঞ্চায়েত আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

যে অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন কার্যকর হয় সেই অঞ্চলে এক বা একাধিক গ্রামের সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট বিধানসভার নির্বাচকদিগের লইয়া গ্রাম সভা গঠন করা যায়। গ্রাম সভার সদস্যবৃন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করেন। ৯ জনের কম নহে ১৫ জনের বেশী নহে এমন সদস্য সংখ্যা লইয়া গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়। পঞ্চায়েতের সভাপতি ৪ বৎসরের জন্য কার্য করেন। পঞ্চায়েত পানীয় জল সরবরাহ, পথঘাট নির্মাণ স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান ও নানাবিধ গ্রাম উন্নয়নের কার্য করিয়া থাকে। কয়েকটি গ্রাম সভার সমন্বয়ে

অঞ্চল পঞ্চায়েত সংগঠিত হইতে পারে। অঞ্চলের শান্তি শৃংখলা রক্ষা, সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান পঞ্চায়েতের অন্যতম কার্য। ভারতের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যেই জুরী প্রথার বীজ লুকাইয়া ছিল। বর্তমানে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠনের দ্বারা বিচার বিভাগীয় কার্যে পঞ্চায়েতের দায়িত্ব বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস লক্ষণীয়। ন্যায় পঞ্চায়েত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করিতে পারিবে।

ইউনিয়ন বোর্ড (Union Board)

একটি বা একাধিক গ্রামের সমন্বয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকা নির্দিষ্ট হয়। বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৬ এর কম অথবা ৯ এর অধিক হইতে পারে না। সকল সভ্যই বর্তমানে ৪ বৎসরের মেয়াদে নির্বাচিত হন। বার্ষিক ৬ আনা হারে চৌকিদারী কর বা ইউনিয়ন রেট অথবা ৮ আনা হারে সেস দিতে সক্ষম যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচক হইতে পারে। ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিও নির্বাচক হইতে সক্ষম। বোর্ডের সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সভাপতি নির্বাচিত হন।

আয় (Income)—ইউনিয়ন রেট বা চৌকিদারী কর, লাইসেন্স ফী, জরিমানা, খেয়া পারাপার, খোঁয়াড় প্রভৃতি হইতে বোর্ডের আয় হয়। প্রয়োজন বোধে সরকার ও জিলা বোর্ড সাহায্য দান করে। চৌকিদার ও দফাদার প্রমুখ কর্মচারীর বেতনে আয়ের এক মোটা অংশ ব্যয় হইয়া যায়, এতদ্ব্যতীত জনকল্যাণমূলক কার্যেও কিছু কিছু অর্থ ব্যয় হয়।

কার্য (Function)—জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, এলাকার আঞ্চলিক উন্নতি বিধান প্রভৃতির তদারক করা ইউনিয়ন বোর্ডের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামের রাস্তাঘাট সংস্কার ও নির্মাণ, নলকূপ খনন, পুষ্করিণী পরিষ্কার, জল সরবরাহ, টিকা দেওয়া, আবর্জনা নিষ্কাসন ইত্যাদি ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য। অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, খোঁয়াড় নিয়ন্ত্রণ ও আঞ্চলিক শান্তি রক্ষা বোর্ডের কার্য।

জিলা বোর্ড (District Board)

প্রত্যেক জিলায় একটি বোর্ড আছে। ন্যূনপক্ষে ৯ জন সদস্যের সমন্বয়ে এক একটি জিলা বোর্ড সংগঠিত। ইউনিয়ন বোর্ডে নির্বাচকদিগের দ্বারা

৪ বৎসরের জন্য জিলা বোর্ডের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। সভ্যগণের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও এক বা একাধিক সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এঞ্জিনিয়ার, কর্মসচিব, স্বাস্থ্যাধিকারী প্রমুখ স্থায়ী বেতনভোগী কর্মচারিগণ বোর্ডের দ্বারা নিয়োজিত। এই সকল কর্মচারিগণ বোর্ডের দৈনন্দিন কার্য তদারক করে।

আয় (Income)— সেস (Cess) আদায় করিয়া, খোঁয়াড় পরিচালনা করিয়া, জিলা বোর্ডের আয় হয়। পথকর ব্যতীত রাস্তা বা পুলের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া ফেরিঘাট প্রভৃতি হইতেও জিলা বোর্ডের আয় হয়। প্রয়োজন বোধে সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় বা সরকারের অনুমতিক্রমে ঋণ লওয়া হয়।

জনস্বাস্থ্য, পথঘাট নির্মাণ ও কর্মচারিগণের বেতন দানে অধিকাংশ অর্থ ব্যয় হয়। শিক্ষাদান ব্যাপারেও অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে।

কার্য (Function)—জনস্বাস্থ্য, জন-নিরাপত্তা, শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়গুলির তত্ত্বাবধান, পথঘাট নির্মাণ, খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা, চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা, প্রসূতি সদন স্থাপন, জল সরবরাহের ব্যবস্থা, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা, হাট বাজার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি জিলা বোর্ডের অন্যতম দায়িত্ব। কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বা মহামারী উপস্থিত হইলে ঐ অঞ্চলকে খাদ্য, ঔষধ, বস্ত্র ইত্যাদি দিয়া সাহায্য করা বোর্ডের কার্য। বন্যার সময় আহার ও বাসস্থানের সংস্থান করা জিলা বোর্ডের সুমহান কর্তব্য। কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য কখনও কখনও বোর্ড সাহায্য করিয়া থাকে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বেসামরিক কর্মচারিবৃন্দ (Civil Service)

[ইউনিয়ন কর্মচারী, রাজ্য কর্মচারী, শ্রেণীবিভাগ—রাষ্ট্র-ভৃত্য নিয়োগ পরিষদ]

পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা মুখ্যত দেশের শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু কল্যাণ রাষ্ট্রের কার্যাদি, আন্তর্জাতিক ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত প্রভৃতির ফলে যে প্রশাসনিক জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে একদল মন্ত্রীর পক্ষে সকল বিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ব্যতীতই বহু সদস্য মন্ত্রি-সভার অন্তর্ভুক্ত হন। ফলে স্থায়ী বেসামরিক কর্মচারিগণের উপর মন্ত্রিগণকে নির্ভর করিতে হয়।

স্বাধীন ভারতে সর্বভারতীয় চাকুরীর প্রবর্তন করা হইয়াছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। সংবিধানের ৩০৯ অনুচ্ছেদে রাজ্য ও ইউনিয়নকে কর্মচারি গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ৩১৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ সংগঠিত হইয়াছে (Public Service Commission)।

সর্বভারতীয় চাকুরীর মধ্যে ভারতীয় শাসন পরিচালনার চাকুরী (Indian Administrative Service), ভারতীয় পুলিসের চাকুরী (Indian Police Service) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্বভারতীয় বেসামরিক কর্মচারিগণের বেতন ও কার্যের সর্ত ইত্যাদি পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করে। ভারতীয় শাসন পরিচালনার চাকুরীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণদিগের মধ্য হইতে মুখ্য সচিব, সহসচিব, জেলাশাসক প্রভৃতি নিয়োগ করা হয়। বিদেশে স্থাপিত দূতাবাসে কূটনৈতিক সম্বন্ধ পর্যবেক্ষণের জন্য ভারতীয় বৈদেশিক চাকুরীর প্রবর্তন করা হইয়াছে (Indian Foreign Service)।

ইউনিয়নের ন্যায় রাজ্য সরকার শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার অধীনে এই নিয়োগ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। যথা, রাজ্য শাসন পরিচালনার চাকুরী (State Civil Service)।

রাজ্য পুলিস কার্য (Police Service), রাজ্য শিক্ষা কার্য (Education Service) বিচার বিভাগীয় কার্য (Judicial Service)। রাজ্য বিধান সভা কর্মচারিগণের বেতন, কার্যের সর্ত ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে।

রাষ্ট্রভৃত্যগণের শাসনতান্ত্রিক পরিচয়ঃ—ভারতের সংবিধানের চতুর্দশ পর্যায়ে সর্বভারতীয় অথবা রাজ্যসরকারগুলির রাষ্ট্রভৃত্যগণের গঠনপদ্ধতি, দায়িত্ব ও অধিকার সমূহের পর্যালোচনা করা হইয়াছে। সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভৃত্যগণ সকলেই রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে ও তাহাদের স্থায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন হইবে, তবে পার্লামেণ্ট এই বিষয়ে যথোপযুক্ত আইন বিধিবদ্ধ করিয়া এই সকল কর্মচারীদের স্থায়িত্ব ও অন্যান্য নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

রাজ্যসরকারের কর্মচারিগণও রাজ্যপালের কর্তৃত্বাধীনভাবে বিরাজ করিবেন এবং তাঁহাদের স্থায়িত্ব ও রাজ্যপালগণের ইচ্ছাধীন থাকিবে। অবশ্য রাজ্যসরকারের আইনসভাগুলি উপযুক্ত আইন দ্বারা এইসকল রাষ্ট্রভৃত্যগণের চাকুরীর সকলপ্রকার নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন। সংবিধানের ৩১২ ধারা অনুযায়ী রাজ্যসভার দুইতৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যের অনুমোদনক্রমে ভারতীয় পার্লামেণ্ট জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে নূতন সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভৃত্যসংস্থা সৃষ্টি করিতে পারেন, যাহা কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের যুগপৎ সংস্থারূপে পরিগণিত হইবে।

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ন্যায় ভারতের শাসনতন্ত্রেও কেন্দ্র ও রাজ্যের কর্মচারীদের স্থায়িত্ব রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপালের ইচ্ছাধীন থাকায় অনেকে মনে করেন যে এইসকল রাষ্ট্রভৃত্যগণ সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদের বেতন বা পদচ্যুতির কোন অভিযোগ করিতে পারিবে না বা এই সকল দাবী করিয়া কোন মামলা মোকদ্দমা কোন আদালতে রুজু করিতে পারিবে না। প্রিভি কাউন্সিলের রায়ও এই মতকে সমর্থন করে (হাইকমিশনার বনাম লাল)। ভারতবর্ষের নূতন শাসনতন্ত্রে এই বিষয়ের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। নূতন শাসনতন্ত্রে সর্বভারতীয় ও রাজ্যসরকারের কর্মচারিগণকে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। সুপ্রীমকোর্টের বিচার অনুযায়ী এইসকল কর্মচারিবৃন্দ অন্যান্য নাগরিকবৃন্দের ন্যায় সমান অধিকার ভোগ করে এবং তাহাদের বেতন বা অন্যান্য বিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আইনসংগত ব্যবস্থা করিতেও পারে (বিহার সরকার বনাম আবদুল মজিদ)।

সংবিধানের ৩১১ ধারা মতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা কোন নিম্নতন কর্তৃপক্ষ এই সকল কর্মচারীদের বরখাস্ত করিতে পারিবেন না এবং কোনও কারণে তাহাদের কর্মচ্যুতি অথবা চাকুরীর সর্তের কোনওরূপ ক্ষতিকর পরিবর্তন করিতে হইলে তাহাদিগকে কারণ দর্শাইবার উপযুক্ত সুযোগসুবিধা প্রদান করিতে হইবে। অবশ্য কোনওরূপ ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অথবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এইরূপ কারণ দর্শাইবার অধিকার না দেওয়া যাইতে পারে।

সুপ্রীমকোর্ট ও বিভিন্ন হাইকোর্টের বিচারে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এইসকল কর্মচারীর পদচ্যুতি বা পদমর্যাদা হ্রাস করিতে হইলে প্রথমে অভিযোগের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার ও যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করিবার সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে এবং পরে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে শাস্তিপ্রদানের বিরুদ্ধে কারণ দেখাইবার দ্বিতীয়বার সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে ভারতের নূতন সংবিধানে রাষ্ট্রভৃত্যগণ অন্যান্য জনসাধারণ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করেন।

রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ (Public Service Commission)

সংবিধানের ৩১৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে ইউনিয়নে ও প্রত্যেক রাজ্যে একটি রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ গঠিত হইবে। একধিক রাজ্য একত্রে একটি ঐরূপ পরিষদ গঠন করিতে হইবে। ইউনিয়নের পরিষদের সভাপতি ও রাজ্য পরিষদের সভাপতি যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। সদস্যগণ ৬ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। ৬৫ বৎসরের উর্ধ্বে কোন ব্যক্তি সদস্যপদে বহাল থাকিতে অক্ষম। দশ বৎসর সরকারী কার্যে দায়িত্বপূর্ণভাবে বহাল ছিলেন এমন ব্যক্তিগণ দ্বারা সদস্য সংখ্যার অর্ধেক পূরণ করা হয়। সদস্যগণ পদত্যাগে অক্ষম অথবা অসদাচরণের জন্য সদস্যগণকে অপসারিত করা সম্ভব। পরিষদের সভাপতিকে সুপ্রীম কোর্টের সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি অপসারিত করিতে পারেন।

এই পরিষদের পরামর্শক্রমে কর্মচারিবৃন্দ নিয়োজিত হন। বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগের জন্য পরিষদ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছে।

কোন দায়িত্বশীল কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সাধারণতঃ সরকার কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করে। সরকারী কর্মচারীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার দায়িত্ব কমিশন গ্রহণ করে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ভোটদান ব্যবস্থা (Electoral System)

[সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদিগের ভোটাধিকার—তিনটি সাধারণ নির্বাচন—নির্বাচকদিগের সংখ্যা—লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন—নির্বাচন কমিশন]

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য অবদান সকল প্রাপ্তবয়স্কদিগের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি। জাতি ধর্ম বর্ণ স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকল ভারতীয় নাগরিকের ভোটাধিকার আছে। ভারতকে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হইয়াছে। নির্বাচনী এলাকায় বসবাসকারী সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। বিকৃতমস্তিষ্ক বা নির্বাচন ব্যাপারে অসাধু বলিয়া প্রমাণিত কোন ব্যক্তি অবশ্য ভোট দানে অযোগ্য বিবেচিত হইবে। নির্বাচন এলাকায় নির্বাচককে অন্ততঃ ছয় মাস বাস করিতে হইবে। প্রত্যেক আদমসুমারীর পর বিভিন্ন আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা হইতে কতজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন তাহা নির্ধারিত হয়। ১৯৫১ সালের আইনানুসারে প্রায় প্রত্যেক ৬ লক্ষ লোকের জন্য লোকসভার একজন প্রতিনিধি ও প্রত্যেক ৭৫ হাজার লোকের জন্য একজন বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়।

ভারতের অগণিত লোকসংখ্যার জন্য সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করা বিশেষ আয়াসসাধ্য। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ৬০০,০০০,০০০ ব্যালট পত্রের প্রয়োজন হয়। ২,৬০০,০০০ ব্যালট বাক্স ও ১৯৬,০০০ বুথের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। মোট ৯০০,০০০ কর্মচারী নির্বাচনে তদারক করেন। প্রথম নির্বাচনে ১৭৩ মিলিয়ন নির্বাচক ছিল, দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের সময় নির্বাচকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৩ মিলিয়ন। বহু অশিক্ষিত লোককে ভোটের

অধিকার দেওয়ায় ভোটের অপব্যবহার হইবে এই আশংকায় সরকার কর্মচারিগণের সাহায্যে ভোট প্রণালী শিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করেন। প্রার্থিগণকে নিদর্শন (symbol) ব্যবহার করিতে হয় এই সকল অজ্ঞ নির্বাচকদিগের সুবিধার জন্য।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে ঐ রাজ্যের বিধানসভার সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। লোকসভার সদস্যগণ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। ব্যালট প্রথায় প্রত্যক্ষভাবে ভোট গ্রহণ করা হয়।

মনোনীত সদস্যগণ ব্যতীত রাজ্যসভার অন্যান্য সদস্য রাজ্য বিধান-সভাসমূহ হইতে সদস্যগণের এক হস্তান্তরযোগ্য ভোট পদ্ধতির দ্বারা নির্বাচিত হন।

যে রাজ্যে বিধান পরিষদ আছে সেই রাজ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি, স্নাতকগণ ও শিক্ষকগণ পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারেন।

দেশের সমগ্র ভোটদান পদ্ধতি পর্যালোচনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এক নির্বাচনী কমিশন আছে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিবাচিত এই কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য নির্বাচন ব্যাপারে যাহাতে দুর্নীতি বা পক্ষপাতিত্ব না দেখা দেয় তাহার তদারক করেন। নির্বাচন সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার জন্য কমিশন ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারে। নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন কমিশনের কমিশনারের সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি আঞ্চলিক কমিশন গঠন করিতে পারেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করিতে হইলে সুপ্রীম কোর্টের বিচারককে অপসারণ করিতে হইলে যে পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয় সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

ভারতীয় সংবিধানের পঞ্চদশ পর্যায়ে এই বিষয়ে সম্যক আলোচনা করা হইয়াছে। বিকৃতমস্তিষ্ক, গর্হিত অন্যায় কার্যে অভিযুক্ত অথবা ভোটের তালিকায় যাহাদের নাম নাই তাহারা ব্যতীত ভারতের ২১ বৎসর প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ-স্ত্রী সকল নাগরিকই ভোটদানের অধিকারী।

শাসনতন্ত্রের ৩২৯ ধারামতে নির্বাচন সম্বন্ধে কোনওরূপ কলহ উপস্থিত হইলে ইলেকশন ট্রাইব্যুনালে উপযুক্ত দরখাস্ত করিতে হইবে; আদালতে

নির্বাচন আইনের যৌক্তিকতা অথবা অন্যান্য কোন প্রশ্ন বিচার করা হইবে না। অবশ্য ঐরূপ ইলেকশন ট্রাইবুনাল বা নির্বাচনী আদালতের নিরপেক্ষতা অথবা স্বেচ্ছাচারিতা বিষয়ে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে হাই-কোর্টগুলি সংবিধানের ২২৬ ধারামতে তাহা পর্যালোচনা করিতে পারিবেন (রাজকৃষ্ণ বনাম বিনোদ)।

বিংশ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল (Political Parties)

দলীয় প্রচার প্রবর্তন ব্যতীত গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব নহে। ভারতীয় সাধারণতন্ত্র এক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এই শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষের জন্য দলীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। ব্রিটেনের দায়িত্বশীল সরকারের সাফল্যের মূলে দলীয় ব্যবস্থা। অবশ্য ব্রিটেনের ন্যায় ভারতে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় নাই। ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, স্বতন্ত্র দল, কম্যুনিষ্ট দল, প্রজা-সমাজতন্ত্রী ও জনসংঘ দল।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে কংগ্রেসের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ভারতকে পরাধীনতার গ্লানি হইতে মুক্ত করিতে, জাতির মধ্যে নূতন প্রেরণা সঞ্চারে, জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিতে, ভারতবাসীর রাজনৈতিক চরিত্র আরোপে, দেশবিদেশে প্রখ্যাত বলিষ্ঠ কংগ্রেস দলের অবদান অনস্বীকার্য।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রথম সূত্রপাত। সুখজনক বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করা যাইবে যে, ১৮৮৪ সালে লর্ড ডাফরিন ও হিউমের উদ্যোগে গণ-চেতনার উন্মেষকল্পে কংগ্রেসের উৎপত্তি হয়। প্রথমদিকে কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল সরকারী কার্যে অধিকসংখ্যক ভারতবাসী যাহাতে অংশ গ্রহণ

করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। পরবর্তী অধ্যায়ে পৌর অধিকার অর্জনের জন্য কংগ্রেস আন্দোলন চালায়। ক্রমে কংগ্রেস স্বায়ত্তশাসন দাবী করে। সংবিধানসম্মতভাবে, বুঝাপড়ার মধ্য দিয়া কংগ্রেস এই দাবী কার্যকর করিবার প্রয়াস পায়। ১৯২৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ দাবী করে নাই। বংগভংগ আন্দোলনের ফলে রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের প্রেরণায় এ্যানি বেসান্তের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের ফলে ও তিলকের নেতৃত্বের ফলে জাতীয়তাবোধের যে ভাববন্যা বহিয়া যায় তাহাতে কংগ্রেস নূতন ভাবে সঞ্জীবিত হয়। গান্ধীজী, নেতাজী, দেশবন্ধু প্রভৃতির সেবায় ধন্য, কংগ্রেস ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে জাতীয়তা আন্দোলনের প্লাবন বহাইয়া দেয়। মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন ভারতবাসীকে সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করে, মহাত্মাজীর 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব ও নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতবাসীর চরিত্রে বীর্যের সঞ্চার করে।. কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারত ব্রিটিশ শাসনের কবল হইতে মুক্ত হয়।

স্বাধীনতার পর গান্ধীজী বলেন, কংগ্রেসের আদর্শ ও ধর্ম ছিল স্বাধীনতা অর্জন। বর্তমানে পার্লামেণ্টারী যন্ত্ররূপে কংগ্রেসের অবস্থান অপ্রয়োজনীয়। তিনি কংগ্রেসকে লোকসেবক সংস্থায় পরিণত হইবার জন্য আহ্বান জানান, অবশ্য অপরাপর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন নাই। ফলে শাসকশ্রেণীর দলরূপে গত তিনটি সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রকাশ পাইয়াছে। গত তিনটি সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেসের শক্তির পরিচয় বহন করে। সমগ্র ভারতে এই এক মাত্র দল বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর রাখিয়াছে ও জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভে সমর্থ হইয়াছে।

অতীতে যে কংগ্রেস জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছে—নব-জাগরণের প্রয়াস পাইয়াছে, বর্তমানে নব ভারত গঠনের দায়িত্ব সেই কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ভারতীয়গণের মধ্যে ভারতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা ও সংবিধান রচনা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক মহৎ অবদানরূপে বিশেষ বন্দিত হইয়াছে। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে, পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার পুনর্গঠনের দ্বারা, সমবায় প্রথার প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা আনয়নের জন্য

কংগ্রেস বর্তমানে চেষ্টিত। স্বাধীন ভারত কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না কিন্তু প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে ইতস্তত: নহে। কোন শিবির বা জোটের না হইয়াও সকলের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিয়া আত্মমর্যাদা সহকারে সহ-অবস্থানের জন্য ভারত চেষ্টিত। সুমহান দায়িত্ব স্বরূপ, ঐতিহ্যমণ্ডিত কংগ্রেস ভারতের আদর্শ, কৃষ্টি, ধর্ম ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণে তৎপর।

কংগ্রেস ক্ষমতা লাভের পর শ্রীনেহেরু প্রধান মন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। শ্রীনেহেরু ১৯৫০ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হন। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল নেহেরুর সহিত একমত হইতে পারেন নাই। কংগ্রেস সভাপতি পদে নেহেরু-সমর্থিত প্রার্থী আচার্য কৃপালনী নির্বাচিত হইতে অপারগ হন ও প্যাটেলপন্থী পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন সভাপতি নির্বাচিত হন। শ্রীনেহেরু ইহার পর ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ করিতে মনস্থির করেন। শ্রীনেহেরুর এই মনোভাবের ফলে ট্যাণ্ডন সভাপতি পদ ত্যাগ করেন। ইহার পর শ্রীনেহেরু স্বয়ং কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন ও চারি বৎসর ঐ কার্য সম্পাদন করেন।৯ পরে শ্রীনেহেরুর বিশ্বাসভাজন শ্রী ইউ. এন. ডেবর সভাপতি হন। সরকারের কর্ণধার ও কংগ্রেস সভাপতির মধ্যে ইহার ফলে কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে নাই। ইহাতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫ সালে শ্রীনেহেরু কংগ্রেস অধিবেশনে, আবাদী সমাজতন্ত্র, কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করেন।

সংগঠনের দিক দিয়া সর্বোচ্চ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সংস্থাপিত হইয়াছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পরবর্তী স্তরে প্রদেশ কমিটি গঠিত হয়। প্রদেশ কমিটি কয়েকটি তালুক কমিটি বা মহকুমা কমিটিতে ও পরবর্তী স্তরে জিলা কমিটিতে বিভক্ত হইয়াছে। প্রায় ৮০ হাজার সক্রিয় সদস্যের সমন্বয়ে কংগ্রেস গঠিত। ৬০০০০০০ জন প্রাথমিক সদস্য কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত। প্রতি নিষ্ঠাবান কংগ্রেসসেবী খাদি বস্ত্র পরিধান করেন, সকলের জন্য সমান সুযোগ দান করা হোক বলিয়া বিশ্বাস করেন ও অস্পৃশ্যতা বর্জন কাম্য বলিয়া দাবি করেন। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির পরিচালনায় কংগ্রেস নির্বাচন কার্য নির্বাহ করেন।

বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করা যায় যে, জাতীয় আন্দোলনের উদ্গাতা কংগ্রেস, অতীতে স্বাধীন ভারতের রূপরেখা সম্পর্কে কোন ইস্তাহার প্রকাশ করে নাই। ১৯৪৫-৪৬ সালের কেন্দ্রীয় ও প্রদেশের নির্বাচনের সময় এক নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। ঐ ইস্তাহারে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, আঞ্চলিক স্বাধিকার, সর্বজনভিত্তিতে ভোটগ্রহণ, সর্বসম্মতি-ক্রমে যুক্তরাষ্ট্র গঠন ও বলপ্রয়োগ পরিত্যাগ করিবার নীতি ইস্তাহারে স্থান পায়। ঐ ইস্তাহার ১৯৩১ সালের করাচী অধিবেশনের প্রস্তাবের অনুরূপ।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার ৪৮৯টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৩৬২টি আসন লাভ করে। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর ৪৯৪টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৩৬৭টি আসন লাভ করে। এতদ্ব্যতীত সমস্ত রাজ্যে কংগ্রেস জয়লাভ করে। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুলভাবে জয়লাভ করে। গত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভাগুলিতে নিম্নরূপ আসন পায়

পশ্চিম বাংলা ১৫৭, অন্ধ্রপ্রদেশ ১৭৩, আসাম ৭৯, বিহার ১৮৫. গুজরাট ১১৩, মধ্যপ্রদেশ ১৩২, মাদ্রাজ ১৩৮, মহারাষ্ট্র ২১৪, মহীশূর ১৩৯, পাঞ্জাব ৯০, রাজস্থান ৮৮, উত্তরপ্রদেশ ২৪৮।

লোকসভায় কংগ্রেস দল পশ্চিম বাংলা হইতে ২২টি, অন্ধ্রপ্রদেশ হইতে ৩৪টি, আসাম হইতে ৯টি, বিহার হইতে ৩৪টি. গুজরাট হইতে ১৪টি, মধ্যপ্রদেশ হইতে ২৪টি. মাদ্রাজ হইতে ৩১টি, মহারাষ্ট্র হইতে ৩৭টি, মহীশূর হইতে ২৫টি, পাঞ্জাব হইতে ১৩টি, রাজস্থান হইতে ৫টি, উত্তর প্রদেশ হইতে ৫৮টি, কেরালা হইতে ৬টি, উড়িষ্যা হইতে ১১টি, দিল্লী হইতে ৫টি আসন লাভ করে।

ইংরাজ ভারত ত্যাগের অব্যবহিত পরেই ভারতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে ৬০০টি দেশীয় রাজ্য ছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে সকল দেশীয় রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়। এ পর্যন্ত উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাইর হিসাব অনুসারে মোট ৬৭০ কোটি টাকা কংগ্রেস আমলে ব্যয় হইয়াছে। কংগ্রেস শাসনে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধিত হয়।

ভারতের কামউনিষ্ট দল

বলশেভিক আন্দোলন সোবিয়েত রাশিয়ায় সাফল্যমণ্ডিত হইবার পর ১৯২০ সালে ভারতের ভূমিতে সর্বপ্রথম কমিউনিষ্ট আন্দোলন সুরু হয়। লেনিনের সহকর্মী মানবেন্দ্রনাথ রায় ভারতে মার্কস্‌বাদের ভাবধারা প্রচারে প্রয়াসী হন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে হতাশ রাজনীতিবিদ ও কিছু অসন্তুষ্ট বিদ্বানগোষ্ঠী এই আন্দোলনে সাড়া দেন। ১৯২১-২২ সালে শ্রী রায় ভ্যানগার্ড পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৩ সালে ডাঙ্গে "সোশ্যালিষ্ট" পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রাথমিক ক্ষেত্রেও কমিউনিষ্ট দল গঠনের ব্যাপারে ক্ষমতার সুরু হয়। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মানবেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী হন: রাশিয়ায় মানবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা লাভ করার ফলে বীরেন্দ্রনাথ প্রতিযোগিতায় বিশেষ সুবিধালাভ করেন নাই। সোবিয়েত নির্দেশে মানবেন্দ্রনাথ কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশেন্যালের অংশ হিসাবে ভারতের কমিউনিষ্ট দল গঠন করেন। ১৯২৪ সালে কানপুর ষড়যন্ত্রের মামলায় কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ যথা ডাঙ্গে, মুজাফের আমেদ, সৌকৎ উসমানী, নলিনী গুপ্ত প্রভৃতি অভিযুক্ত হন। এই সময়ে ভারতের কমিউনিষ্ট দলের সহিত রাশিয়া সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। পরে স্থির হয়, ভারতীয় কমিউনিষ্টগণের সহিত রাশিয়া লণ্ডনের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করিবে। ঐ সময়ে লণ্ডনে বসবাসী রজনীপাম দত্ত ও তাঁর স্ত্রী ভারতীয় কমিউনিষ্টগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা যোশী ও ফিলিপ স্প্রাট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় যোশী ও বি ভি. ওয়াদী শ্রমিক সংস্থা গঠনে (ট্রেড ইউনিয়ন) প্রয়াসী হন। ১৯২৫-২৬ সালে কমিউনিষ্ট দল শ্রমিক সংস্থাগুলিকে প্রভাবিত করিবার প্রয়াস পায়। ইহার পর ১৯২৯ সালে ৩১শে জুন মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলায় কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ যথা ডাঙ্গে, ফিলিপ স্প্রাট, ব্র্যাডলে, মুজাফর আমেদ, সৌকৎ উসমানি প্রমুখ গ্রেফতার হন। শ্রীজহরলাল নেহেরু ও কৈলাসনাথ কাটজু জাতীয়তার প্রেরণায় দলাদলির উর্ধ্বে যাইয়া আদালতে কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দের সপক্ষে ওকালতি করেন। ১৯৩০ হইতে '৩৫ সাল পর্যন্ত কমিউনিষ্ট দলকে বিশেষ

বিব্রতবোধ করিতে হয়। দলের মধ্যে বিভেদ ও সংঘাত দেখা দেয়। কলিকাতায় মজাফফর আমেদ একটি শাখায়, পি সি যোশী উত্তর ভারত শাখায়, জি. এম অধিকারী বোম্বাই শাখায় নেতৃত্ব করেন। এই সময় মানবেন্দ্রনাথ রায় ও স্তালিনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, ফলে রয় ভারতে চলিয়া আসেন। ১৯৩৪ সালে কাপড়ের মিলে (টেক্সটাইল) নিযুক্ত শ্রমিক-বৃন্দের মধ্যে কমিউনিষ্ট দল অসন্তোষের সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পায়। ফলে ১৪ জন কমিউনিষ্ট বন্দী হন। কমিউনিষ্ট দলের দুর্দশা চরমে ওঠে। ১৯৩৪ সালে সি এস পি দল সংগঠিত হয় ও কমিউনিষ্টগণ কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বলে যে সংবিধান রচিত হয় তাহা কংগ্রেস গ্রহণ করিলে কমিউনিষ্ট দল বিরোধিতা করে ও ঐ সংবিধানকে ক্রীতদাসের সংবিধান (Slave constitution) বলিয়া আখ্যা দেন। ১৯৩৯ সালে সোবিয়েত রাশিয়া জার্মানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে ভারতের কমিউনিষ্ট দল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গুলির প্রতি নিন্দা বর্ষণ করে। পরবর্তীকালে যখন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন তখন ভারতের কমিউনিষ্ট দল ব্রিটেনের পক্ষে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৯৪২ সালে "ভারত ছাড়" আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ১৯৪৬ সালে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের (self-determination) নামে মুশলিম লীগের সহিত একত্রে পাকিস্তানের প্রতি কম্যুনিষ্ট দল সমর্থন জানায়। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর প্রথমদিকে কমিউনিষ্ট দল সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টির প্রয়াস পায়। ১৯৪৮ সালে হায়দ্রাবাদের অন্তর্ভুক্ত তেলেঙ্গনায় এক বিপুল হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর বিংশতম সোবিয়েত পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশনের পর কমিউনিষ্ট দল নীতি পরিবর্তন করে ও পার্লামেন্টারী নীতিতে আস্থা স্থাপনপূর্বক কেরেলা রাজ্যে সরকার গঠন করে। অতীতে কমিউনিষ্ট দলের মুখপাত্র হিসাবে "People's War" ও "জনযুদ্ধ" প্রকাশিত হইত। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় "স্বাধীনতা" পত্রিকা কমিউনিষ্ট দলের মুখপাত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়।

আদর্শ হিসাবে কমিউনিষ্ট দল মার্কসবাদে বিশ্বাসী। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনা কমিউনিষ্ট ও সোবিয়েত কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হওয়ায় তাহার প্রতিফলন ভারতীয় কমিউনিষ্টগণকে স্পর্শ করিয়াছে।

গত সাধারণ ৩টি নির্বাচনে দেখা গিয়াছে ভারতের সমস্ত নির্বাচনী এলাকায় কমিউনিষ্টদল প্রার্থী উপস্থাপনে সক্ষম হন নাই।

তীব্র নিয়মানুবর্তিতা, সংহতি ঐক্য বিশ্বাস, দলীয় আদর্শ সদস্যদিগের অন্যতম রক্ষাকবচ। সামরিক নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োগে উৎসাহী এই দলে আজও দলীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায়, সামরিক বাহিনীতে চালু বিভিন্ন উক্তির সংস্পর্শে আসা যায়। যথা —Headquarters, First line defence, Control Commission প্রভৃতি। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়করণের ভিত্তিতে (Democratic centralism) দলের কাঠামো নির্দিষ্ট হইয়াছে। উপরের সংস্থাগুলির নির্দেশ নীচের সংস্থাগুলি পালন করিতে বাধ্য। দলীয় কাঠামো বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় প্রথমে Cell or Branch গঠিত হয়। ফ্যাক্টরী, গ্রাম বা সহরে পল্লী অঞ্চলে এইরূপ Cell গঠিত হয়। ইহার পরবর্তী পর্যায় সহর বা স্থানীয় অধিবেশন বসে। প্রত্যেক ২ বৎসরে এই অধিবেশন আহ্বান করা হয়। ঐ অধিবেশনে জিলা সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। পরবর্তী পর্যায় জিলা সম্মেলনে প্রাদেশিক অধিবেশনের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় ও প্রাদেশিক অধিবেশনে নিখিল ভারত সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। নিখিল ভারত অধিবেশনে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিট ব্যুরো ও একজন সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়।

যদিও প্রতি ৩ বৎসরে নিখিলভারত পর্যায়ে অধিবেশন আহ্বান করিবার নিয়ম তথাপি এ পর্যন্ত মোট ৫ বার যথা ১৯৪৩-৪৮-৫৩-৫৬ ও ৫৮ সালে এইরূপ অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে। প্রতিমাসে একবার পলিট ব্যুরোর অধিবেশন বসিবার কথা, প্রতি ৩ মাসে অন্ততঃ ১ বার কেন্দ্রীয় কমিটি অধিবেশন বসিবার কথা। দলের সংগঠন কার্যে "Party letter-এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। হেড কোয়ার্টার হইতে "দলীয় চিঠির" মারফৎ সদস্যগণকে নির্দেশ দান করা হয়।

১৯৩৪ সালে কমিউনিষ্ট দলের সদস্য-সংখ্যা ছিল ১৫০, ১৯৪২ সালে ৫ হাজার, ১৯৪৬ সালে ৫৩ হাজার ১৯৪৭ সালে ৬০ হাজার, ১৯৪৮ সালে ৮৯২৬৩, ১৯৫০ সালে ২০ হাজার, ১৯৫২ সালে ৩০ হাজার, ১৯৫৭ সালে ১ লক্ষ ২৫ হাজার সদস্য ছিল। লক্ষ্য করা যায় যে ১৯৫০ সালে সদস্য সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পায়।

গত সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবাংলা, কেরালা প্রমুখ দুই একটি রাজ্য ব্যতিরেকে কমিউনিষ্ট দল সমগ্র ভারতে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে নাই। রাজ্যগুলিতে কমিউনিষ্ট দল নিম্নরূপ সাফল্য লাভ করে।

পশ্চিম বাংলায় ৫০টি, অন্ধ্রপ্রদেশে ৫১টি, বিহারে ১২ টি, মধ্যপ্রদেশে ১টি, মাদ্রাজে ২টি, মহারাষ্ট্রে ৬টি, মহীশূরে ৩টি, পাঞ্জাবে ১টি, রাজস্থানে ৫টি, উত্তর প্রদেশে ১৪টি কমিউনিষ্ট দল আসন লাভ করে।

লোকসভার নির্বাচনে কমিউনিষ্ট দল পশ্চিম বাংলায় ৯টি, অন্ধ্রপ্রদেশে ৭টি, বিহারে ১টি, মাদ্রাজে ২টি, উত্তর প্রদেশে ২টি, কেরালায় ৬টি, ত্রিপুরায় ২টি আসন লাভ করে।

প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল

কংগ্রেস সোস্তালিষ্ট দল ও কৃষক প্রজা মজদুর দলের সমন্বয়ে প্রজা সমাজতন্ত্রী দল গঠিত হয়। আচার্য কৃপালনী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, অশোক মেটা ও শ্রী লোহিয়া একত্রে কার্য করিতে সম্মত হন। কংগ্রেস সোস্তালিষ্ট দলের সদস্যবৃন্দ মার্কস্‌বাদে বিশ্বাসী ও কৃষক মজ র দলের সদস্যগণ কংগ্রেস আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। পরস্পর বিরোধী দুই আদর্শের সমন্বয়ে গঠিত হয় প্রজা সমাজতন্ত্রী দল। পক্ষান্তরে মার্কসবাদ গান্ধীবাদের মিলনের প্রয়াস করা হয়। এইরূপ আপাতবিরোধী আদর্শের সমন্বয়ের ফলে দলীয় সংহতি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গণতান্ত্রিক ভারতের পক্ষে গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের বিরোধী দলরূপে উত্থান বিশেষ কাম্য।

প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বা Democratic Socialism এ বিশ্বাস করে ও সকল শিল্পের জাতীয়করণ দাবী করে। ব্রিটেনের শ্রমিক দলের সহিত এই দলের আদর্শগত ঐক্য লক্ষণীয়। সর্বোদয়ের ভিত্তিতে বর্ণহীন, শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন এই দলের লক্ষ্য। সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা এই দল বিশেষভাবে অনুভব করে। সমগ্র মূলধনের সামাজিককরণ (socialization) এই দলের লক্ষ্য। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় ১৯ জন সদস্য নির্বাচিত হয়। দ্বিতীয় নির্বাচনের পূর্বে ডাঃ লোহিয়ার সমর্থকবৃন্দ প্রজা সমাজতন্ত্রী দল পরিত্যাগ

করিয়া যায়। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে সরকারী কর্মচারীদের এক আন্দোলন সাফল্য লাভ করিতে না পারা নির্বাচনে এই দলের স্বনামধন্য নেতৃবৃন্দ পরাজিত হইবার বিশেষ কারণ।.

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে, রাজ্যগুলির নির্বাচনে প্রজা সমাজতন্ত্রী দল পশ্চিমবাংলায় ৫টি, আসামে ৬টি, বিহারে ২৯টি, গুজরাটে ৭টি, মধ্যপ্রদেশে ৩৩টি, মহারাষ্ট্রে ৯টি, মহীশূরে ২০টি, রাজস্থানে ২টি ও উত্তর প্রদেশে ৩৮টি আসন লাভ করে।

লোকসভার নির্বাচনে আসাম হইতে ২টি, বিহার গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা হইতে ১টী করিয়া ও উত্তর প্রদেশ হইতে ২টি আসন লাভ করে।

জনসংঘ (Jansangha)

১৯৫১ সালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জনসংঘ দল গঠিত হয়। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর ফলে জনসংঘ দল হিসাবে কতকটা দুর্বল হইয়া পড়ে। বাধা বিপত্তি সত্বেও জনসংঘ সর্বভারতীয় দল হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। হিন্দু মহাসভার আদর্শে বিশ্বাসী বহু নেতৃবৃন্দ জনসংঘে যোগদান করিয়াছে। সীমান্ত বিরোধ সংক্রান্ত ব্যাপারে আপোষ আবেদন বা অনুরোধে জনসংঘ বিশ্বাস করেনা। গত সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় উত্তর প্রদেশ হইতে ৭ জন ও পাঞ্জাব হইতে ৩ জন জনসংঘপ্রার্থী নির্বাচিত হন।

স্বতন্ত্রদল (Swatantra Party)

অতীত দিনের খ্যাতনামা সর্বভারতীয় নেতা চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর স্বতন্ত্র দল প্রতিষ্ঠা করেন। স্বতন্ত্রদল শিল্পবাণিজ্যকে যথাসম্ভব সরকারের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত করিবার পক্ষপাতী। শিল্পের জাতীয়করণের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র দল মত প্রকাশ করে ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে ওকালতি করে। রক্ষণশীল দল হিসাবে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে স্বতন্ত্র দলের আবির্ভাব হইয়াছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় স্বতন্ত্র দল প্রয়াসী। ব্যক্তি-

স্বাধীনতা ও ব্যক্তিমালিকানায় সম্পত্তি সংরক্ষণ স্বতন্ত্র দলের আদর্শ। বহু দেশীয় নৃপতিবৃন্দ যথা মহারাণী গায়ত্রী দেবী প্রমুখ জমিদার শ্রেণী স্বতন্ত্রদলে যোগদান করিয়াছে। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে প্রথম আত্মপ্রকাশেই স্বতন্ত্রদল মোটামুটি কিঞ্চিৎ সাফল্যলাভ করিয়াছে ও সর্বভারতীয় দলরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজ্য বিধানসভায় স্বতন্ত্রদল অন্ধ্রপ্রদেশে ১৯টি, বিহারে ৫০টি, গুজরাটে ২৬টি, মধ্যপ্রদেশে ২টি, মাদ্রাজে ৬টি, মহীশূরে ৯টি, পাঞ্জাবে ৩টি, রাজস্থানে ৩৬টি, উত্তর প্রদেশ ১৫টি আসন লাভ করে। লোক সভার নির্বাচনে অন্ধ্র হইতে ২টি, বিহারে ৭টি, গুজরাটে ৪টি, রাজস্থানে ১টি ও উত্তর প্রদেশে ৩টি আসন লাভ করে।

একবিংশ অধ্যায়

সংবিধানের সংশোধন

ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে সহজ পরিবর্তনশীলতা ও দুষ্পরিবর্তনশীলতার মধ্যে এক সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস দেখা যায়। সংবিধানের কতকগুলি অনুচ্ছেদ সাধারণ আইনের ন্যায় সংশোধিত হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ অনুচ্ছেদের সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের দুইতৃতীয়াংশ উপস্থিত সদস্যের ও পার্লামেণ্টের অধিকাংশের সমর্থন থাকা প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি ব্যাপারে রাজ্যবিধান সভার অন্যূন অর্ধসংখ্যক সদস্যদের সমর্থন থাকা প্রয়োজন। সংবিধান সংশোধন ব্যাপারে ভারতবর্ষ সহজ পরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় এই দুই প্রকার শাসনতন্ত্রের মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছে বলা যায়; সংবিধানের ৩৬৮ ধারা মতে ভারতের শাসনতন্ত্রের সংশোধন প্রণালী প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। সাধারণতঃ সংবিধানের কোন ধারার পরিবর্তন করিতে হইলে ভারতীয় পার্লামেণ্টের প্রত্যেক সভার উপস্থিত সভ্যের দুই-তৃতীয়াংশ ও সমগ্র সভার অধিকাংশ সংখ্যক সভ্যের সমর্থন আবশ্যক।

তবে যদি শাসনতন্ত্রের নিম্নলিখিত ধারাগুলির পরিবর্তন করিতে হয়, যথা, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি, কেন্দ্রের অথবা রাজ্যগুলির প্রশাসনিক ক্ষমতা, কেন্দ্র বা রাজ্যসমূহের বিচারালয়ঘটিত ধারাগুলি, সপ্তম পরিশিষ্টে বর্ণিত কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়গুলির বিতরণ, এবং শাসতন্ত্রের পরিবর্তনের ঐ ধারা (৩৬৮) তখন ঐরূপ সংখ্যাধিক্য ছাড়াও অন্যূন অর্ধসংখ্যক রাজ্য বিধান সভার সদস্যগণের সমর্থনের প্রয়োজন হয়।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে শাসনতন্ত্রের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পরিবর্তন কিন্তু সাধারণ আইনের ন্যায় ভারতীয় পার্লামেন্টের কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্যেই অনুমোদিত হইতে পারে। যথা—দুই বা ততোধিক রাজ্যের একীকরণ, নূতন রাজ্যসৃষ্টি, রাজ্যের সীমারেখা পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ক আইন, রাজ্যের আইন পরিষদ সৃষ্টি বা বিলোপকরণ, আইনসভার সদস্যদের অধিকার নির্ণয়, সুপ্রীমকোর্টের ক্ষমতাবৃদ্ধি ইত্যাদি।

১৯৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর হইতে সর্বশুদ্ধ চতুর্দশবার সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে সংশোধন পদ্ধতি যাহাই হউক না কেন পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ইচ্ছানুসারে সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় ও সংবিধান পরিবর্তন করা যায়।

প্রথম সংশোধন আইন ১৯৫১

প্রথম সংশোধন আইন দ্বারা প্রধানতঃ সংবিধানে গৃহীত বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার ও স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত ব্যবসাবাণিজ্য চালাইবার অধিকার কিয়ৎ পরিমাণে সংকুচিত করা হইয়াছে। পূর্বে সংবিধানের ১৯(১) ক ধারামতে প্রদত্ত বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার ১৯ (২) ধারামতে সরকার কর্তৃক সংকুচিত করা হইত। সংবিধান সংশোধনের পূর্বে সরকার কেবলমাত্র নিন্দামূলক, আদালত অবমাননাকর, অশ্লীল, রাজ্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করার বা রাজ্য-সরকারের বিলোপসাধন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বাক্যের ব্যাপারে বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার সংকুচিত করিতে পারিত। পরে বিবিধ বিচারালয়ের রায়ে এই ক্ষমতার ভিত্তিহীনতা প্রকটিত হয়। সুপ্রীম কোর্ট দুইটি বিখ্যাত মামলায় যথা "রমেশ থাপর বনাম মাদ্রাজ সরকার" ও "ব্রিজভূষণ বনাম দিল্লী সরকার"

মামলায় আবেদনকারীর পক্ষে রায়দান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে ১৯(২) অনুচ্ছেদ মতে রাষ্ট্রবিদ্রোহ ব্যতিরেকে, এমন কি কোন প্রকার ব্যক্তিগত আক্রমণ অথবা শান্তিভঙ্গমূলক কোন বক্তৃতা বা প্রবন্ধ সরকার এই অনুচ্ছেদের বলে সংকুচিত করিতে পারিবেন না। এই মন্তব্য ও বিচারের ফলে ভারতীয় পার্লামেণ্ট ১৯(২) ধারা সংশোধন ও সম্প্রসারণ করেন এবং বাক্‌স্বাধীনতা সংকোচনের বহুপ্রকার অতিরিক্ত ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করেন। এই সংশোধনের ফলে সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা, পররাষ্ট্রের সহিত মৈত্রী রক্ষা বা শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য ১৯ ক অনুচ্ছেদে বর্ণিত বাক্‌স্বাধীনতা যুক্তিসঙ্গতভাবে সংকুচিত করিতে পারিবেন।

প্রথম সংশোধনের ফলে ১৯(১) (ছ) ধারামতে বর্ণিত ব্যবসা বাণিজ্য চালাইবার ক্ষমতাকে বহুলাংশে সঙ্কুচিত করা হয়। সংবিধান সংশোধনের পূর্বে ১৯ (৬) ধারা মতে সরকার শুধুমাত্র জনস্বার্থে এই অধিকারকে যুক্তি-সঙ্গতভাবে সংকুচিত করিতে পারিতেন। বিভিন্নপ্রকার বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার মানসে বিশেষতঃ সমগ্রদেশে যানবাহন চালাইবার ক্ষমতা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে প্রথম সংশোধন আইন করিয়া বহুল ক্ষমতা অর্জন করেন। সুপ্রীমকোর্ট "মতিলাল বনাম উত্তরপ্রদেশ" মামলায় আবেদনকারীর পক্ষে রায় দান প্রসঙ্গে বলেন যে সরকারের আইন দ্বারা যানবাহন রাষ্ট্রায়ত্ত করিলে ক্ষতিপূরণ দান করিতে হইবে। ফলে ১৯ ৬) ধারা সম্প্রসারিত করিয়া সবকারের ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ঐ নতন সংশোধনের ফলে সরকার নিজ কর্তৃত্বাধীনে যে কোন ব্যবসা বাণিজ্য বা সংস্থা চালাইতে পারিবেন এবং তাহাতে কোন নাগরিকের সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষমতা ব্যহত হইলেও আপত্তি করিবার কিছু থাকিবে না। ঐ নূতন ধারা মতে সরকার নাগরিকদের কোন ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকুরী করিবার পূর্বে উপযুক্ত শিক্ষা অর্জনের গুণাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

প্রথম সংশোধন আইনে ৩১ক ও ৩১খ আইনের সম্পত্তির অধিকার বহুলাংশে সংকুচিত করা হয়। পূর্বে ৩১ ধারায় সকল মানুষকেই সম্পত্তির অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল। সরকার বিভিন্ন রাজ্যে জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ করিয়া মধ্যস্বত্বাধিকারীদের অধিকার হরণ করিবার চেষ্টা

করিলে বিভিন্ন রাজ্যের জমিদারগণ ঐ আইনের যৌক্তিকতা ও আইনানুগতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন।

প্রথম সংবিধান সংশোধনী আইনে নূতন ১৫(৪) ধারা যোগ করিয়া অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিকল্পে সাম্যের অধিকার কিছু পরিমাণে খর্ব করিবার প্রয়াস দেখা যায়। সুপ্রীম কোর্ট "মাদ্রাজ সরকার বনাম চম্পাকম" এই বিচারে রায় দেন যে শিক্ষায়তনে ছাত্রছাত্রী নিয়োগ বিষয়ে সাম্প্রদায়িক শ্রেণীবিভাগ সাম্যের অধিকারকে ক্ষুন্ন করে এবং শাসনতন্ত্রবিরোধী। ফলে সরকার সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুন্নত সম্প্রদায় অথবা তপশিলী সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য শিক্ষায়তনে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং উহা ১৫ বা ২৯ ধারা বর্ণিত অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলেও শাসনতন্ত্র-বিরোধী অবৈধ হইবে না।

দ্বিতীয় সংশোধন আইন ১৯৫২

দ্বিতীয় সংশোধন আইন অনুসারে সংবিধানের ৮১ (১) (খ) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সাড়ে সাত লক্ষের পরিবর্তে প্রতি ৫ লক্ষ লোকের জন্য একজন লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইবেন বলিয়া স্থির হয়।

তৃতীয় সংশোধন আইন ১৯৫৪

এই সংশোধন আইনের দ্বারা সপ্তম পরিশিষ্টের তৃতীয় (যুগ্ম) তালিকার ৩৩নং বিষয়টি উল্লিখিত হইয়াছে। কতকগুলি শিল্পের উপর এই আইনের দ্বারা, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এই সকল বিষয় যথা খাদ্য, তৈলজাত দ্রব্য তুলা পাট প্রভৃতি বিষয়, কেন্দ্রীয় সরকার জনহিতার্থে প্রয়োজনীয় এইরূপ ঘোষণা করিলে পার্লামেন্ট ইহাদের উপর আইন করিতে পারেন।

চতুর্থ সংশোধন আইন ১৯৫৬

চতুর্থ সংশোধন আইনে মূলতঃ সম্পত্তির অধিকারকে পুনরায় বহুলাংশে খণ্ডিত ও সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। ঐ সংশোধনের ফলে সংবিধানের ৩১ (২) ধারার পরিবর্তন করা হয়, ৩১ (২ক) ধারা যোগ করা হয়

এবং ৩১ক ধারা বহুলাংশে বর্ধিত করিয়া সরকারের সম্পত্তি হরণ বা সম্পত্তির অধিকার সঙ্কোচন করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করা হয় এবং জনস্বার্থে বিনা ক্ষতিপূরণে যে কোন শিল্প সাময়িকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত করা সম্ভব হয়।

পূর্বে সরকারের সম্পত্তি গ্রহণ ও সম্পত্তির দখলীকরণের মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য ছিল না। ফলে "সুবোধগোপাল বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার," এবং "দ্বারকাদাস বনাম শোলাপুর বয়ন মিল" এই দুইটি মামলায় এই বিষয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং যে কোনপ্রকার সম্পত্তি সম্পর্কে এই হস্তক্ষেপ ক্ষতিপূরণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ঐ সংশোধনের ফলে সম্পত্তির দখলী-স্বত্ব অর্জন ও সম্পত্তির দখলীকরণেব মধ্যে পার্থক্য করা হয়। ইহাও বলা হয় যে যদি সরকার কোন ব্যক্তির সম্পত্তি গ্রহণ করিতে বা দখলীকরণ করিতে না চাহেন অথচ সরকার প্রণোদিত কোন আইনের ফলে কোনও ব্যক্তি তাহার সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হন তাহা হইলে কোনও প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে সরকার বাধ্য থাকিবেন না। "সাগির আহম্মদ বনাম উত্তর প্রদেশ" মামলায় সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে উত্তর প্রদেশ সরকারের আইনের বলে আবেদনকারীর সাধারণ যানবাহন চালাইবার অধিকারকে খর্ব করা হইলে সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়। ঐ মামলার রায়ের ফলে সরকারের শিল্প রাষ্ট্রীয়করণের ক্ষমতার উপর যে অসুবিধা সৃষ্টি করা হয় তাহার দূরীকরণ মানসে ঐ চতুর্থ সংশোধনী আইন বলবৎ করা হয়।

কলিকাতার উচ্চবিচারালয়ে "বেলা ব্যানার্জি বনাম পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতির" মামলায় রায় দান কালে মন্তব্য করা হয় যে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জন করিলে সরকার সেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তির পুরা, ন্যায্য বাজার দর হিসাবে ক্ষতিপূরণ দিবে, নচেৎ ঐ অজুহাতে ঐরূপ আইন অন্যায় ও শাসনতন্ত্র বহির্ভূত ঘোষণা করিবার অধিকার সরকারের থাকিবে। ঐ রায়ের ফলে সরকার জনহিতার্থে সম্পত্তি অর্জন করিতে চাহিলে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হইবে এবং প্রচুর অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। সেইজন্য (৩১ক) ধারা পরিবর্তন করিয়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আদালতের অধিকার বহির্ভূত করা হয়—ক্ষতিপূরণের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির অজুহাতে ঐরূপ কোন আইন শাসনতন্ত্র বহির্ভূত ঘোষণা করা চলিবে না।

৩১ ক ধারা পরিবর্ধিত করিয়া সরকার প্রভূত ক্ষমতা অর্জন করেন। পূর্বে বলা হইয়াছে জমিদারী উচ্ছেদকল্পে প্রথম সংশোধনী আইনের সূচনা হয় এবং ৩১ ক ধারা মতে মধ্যস্বত্ব বিলোপকারী কোন আইন রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিলে শাসনতন্ত্রের কোন ধারার সহিত সঙ্ঘর্ষ বাধিলেও তাহা বেআইনী ঘোষণা করা চলিবে না।

চতুর্থ সংশোধনের ফলে ঐ ৩১ ক ধারার বহুলাংশে সম্প্রসারণ করা হয়। তাহার ফলে জনগণের সম্পত্তির আয়তনের সীমারেখা টানা চলিতে পারে ও অতিরিক্ত জমি সরকার দখল করিতে পারিবেন। দুই বা ততোধিক কোম্পানীর মিলনীকরণ, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার বিলোপ, কোন কোম্পানীর উপর সাময়িক সরকারী কর্তৃত্ব করিবার অধিকার, খনি বা খনিজ তৈলের স্থায়ী কোন বন্দোবস্ত নাকচ করিয়া ঐসব বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ, এই সকল বিষয়ে যাবতীয় আইন মানুষের সম্পত্তির অধিকার খণ্ডিত করিলেও তাহা শাসনতন্ত্রের ১৪, ১৯ বা ৩১ ধারার সংঘর্ষে বেআইনী বা শাসনতন্ত্র বহির্ভূত ঘোষণা করা চলিবে না।

এই ভাবে সম্পত্তি অর্জনের অধিকার এবং তৎসম্পর্কীয় আইন আদালতের বিধি বহির্ভূত করিয়া সরকার বহুবিধ রাষ্ট্রীয়করণ আইন প্রণয়ন করেন।

এই চতুর্থ সংশোধন আইনে ৩০৫ ধারার যথাবিহিত পরিবর্তন করিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যে আদালতের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়। "সাগির আহমদ বনাম যুক্তপ্রদেশ সরকার" মামলায় সুপ্রীমকোর্টের রায় দানের ফলে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য সরকার ৩০৫ ধারার পরিবর্তন করেন। ইহার ফলে যানবাহনের ন্যায় কোন ব্যবসা-বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার আইনকে কোন আদালত ৩০১ বা ৩০৩ ধারার বিরোধী অথবা শাসনতন্ত্র বহির্ভূত এইরূপ ঘোষণা করিতে পারিবেন না।

পঞ্চম সংশোধন আইন ১৯৫৫

এই সংশোধন আইনের ফলে ক বা খ শ্রেণীর রাজ্যের আয়তন, সীমানা প্রভৃতি পার্লামেণ্ট কর্তৃক পরিবর্তনের ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়। ইহাতে বলা হয় যে সীমা পরিবর্তনের আইন রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতিরেকে পার্লামেণ্টে

উত্থাপন করা যাইবে না। এতদ্ব্যতীত যদি ঐরূপ কোন আইন কোন রাজ্যের সীমা বা নাম পরিবর্তন করিতে চাহে তাহা হইলে ঐসব রাজ্যের আইন সভায় মতামত গ্রহণের জন্য তাহা প্রেরিত হইবে।

ষষ্ঠ সংশোধন আইন ১৯৫৬

এই আইনের ফলে সংবিধানের ধারা পরিবর্তন করিয়া সংবাদপত্র ক্রয় বিক্রয় ব্যতীত আন্তঃরাজ্য ব্যবসায় অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক করস্থাপনের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংবিধানের ২৬৯ ও ২৮৬ ধারা পরিবর্তন করিয়া এবং সপ্তম পরিশিষ্টে (7th Schedule) ৯২এ ধারা যোগ করিয়া আন্তঃরাজ্য ক্রয় বিক্রয়াদির ব্যবসা বিষয়ে কর ধার্য করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টের উপর অর্পণ করা হয়। সুপ্রীম কোর্ট ইউনাইটেড মোটর কোম্পানীর মামলায় এবং পরে বেঙ্গল ইম্যুনিটি কোং বনাম বিহার সরকার মামলায় আন্তঃরাজ্য ব্যবসার বিষয়ে আইনের যৌক্তিকতা বিচার করিয়া এইরূপ বিষয়ে কোন রাজ্য কর্তৃক কর ধার্য করা অবৈধ ঘোষণা করেন। ফলে ঐ সকল আইন পরিবর্তন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার আন্তঃরাজ্য বিক্রয় ব্যবসায়ের উপর কর ধার্য করিবার ক্ষমতা অর্জন করিবার জন্য এই সংশোধন আইনের উদ্ভব হয়। ইহার কিছু [illegible] কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর আইন ১৯৫৬ সালে বলবৎ হয়। এই উদ্দেশ্য ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার অথবা পার্লামেন্ট কোন প্রকার সামগ্রী বিশেষ প্রয়োজনীয় ঘোষণা করিয়া সেই সকল বিষয়ে আন্তঃরাজ্য ব্যবসায়ের উপর সর্ত বা বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারেন।

সপ্তম সংশোধন ১৯৫৬

ভাষাগত ভিত্তিতে রাজ্যের সীমারেখা পরিবর্তন করিবার মানসে রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ হইবার ফলে এই সপ্তম সংশোধন আইন পাশ করা হয়। এই সংশোধন আইন অনুসারে ভারতকে মোট ১৪টি রাজ্যে ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছিল। এই আইনের ফলে ভারতবর্ষে ক খ গ ও ঘ চারি প্রকারের রাজ্যের শ্রেণী বিভাগের বিলোপসাধন করিয়া তাহার পরিবর্তে ১৪টি সমপর্যায়ভুক্ত রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। এই নূতন শ্রেণী বিভাগের ফলে নিম্নপ্রকার পরিবর্তনগুলি

প্রয়োজনীয় হয় ও সাধিত হয়। পরে বোম্বাই রাজ্য গুজরাট ও মহারাষ্ট্র এই দুই রাজ্যে বিভক্ত হয়।

এই সংশোধনী আইনের ফলে লোকসভায় রাজ্য হইতে ৫০০ জন ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইতে ২০ জন সভ্য থাকিবে। (৮০ বা ৮১)

দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি রাজ্যপাল থাকিতে পারে। (১৫৮)

রাজ্যের আইন সভার উচ্চ পরিষদের সভ্যগণ রাজ্যের আইন সভার নিম্ন পরিষদের সভ্যগণের ১/৪ স্থলে ১/৩ অংশ হইবে। (১৭১)

এই সংশোধনের ফলে কোন উচ্চ বিচারালয়ে সাময়িক কার্যাধিক্য হইলে পুরাতন কার্য সম্পাদনের জন্য দুই বৎসরের জন্য অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগ করা চলিতে পারে। (২২৪) উচ্চবিচারালয়ে বিচারপতিগণ অবসর গ্রহণের পর তাঁহাদের স্ব স্ব বিচারালয় ব্যতিরেকে অন্য কোন উচ্চবিচারালয়ে অথবা সুপ্রীম কোর্টে ব্যবহারজীবি রূপে আইন ব্যবসা করিতে পারিবেন। (২২০) দুই বা ততোধিক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য একটি উচ্চ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। (২৩১)

কেন্দ্র যেমন সাময়িক কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকারের উপর নিজ কর্মভার ন্যস্ত বা প্রদান করিতে পারেন, সেইরূপ রাজ্যসরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নিজ শাসনভার বা অন্য কোন কার্য করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত বা প্রদান করিতে পারেন।

অষ্টম সংশোধন আইন ১৯৫৯

এই আইন অনুসারে ১৯৬০ সালের পরও আরও দশ বৎসর তপশীলী ও উপজাতি শ্রেণীসমূহের জন্য এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের জন্য লোক-সভায় ও রাজ্য বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই পরিবর্তনের ফলে ৩৩৪ ধারায় লিখিত সাময়িক ব্যবস্থাগুলি শাসনতন্ত্র সুরু হইবার পর "দশ বৎসর" স্থলে "বিশ বৎসর" করা হইয়াছে।

নবম সংশোধন আইন ১৯৬১

বেরুবাড়ী হস্তান্তরের জন্য এই সংশোধন আইনের অবতারণা হয় এবং এই আইনের ফলে সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদের পরিবর্তন সাধন করা হয়। ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীদ্বয় ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮, ২৩শে অক্টোবর ১৯৫৯ ও ১১ই জানুয়ারী ১৯৬০ তারিখে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত করেন তাহাকে

রূপ দান করিবার জন্য দুই দেশের এলাকা বিনিময় প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। সরকার এই বিষয় পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ চাহিলে সুপ্রীম কোর্ট বেরুবারী ইউনিয়ন ও অন্যান্য ছিটমহল অদলবদল প্রসঙ্গে এই রায় দেন যে যদিও ভারতীয় পার্লামেণ্টের এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে তথাপি ভারতের কোন অংশ বিদেশী রাষ্ট্রকে প্রদান করিতে হইলে সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে হইবে। এই রায় বা উপদেশ অনুযায়ী নবম সংবিধান সংশোধনী আইন পাশ করা হয় এবং ভারতের সংবিধানের প্রথম পরিশিষ্টের (Schedule) পরিবর্তন করা হয়। ইহার ফলে রাজ্য অংশে বর্ণিত পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব ও ত্রিপুরা হইতে নির্দিষ্ট অংশ পাকিস্তানকে প্রদান করা হয় এবং আসাম রাজ্যে পাকিস্তানের কিছু অংশ যোগ করা হয়। এইভাবে ১২নং বেরুবাড়ী ইউনিয়ন প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাকিস্তানের সহিত যুক্ত হয়।

দশম সংশোধন আইন ১৯৬১

ভারতের সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উল্লেখ আছে। এই সংশোধন আইনের ফলে নূতন একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সপ্তম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম দাদরা ও নগর হাবেলী। পূর্বে অবস্থিত স্বাধীন দাদরা ও নগর হাবেলী অঞ্চল লইয়া ইহা গঠিত। ২৪০ (গ) ধারা যোগ করিবার ফলে রাষ্ট্রপতি ঐ অঞ্চলের জন্য বিধিনিয়ম প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

একাদশ সংশোধন আইন ১৯৬১

এই সংশোধন আইনের বলে সংবিধানের ৬৬ ও ৭১ ধারার পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য গঠিত নির্বাচনী সংস্থার পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। ৬৬ ধারার পরিবর্তন করিয়া উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের সদস্যদিগের যুক্ত অধিবেশনের পরিবর্তে নির্বাচনী সংস্থার সদস্য সম্মেলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহাতে যুক্ত অধিবেশনের অসুবিধা দূরীভূত করা হয়। ৭১ ধারার (৪) অনুচ্ছেদ নূতন ভাবে যোগ করিবার ফলে নির্বাচনী সংস্থার কোন সদস্যস্থান কোন কারণে শূন্য আছে এই কারণে রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন

বাতিল হইবে না। এই অনুচ্ছেদ যুক্ত থাকায় ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন ব্যাপারে বিচারালয়গুলির ক্ষমতা হ্রাস করা হয়।

দ্বাদশ সংশোধন আইন ১৯৬২

এই সংশোধন আইনের ফলে ভারতবর্ষের একটি নূতন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। ২১শে ডিসেম্বর ১৯৬১ সালের পূর্বে যে এলাকা গোয়া দমন ও দিউ নামে প্রচলিত ছিল তাহা এখন ঐ নামেই ভারতের সংবিধানস্থ প্রথম অনুচ্ছেদের অষ্টম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলরূপে পরিগণিত হইবে। এই দ্বাদশ সংবিধানের ফলে সংবিধানের ২৪০ (ঘ) ধারা নূতন যোগ করিয়া ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ঐ অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য বিবিধ আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

ত্রয়োদশ সংশোধন আইন ১৯৬২

এই সংশোধন আইনের ফলে সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত ১৫টি রাজ্যের সহিত নূতন একটি রাজ্য যুক্ত করিয়া ১৬টি রাজ্যের সৃষ্টি হয়। নূতন রাজ্যের নাম 'নাগাভূমি' (Nagaland)।

চতুর্দশ সংশোধন আইন ১৯৬২

এই সংশোধন আইনের ফলে সংবিধানের ২৩৯ক ধারা যুক্ত হয়। তাহার ফলে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য আইনসভা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর প্রদত্ত হয়।

সারাংশ

[illegible] মধ্যে ভারতীয় সংবিধান [illegible] সংশোধন ব্যাপারে সহজ পরিবর্তন [illegible] অপূর্ব [illegible] হইয়াছে। ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পার্লামেন্টারী ও রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থার সমন্বয় ঘটিয়াছে। দেশীয় রাজ্যসমূহকে ভারতের সহিত সংযুক্ত করিয়া সংবিধানের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্রকে সংবিধানগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ করা হইয়াছে। সংবিধানে নাগরিকদিগের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে ও কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ করা হইয়াছে।

নাগরিকত্ব—ভারতীয় সংবিধানে দ্বৈত নাগরিকত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। নাগরিকত্ব সম্পর্কে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের উপর নির্ভর করা হইয়াছে। সংবিধানের ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, অনুচ্ছেদে বিভিন্ন প্রকার ভারতীয় নাগরিকত্ব সম্পর্কে বলা হইয়াছে। ১৯৫৫ সালে নাগরিকত্ব আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। ভবিষ্যৎ ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন ও বর্জন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

মৌলিক অধিকার—সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদে নাগরিকদিগের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ করা হইয়াছে। সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারসমূহ উল্লেখিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে রাষ্ট্রপতির অবস্থান। রাষ্ট্রপতির নামেই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। শাসনবিষয়ক ক্ষমতা ভিন্ন আইন বা বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতি উপভোগ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত থাকিতে পারে। রাষ্ট্রপতি কার্যতঃ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণের পরামর্শ ও অনুমোদনক্রমে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

পার্লামেন্ট—রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা ও লোকসভা [illegible] ভারতের [illegible] সম্মতির [illegible] ক্ষমতা [illegible] আহ্বান করা [illegible]

বিচার বিভাগ—ভারতের সর্বোচ্চ আদালত ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হইল সুপ্রীম কোর্ট। একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক দশজন বিচারপতির সমন্বয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। সুপ্রীম কোর্ট আদিম বিচার বিভাগ, আপীল বিভাগ পরিচালনা ব্যতীত নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে ও আইন বিষয়ে প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করে।

রাজ্য সরকার—প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্যপালকে পরামর্শ দিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। রাজ্য আইনসভায় আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিধানসভার সদস্যদিগের নিকট দায়ী থাকেন।

দলীয় ব্যবস্থা—স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্গাতা কংগ্রেস ভারতের বৃহত্তম দল। কমুনিষ্ট পার্টি ভারতের দ্বিতীয় দলরূপে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। বর্তমানে স্বতন্ত্র দল, প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ও জনসংঘ দলের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে।

ভারতীয়, ব্রিটিশ, রুশীয়, মার্কিন ও সুইস্ রাষ্ট্রপ্রধান

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত। পার্লামেন্ট সভার উভয় পরিষদের ও রাজ্য বিধানসভাগুলির সদস্যগণের দ্বারা গোপন ও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে একক হস্তান্তর যোগ্য ভোটের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থীকে অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। তিনি পাঁচবৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।

আমেরিকায় রাষ্ট্রপতির হস্তে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত। ৩৫ বৎসর বয়স্ক অন্যূন ১৪ বৎসর কাল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী মার্কিন নাগরিক রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারেন। নির্বাচনী সংস্থার মাধ্যমে চারি বৎসরের জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

সুইজারল্যাণ্ডে আইনসভার উভয় পরিষদ কর্তৃক চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত সাতজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত এক যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের হস্তে শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে।

সোভিয়েত রাশিয়ায় ৩৩ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত এক প্রেসিডিয়াম রাষ্ট্রপ্রধানের কার্য পরিচালনা করে। সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক চারি বৎসরের জন্য প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ নির্বাচিত হন।

ইংল্যাণ্ডে রাজা বা রাণী রাষ্ট্রপ্রধানের কার্য পরিচালনা করেন। বংশানুক্রমে রাজা বা রাণী শাসক প্রধানের গুরুদায়িত্ব বহন করিয়া আসিতেছেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগীয়, আইন বিভাগীয়, ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন ও মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত রাখিতে পারেন এবং কোনও রাজ্যের শাসনভার নিজ হস্তে লইতে পারেন। বাস্তবে ও কার্যক্ষেত্রে অবশ্য রাষ্ট্রপতিকে প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের নির্দেশক্রমে ও অনুমোদন-সাপেক্ষ শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়। মন্ত্রিপরিষদ তাহাদের কার্যাবলীর জন্য লোকসভার নিকট দায়ী।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নামে ও কার্যক্ষেত্রে প্রকৃত শাসকপ্রধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন বলবৎ করা ব্যতীত কর্মচারী নিয়োগ, বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি স্থাপন, সন্ধি, যুদ্ধ বা শান্তি স্থাপনে সক্ষম। ভারতীয় রাষ্ট্রপতির ন্যায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের মার্জনা করিতে পারেন বা দণ্ড হ্রাস করিতে পারেন। মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যগণকে রাষ্ট্রপতির পরিবাররূপে অভিহিত করা হয়। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপরে মন্ত্রিপরিষদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল।

সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ আইন সভার সদস্য থাকিতে পারেন না। আইন সভা অনাস্থা প্রস্তাব দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য-গণকে পদত্যাগে বাধ্য করিতে পারে না। সদস্যগণ আইন প্রণয়ন, আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

রাশিয়ার প্রেসিডিয়াম বিবিধ ক্ষমতার অধিকারী। সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন স্থগিত থাকিলে প্রেসিডিয়ামের নিকট মন্ত্রিপরিষদ দায়ী থাকে। সুপ্রীম সোভিয়েত ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দানে প্রেসিডিয়াম সক্ষম। কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিয়োগ ও বিশেষ অবস্থায় প্রেসিডিয়াম যুদ্ধ ঘোষণা করিতেও সক্ষম।

ইংল্যাণ্ডে রাজা বা রাণী শাসন বিভাগীয়, আইন বিভাগীয় ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী। সরকারী উচ্চপদগুলিতে কর্মচারী নিয়োগ করেন এবং প্রণীত আইনে সম্মতি প্রদান করেন। কার্যতঃ অবশ্য মন্ত্রি পরিষদই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজার নামে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

ভারত, আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া ও সুইজারল্যাণ্ডের আইনসভা

ভারতের পার্লামেণ্ট সভা দুইটি পরিষদ যথা, লোকসভা ও রাজ্যসভা লইয়া গঠিত। অনধিক ২৫০ জন সদস্য লইয়া রাজ্যসভা ও অনধিক ৫০০ জন সদস্য লইয়া লোকসভা গঠিত। রাজ্যসভায় ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। প্রতি দুই বৎসরে রাজ্যসভার ⅓ অংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। অপরপক্ষে লোকসভার সদস্যগণ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। পার্লামেণ্ট সভার আইন প্রণয়ন ব্যাপারে উভয় পরিষদের সম্মতি প্রয়োজন হয়। মতবিরোধ ঘটিলে যুক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিপরিষদীয় আইনসভা সংযুক্ত হইয়াছে। ৪৩৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি সভা গঠিত এবং প্রতি রাজ্য হইতে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া বর্তমানে মোট ১০০ জন সদস্যের সমন্বয়ে সেনেট সভা গঠিত। প্রতি দুই বৎসরে ⅓ অংশ সদস্য সেনেট সভা হইতে অবসর গ্রহণ করে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণের দ্বারা উভয় পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। মার্কিন সেনেট সভাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চপরিষদ বলিয়া অভিহিত করা হয়। সেনেট সভা মার্কিন রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ব্যবস্থা ও চুক্তি ব্যবস্থা অনুমোদন করে। উভয় পরিষদের [illegible] অবসানের জন্য যুক্ত [illegible] ব্যবস্থা আছে।

[illegible] যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েত [illegible] সুপ্রীম সোভিয়েত [illegible] [illegible] সদস্যের [illegible] বৎসরের জন্য [illegible] [illegible] নির্বাচন [illegible] আছে।

সুইজারল্যাণ্ডে [illegible] পরিষদ লইয়া আইন সভা গঠিত। রাজ্য পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৪৪ ও জাতীয় পরিষদের সদস্যসংখ্যা ১৯৬। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে আইন সভার ক্ষমতা সীমিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণকে আইনসভা পদত্যাগে বাধ্য করিতে পারে না। সৈন্যাধ্যক্ষ ও বিচারকগণকে নিয়োগ করা ব্যতীত সুইস্ আইনসভা দণ্ডিতদের প্রতি মার্জনা প্রকাশেও সক্ষম।

গ্রেটব্রিটেনে পার্লামেণ্ট সভা লর্ডস্ সভা ও কমন্স সভার সমন্বয়ে গঠিত। অতীতে লর্ডস্ সভার ক্ষমতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা লর্ডস্‌সভার ক্ষমতা বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়াছে। অন্যান্য উচ্চ কক্ষগুলির ন্যায় লর্ডস্‌সভার সদস্যগণ জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত নহেন। এই সভা সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রায় ৮৫০ জন সদস্যের সমন্বয়ে বিভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর সদস্যগণের দ্বারা লর্ডস্‌সভা গঠিত। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কমন্স সভার সদস্যগণ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কমন্স সভার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬৩০, বর্তমানে কমন্স সভার গুরুত্ব ও কার্যের ব্যাপকতা যথেষ্ট বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। কমন্স সভার সদস্যগণ পার্লামেণ্টারী সুযোগ সুবিধা লাভ করেন ও আইন প্রণয়ন ব্যতীত অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী।

ভারত, আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া ও সুইজারল্যাণ্ডের বিচার ব্যবস্থা

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টরূপে অভিহিত। একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক দশ জন বিচারপতি সহ সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। বিচারকগণ ৬৫ বৎসর বয়স হইলে অবসর গ্রহণ করেন। সুপ্রীম কোর্ট [illegible] আপীল বিভাগ ও পরামর্শ দান বিভাগে বিভক্ত [illegible] সুপ্রীম কোর্ট [illegible] আইনকে সুপ্রীম কোর্ট [illegible]।

আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট [illegible] আটজন বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত। সুপ্রীম কোর্ট আদিম বিভাগ, আপীল বিভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত। আইনের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকর্তারূপে সুপ্রীম কোর্ট অবস্থিত। যুক্তিহীন বা সংবিধান-বহির্ভূত এই অজুহাতে কোন আইনকে নাকচ করিবার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে। তবে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট পরামর্শ দান করেন না।

সোভিয়েত রাশিয়ায় সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত ৪৫ জন বিচারক ও ২০ জন সদস্যের সমন্বয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। কোন আইনকে নাকচ করিবার ক্ষমতা ইহার নাই।

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইবুনাল আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত ২৪ জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত। বিচারকগণের কার্যকাল ৬ বৎসর। আদিম ও আপীল বিভাগের মাধ্যমে কার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাইবুনাল সংবিধানের যৌক্তিকতা নির্ণয়ে সক্ষম নহে. ক্যাণ্টন প্রণীত আইন ইহা নাকচ করিতে পারে কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রণীত কোন আইন ইহা নাকচ করিতে পারে না।

ইংলণ্ডে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করিবার জন্য দুই প্রকারের আদালত আছে। লর্ডস্ সভাই ইংলণ্ডের বিচার ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ আদালত। অবশ্য পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার অধিকার আদালতের নাই। ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় বিচারপতিগণ কোন নির্দিষ্ট বয়সে অবসর গ্রহণ করেন না. বা সেইমত কোন আইন নাই।

INDIAN ADMINISTRATION

Exercise

(1) State briefly the salient features of the Indian constitution.

(2) Explain the significance of the Preamble to the Indian Constitution. "India is a Sovereign Democratic Republic." Explain.

(3) Explain the nature of Indian Federalism and point out the unitary features of the Indian constitution.

(4) Discuss the mode of alteration of boundaries of the component States of the Union of India.

(5) Enumerate the fundamental rights granted to the citizens of India by the Constitution of India with Special reference to the (i) Right to equality (ii) Right to personal liberty (3) Right of property (4) Right to constitutional remedies. What are the limitations on these rights? How can they be enforced?

(6) Explain the significance of the Directive Principles of State Policy as enumerated in the Constitution of India. What is the utility of these directives ?

(7) Discuss the powers and position of the President of the Indian Constitution. Point out briefly the relationship between the President and his Council of Ministers.

(8) Describe the powers and position of the Prime Minister of India.

(9) Is the Indian Parliament a sovereign law-making body ? Discuss in this connection the limitations, if any, on the powers of the Indian Parliament.

(10) Explain the composition and functions of the Supreme Court in India. How far it can exercise the power of judicial review ?

(11) Describe the powers and constitutional position of a Governor of a State in India with special reference to the relation between the Governor and his Council of Ministers.

(12) Explain the distribution of legislative powers between the Centre and the constituent States of the Indian Union.

(13) Explain the administrative relation between the Centre and the States in India ? How can the Government at the Centre control the affairs of the States ?

(14) What is the procedure for amendment of the Indian Constitution ? Is the Constitution of India a flexible one ?

(15) What are the emergency provisions of the Indian Constitution ? Do you think that they are repulsive to the principles of democracy ?

(16) Discuss with illustration the party system in India.

SYLLABUS IN POLITICAL SCIENCE

(Pass Course : Papers II & III)

FOR THREE YEAR DEGREE COURSE STUDENTS

Paper II—Governments of Great Britain, U.S.A. U.S.S.R. and Switzerland

(*a*) *Great Britain*—Characteristics of the British Constitution—the Rule of Law Conventions. Position and Power of the British Crown.

The Privy Council—The Ministry and the Cabinet.

Characteristics of the British Cabinet—its functions—the position and powers of the Prime Minister—Relation between the Cabinet and Parliament.

Constitution and functions of the House of Lords and the House of Commons—Relationship between the two Houses—Privileges of the Houses—How Bills are passed—Control of Parliament over finance.

British Party system. A brief outline of the British Judicial system—Local Government in Great Britain.

(*b*) *U.S.S.R.*—Chief features of the Constitution.

Constitution and functions of the Council of Ministers. Functions of the Supreme Soviet—the Presidium. The one-party Rule—Role of the Communist Party—The Judiciary.

(*c*) *U.S.A.*—Chief features of the Constitution of the U.S.A. Position and Powers of the President—The Cabinet. Powers and functions of the Two Houses of the Congress. Party system—The Federal Judiciary and its functions ; and Process of Amendment of the Constitution.

(*d*) *Switzerland*—Chief features of the Constitution—Nature of the Federation—Distribution of Powers.

The Federal Executive.—The Federal Council—its peculiarity—its relation to Federal Legislature. Direct popular Legislation ; the Initiative and Referendum—Federal Judiciary.

Paper III—Government of India.

India :—Chief features of the Constitution—The Preamble, the Fundamental Rights, the Directive Principles of State Policy.

Division of Powers—Relation between the Union and the States (Administrative and Legislative).

Union Government—Position and Powers of the President —Functions of the Council of Ministers—its relation to Parliament, Composition and Functions of Parliament—Legislative Procedure—Financial Control.

State Governments—Position and Powers of the Governor—Position and Functions of the Council of Ministers—Composition and Functions of the Legislative Council and Legislative Assembly in a State—Legislative Procedure—Finance Control.

Constitution and functions of the Supreme Court—a brief description of the organisation of the State Judiciary.

Party system in India.

The Electorate. Civil Services.

An outline of the system of local Government in West Bengal.